উদারীকরণ, উন্নয়ন ও উত্তরবঙ্গ

উদারীকরণ, উন্নয়ন ও উত্তরবঙ্গ

মানস দাশগুপ্ত

বইওয়ালা
কলকাতা ৪৮

উদারীকরণ, উন্নয়ন ও উত্তরবঙ্গ

মানস দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪

বইওয়ালার পক্ষে রানি মৈত্র কর্তৃক ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রীট, শ্রীভূমি কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং বাসন্তী প্রেস, ১৯এ, ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত

মুখবন্ধ

আমাব লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছিল তা শ্রীমান গোবিন্দ রায় M L A ও শ্রীকমল গুহ মহাশয বর্তমানে কৃষিমন্ত্রী "উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির" উদ্যোগে "দীপ" প্রকাশন কোলকাতা থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশ করে। বইটার নাম দেওয়া হয়েছিল "বিশ্বায়ন, ভারত ও উত্তরবঙ্গ"। লেখাগুলি বা যদি পত্রিকার "কলম" বলা হয় তবেই তারা উদ্যোগ নিয়ে ছাপিয়েছিল। আসলে লেখাগুলি ছিল "উত্তরবঙ্গ সংবাদ" পত্রিকার পোস্ট-এডিটরিয়াল। শ্রীমান গোবিন্দ্ রায় ও শ্রীযুক্ত কমল গুহের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

সেই বইটি ("বিশ্বাযন, ভারত ও উত্তরবঙ্গ") ছাপাবার পর দেখা গেল আরও বহু লেখা ছাপা হয়নি। উত্তরবঙ্গে যেখানেই যাই আমার অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীরা অনুরোধ করে যে লেখাগুলি যদি একত্রে প্রকাশ না করি তবে "হারিয়ে" যাবে। আমার প্রায় ৪০ বছরের বন্ধু এবং লেখক শ্রীহরেন ঘোষ মহাশয় যিনি শিলিগুড়ি কমার্স কলেজে বহুদিন প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনিও প্রায় ধমকের সুরে বলেন—"হয় ছাপান না হলে হারিয়ে যান"। বই ছাপা হলেই যে হারাবো না তা সত্য নয়। তবুও ভাবলাম অনেক লেখা যা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তা একত্রে সংকলন কবে বই হিসাবে ছাপানোর বন্দোবস্ত করার চেষ্টা হোক। যোগাযোগ হল শ্রীমান উৎপল মৈত্রের সঙ্গে। তিনি 'বইওয়ালা" প্রকাশনাব প্রকাশক। তিনি আগ্রহ দেখালেন। তাই ভাবলাম শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত "উত্তরবঙ্গ সংবাদ" আর "বসুমতী" পত্রিকায় যেগুলো পোস্ট-এডিটরিয়াল হিসেবে বেরিয়েছে তা "বইওয়ালা" বই করে ছাপিয়ে দিক। শ্রীমান উৎপল মৈত্র ভার নিলেন আর আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।

বইটার নামকরণ করেছি—"উদারীকরণ, উন্নয়ন ও উত্তরবঙ্গ"। যদিও বলা যেতে পারে "বিশ্বায়ন, ভারত ও উত্তরবঙ্গে"র দ্বিতীয় খণ্ড। তবে নামে আসে যায় না—লেখাগুলি এককালে উত্তরবংগের বিভিন্ন পাঠকরা শহরে, গ্রামে, গঞ্জে পড়েছিল আর সেগুলো একত্র করে বই হিসেবে ছাপাচ্ছি তাতেই আমি নিশ্চিন্ত। বলে না Publish or Pirish—আমি ভাবলাম প্রকাশ করাই যদি বাঁচার মূলমন্ত্র হয় তবে প্রকাশই করি। প্রকাশ করলেও হারিয়ে যেতে পারি। বাঁচা বা মরা প্রকাশ করার উপর নির্ভর করে না। তবুও প্রকাশ করলাম।

আমি যখনই যা লিখেছি তখনই "উত্তরবঙ্গ সংবাদে'র কর্ণধার শ্রীসুহাস তালুকদার আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমি যাতে লিখি তার জন্য শ্রীমান নরেশ দত্তকে আমার কাছে প্রতি সপ্তাহে পাঠান। আবার 'বসুমতী' পত্রিকার একদা সম্পাদক শ্রীহরেন ঘোষ মশাই আমাকে ফোন করে তাগাদা দেন। তাই লেখাগুলি যে পোস্ট-এডিটরিয়াল হিসেবে দুই পত্রিকায় (মুখ্যত "উত্তরবঙ্গ সংবাদ") ছাপা হয়েছিল তার জন্য ধন্যবাদ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার শ্রীকামদাপ্রসাদ ভৌমিক ও শ্রীনিধুভূষণ দাস সব সময় আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। ভুল ধরেছেন। কখনও কখনও শুধরে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদের অসংখ্য কর্মীর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। তবুও বন্ধুবর শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তীর (উঃ বঃ সংবাদ) নাম না করলে অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত হবে। তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

পঃ বঙ্গের কালচারাল জগৎ কি দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে? একদিকে কোলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গ আর অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ। সমস্যাটা বোঝা দরকার। উত্তরবঙ্গ থেকে কোলকাতার বহু পত্রিকা বর্তমানে বের হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের জন্য দু-চার পাতা যোগ করে তাঁরা একটি উত্তরবঙ্গ Suppliment বের করেন। এটি আবার দক্ষিণবঙ্গের পাঠকদের কাছে যায় না—কোলকাতাতেও যায় না। মনে হয় কোলকাতার বিখ্যাত পত্রিকার মালিক ও এডিটররা মনে করেন যে উত্তরবঙ্গের সমস্যা কোলকাতাবাসীদের না জানালেও চলে যায়। অর্থাৎ Commercialisation of Culture যত বাড়ছে উত্তর ও দক্ষিণের বিভাজন ক্রমশ বাড়ছে। এই পার্থক্য কোলকাতার বিখ্যাত "মনীষী" বলে যাঁরা নিজেদের জ্ঞান করেন তাঁরাই করেন। পঃ বঙ্গের কালচারাল জগৎ যদি সত্যি দ্বিখণ্ডিত হয় তবে তার দায়ভার কোলকাতাকেই বহন করতে হবে। পঃ বঙ্গ মানে শুধু কোলকাতা নয় তা বুঝবার সময় এসেছে। না বুঝলে—Fire Next Time

উত্তরবঙ্গে চতুর্দিকে আজ আগুন। নানান আন্দোলন। কেউ কেউ নামকরণ করতে ভালোবাসেন—বলেন, "বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন"। লেবেল কোলকাতার নেতা-মনীষীরাই দেন। তবে ভুক্তভোগী উত্তরবঙ্গের দেড় কোটি লোক। ৫৭ বছর পর উত্তরবঙ্গ শিল্পবিহীন। চা-শিল্প যা ছিল তা রুগ্ন। চা-বাগানের হেড্ অফিসগুলি উত্তরবঙ্গ থেকে কোলকাতায় অধিকাংশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দরকার মতো

কোলকাতার মালিকবাবুরা আসেন আর বাগানগুলি বন্ধ করে দেন। আর শ্রমিকরা না খেয়ে মারা যান। তাঁরা অবশ্য আদিবাসী শ্রমিক। তাঁদের কথা কালকাতায় পৌঁছায় না। কাঁঠালগুড়ি চা-বাগানেব ১০০ থেকে ১৫০ শ্রমিক না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। অবশ্যই তাঁরা আদিবাসী। না, এইসব খবর কোলকাতায় পৌঁছয় না। অমর্ত্য সেনের থিওরি নিয়ে আমরা লাফ-ঝাঁপ করি। গণতন্ত্রে নাকি মানুষ না খেয়ে মরে না। গণতন্ত্রেও যে মানুষ না খেয়ে মারা যায় তা জানবার জন্য অমর্ত্য সেনকে উত্তরবঙ্গে আসতে হবে।

আবার কেউ কি জানেন যে উত্তরবঙ্গ 'ভিত্তিপ্রস্তর'' অর্থনীতি। কোলকাতা থেকে মন্ত্রীরা আসেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করেন আবার চলে যান। তিস্তা ব্যারেজ শেষ হয় না ৩০ বছব পার হয়ে গেল। তোর্ষা ব্রিজ শেষ হয়েছে—তবে সময় লাগল ৪০ বছর। কাজ আরম্ভ হয় শেষ হয় না।

বর্ষার সময় বন্যা-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয় বর্ষায় বাঁধ ভেঙে যায়। যেমন মালদহে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনো নীতিই নেই। যদি থাকে তবে কোলকাতার মন্ত্রীর দপ্তরে ফাইল-বন্দী। কলেজ আরম্ভ হয় শিক্ষকের অনুমোদন আসে না। শিক্ষক ছাড়াই যে কলেজ হতে পারে তার জন্য আসতে হবে উত্তরবঙ্গে। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত পঃ বঙ্গ যোজনা কমিশনে উত্তরবঙ্গের একজনও প্রতিনিধি ছিল না। অবশ্য মহারাষ্ট্র থেকে ছিল। পিঠ চাপড়ানো ব্যাপার আর কি? তবে এবার যোজনা কমিশনে উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে। তার জন্য অবশ্যই চিৎকাব কবতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারেব বহু টাকা ফেরত যায়। খবচ হয় না। উত্তরবঙ্গ যোজনা পর্ষদ তৈরি হয়—তবে অর্থের বরাদ্দ থাকে না। উত্তরবঙ্গ নাকি তিনটি "T" র জন্য বিখ্যাত। Timber, Transport আর Tea। তিনটি "T" এখন ভগ্নদশায়। বন কাটা চলছে তো চলছে। গাছকাটা লাভজনক ব্যবসা। Transport চালাতে গেলে 'তোলা' দিতে হবে। আর Tea-র সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো। বর্তমানে একদল মাফিয়া-মালিক চা বাগান নিয়ন্ত্রণ করছে। অবশ্য সবাই মাফিয়া নন। অনেক বনেদি প্ল্যান্টারও আছে---তবে আপাতত তারা বধির বা অথর্ব।

বিভিন্ন স্থানীয় পত্র-পত্রিকার জন্য লিখি। আমার স্ত্রী ডঃ অমিয়া দাশগুপ্তা আমাকে সব সময় সাহায্য করেন। আর অনেক লেখাই ধরে নিতে হবে তিনিই 'যুগ্ম' লেখক। আমার ছেলে নীলাঞ্জন, ছেলের বৌ বেটি আব আমার তিন মেয়ে ডঃ ঝিনুক, ডঃ শুক্তি, ডঃ নৈবঞ্জনা সব সময় আমার জন্য লেখার পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমার জামাইরা প্রেরণা জোগায় আব সবচেয়ে বেশি তাগাদা দেয় তিন নাতনী—তিস্তা, তোর্ষা, আর ঝোরা। এছাড়া আমার দাদারা, ভাই, দিদিরা, বোনেরা লেখবার জন্য উৎসাহ দেয়। আর ভাগ্নে, ভাগ্নী, ভাইপো, ভাইঝি—নিয়ে আমার বিরাট পরিবার। তারা আমার ভাষা নিয়ে ভুল ধরে, তথ্য নিয়ে আপত্তি জানায়-- আর তাদের আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনার ডাইলেকটিক্স আমাকে

নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয়। ওরা ভুল ধরে। আমি সংশোধন করার চেষ্টা করি। যদি তাতেও ভুল থাকে তবে দায়ী আমি।

আমার মেজদি শ্রীমতী মীরা রায়চৌধুরীর লেখাপড়া শান্তিনিকেতনে। আমার বড়দিদি আর মেজদি দু'জনেই শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। সে বহু কালের কথা। হঠাৎ আমার মেজদি শ্রীমতী মীরা রায়চৌধুরী (পুরুলিয়া-নিবাসী) মারা যান। হয়তো বয়েস হয়েছিল, হয়তো অসুখে জর্জরিত। এই বইটিতে তাঁকে স্মরণ করলাম।

আর স্মরণ করলাম আমার সবচেয়ে বড় ভাগ্নেকে। হঠাৎ আকস্মিক দুর্ঘটনায় সমুদ্রে মারা যায়। হঠাৎ মৃত্যু। সে ছিল কৃতী ছাত্র ও বৈজ্ঞানিক। থাকত পুনায়। নাম রাহুল, সেটা তার বাড়ির নাম। ভালো নাম দ্বৈপায়ন সেনগুপ্ত।

শিলিগুড়ি **মানস দাশগুপ্ত**

১৫ই ডিসেম্বর

সূচিপত্র

তিস্তা, ঝোরা, তোর্ষাকে—

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন সমস্যা ও সমাধানের উপায়

১. উত্তরবঙ্গবাসীরা আত্মবিস্মৃত—
North Bengal That Splendour It was

উত্তরবঙ্গ মানে ছয়টি জেলা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এক সময় এই প্রত্যেক অঞ্চল ছিল সম্পদে বিত্তশালী। ইতিহাসেও এই অঞ্চল বাংলার তথা ভারতের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতির পীঠস্থান। সংস্কৃতির উন্নতি অনেক সময়ে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে। যেহেতু অর্থনৈতিক কাঠামো এই অঞ্চলে একদা ছিল সুদৃঢ় তাই সংস্কৃতির উন্নতি ছিল দ্রুত—সতত সঞ্চরণশীল। উত্তরবঙ্গে বর্তমানে যে কটি জেলা—তার ইতিহাস দীর্ঘ ও প্রাচীন।

কোচবিহার ঃ বর্তমানে যাকে আমবা কোচবিহার বলি তার পুবাকালে নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। পরে নামের পরিবর্তন হয়। কখনও বলা হয় কামরূপ। আবার তন্ত্র সাহিত্যে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চল সুবর্ণপীঠ, রত্নপীঠ, যোনীপীঠ ও কামপীঠ ইত্যাদি বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এই অঞ্চল ছিল বিস্তৃত। হয়তো বা তান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ এই অঞ্চলে ঘটেছিল। তবে এই অঞ্চলের কোচ শাসন প্রায় সাড়ে চারশ বছর টিকেছিল (১৫১০-১৯৪৯)। এত দীর্ঘস্থায়ী রাজত্ব হয়তো ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। আমরা যাকে বাংলা গদ্য বলি তার প্রথম আবির্ভাব হয় এই কোচবিহারেই। ঐতিহাসিক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন—"বাংলা গদ্য সাহিত্যের যখন সৃষ্টি হয় নাই তখন ভুটান, কোচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছারের নরপতিগণ বাংলা ভাষায়ই পরস্পরের সহিত ও ইংরেজদের সহিত পত্রালাপ করিতেন।" বাংলা ভাষার সৃষ্টির মূলে কোচবিহারের রাজা ও রাজ্যের জনগণের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু বাংলা ভাষাই নয়, অসমীয়া সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তৎকালীন কোচবিহার। অর্থাৎ একসময় এই কোচবিহার

ছিল বাংলা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র।

পশ্চিম দিনাজপুর ঃ পঃ দিনাজপুরের ইতিহাস এতই প্রাচীন যে তার কোথায় আরম্ভ তার আবিষ্কার এখনও হয়নি। এ কথা বলা চলে যে, বরেন্দ্রভূমি ও করতোয়া প্রাচীন মানব সভ্যতার সূতিগৃহ! ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন সম্পদের রত্নখনি। বাণগড় সহ ঘোরাঘাট, সীতাকোট, দেবকোট, মহিমসন্তোষ, লেকমর্দ, বেলওয়া, ভেলুয়া, কান্তানগর, চরকাই, চণ্ডীপুর, ভিতরগ্রাম, বৈল্লাম, গোপালগঞ্জ, গড়মল্লিকপুর, প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত অতীতের কোনো না কোনো প্রত্নকীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে শুঙ্গ ও কুষাণ আমলেরও কিছু কিছু প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে। পঃ দিনাজপুরের আজকের নাম হয়তো ইতিহাস বিবর্তনের ফলে হয়েছে। তবে এই অঞ্চলকে একদা পুণ্ড্রবর্ধন নামে অভিহিত কবা হত। পুণ্ড্রবর্ধনের কোটিবর্ষ ও পঞ্চ নগরীর বিবরণ প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসেও পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধনে দুটি অঞ্চল বিখ্যাত—কোটিবর্ষ ও পঞ্চনগরী। অবস্থানগতভাবে এই দুই অঞ্চলই ছিল দিনাজপুরের অন্তর্গত। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমীব বিবরণে পঞ্চনগরীর বিশেয উল্লেখ আছে। টলেমীর মানচিত্রে গ্রীক ভাষায় পঞ্চনগরীর নাম পেন্টাপলিশ। কোটিবর্ষ নগরের অপর নাম বাণগড়। এখানকার ইতিহাস কত প্রাচীন তা হয়তো জানার উপায় নেই। এখানে পাল তাম্রশাসন, কম্বোজ রাজার স্তম্ভলিপি ভাস্কর্যময়। অধিকাংশ পুরাকীর্তি গুপ্ত, শুঙ্গ, কুষাণ ও পাল আমলের। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং বাংলাদেশের যে দুই স্থানে যান তার মধ্যে একটি পুণ্ড্রনগর, অন্যটি তাম্রলিপ্ত। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে যে পাল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় তার সঙ্গে দিনাজপুরের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রাজবংশ প্রায় ৪ শত বর্ষ রাজত্ব করেন।

বাঙালির ইতিহাসের লেখক ডক্টর নীহাররঞ্জন সেনের মতে, দিনাজপুর অঞ্চল অন্য এক কারণে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর কথায়, 'কৈবর্ত্য বিদ্রোহ' ছিল সাধারণ প্রজাশক্তির এক বিস্ময়কর ঘটনা—যা অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে এক পথ-নির্দেশিকা।

আমার নিজস্ব ধারণায় দিনাজপুরের সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিকের বক্তব্য অর্থনীতির দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক মেহরাব আলী জানতে চেয়েছেন যে কৃষি ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোথায় প্রথম আরম্ভ হয়? একদলের মতে কৃষি ব্যবস্থা প্রথমে হয় মিশর বা ইজিপ্টে। হয়তো তা সত্য। তবে প্রায় একই সময় কৃষি ব্যবস্থা করতোয়া নদীর উর্বর জমিতেই প্রথম আবিষ্কাব হয়। অর্থাৎ হয়তো একই সঙ্গে নীল, তাইগ্রীস, করতোয়া অঞ্চলে কৃষি, কৃষির জন্য সেচব্যবস্থা, বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ, পূর্ত দপ্তরের আবির্ভাব মানুষের ইতিহাসে এই করতোয়া অঞ্চলেই হয়। আর কৃষি সভ্যতা যে আর সব সভ্যতার মাতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ সভ্যতার উন্মেষ যে অঞ্চলে হয় সেটি আমাদের উত্তরবঙ্গেরই একটি অংশ। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বর্তমানে এই জেলাটি উত্তর ও দক্ষিণ

দিনাজপুর দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

মালদহ ঃ 'মালদহ' কথাটির অর্থই হচ্ছে ধনসম্পদের জায়গা। বর্তমান মালদহ জেলার ইতিহাস ভারতবর্ষেরই আদি ইতিহাস আর মালদহ বা গৌড় বাদ দিয়ে ভারতের কোনো সংস্কৃতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ। যাকে আমরা গৌড় বলি তার ইতিহাস এতই প্রাচীন যে এত বিভিন্ন রাজত্ব, ধর্মপ্রচার, পুস্তক রচনা ইত্যাদি হয়েছে যার হিসাবও আজ পূর্ণ হয়নি। হিন্দু, বৌদ্ধ ও পাঠান, ইসলাম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই মালদহ। বহুবার নদীর গতিপথ পরিবর্তনে রাজধানীরও পরিবর্তন হয়েছে। তবে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল যে এখানে সিল্ক-মশলিন রেশম বস্ত্র ও গুড় রপ্তানিযোগ্য পণ্য তাই এই জেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল সুদৃঢ়।

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল এককালে ঘন বনে ঢাকা। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে প্রকৃতির অপূর্ব দান উজাড করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যে, এখানে নদী বন্দর তখনকার দিনে যাতায়াতের জন্য সতত ছিল ব্যস্ত। এছাড়া তিব্বত-চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই হত। অর্থাৎ স্থলপথে বা গিরিপথে জলপাইগুড়ি বহুকাল যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। শ্রীপরিতোষ দত্তর মতে, জল্পেশের শিব মেলা উপলক্ষে ভোট তিব্বত থেকে ঘোড়া, কম্বল, বনসম্পদ নিয়ে আসত আর বিনিময়ে কাপড়, নুন, বস্ত্র ইত্যাদি তিব্বতীরা নিত। তাঁর মতে বিকল্প হিসাবে জলপাইগুড়ি কথাটির সাথে তিব্বতী ভাষার সংযোগ আছে। জলপের অর্থ দাঁড়ায় ''ভারতের পূর্ব দিকে কম্বলাদি গরম জিনিস বিনিময় কেন্দ্র''। এ যুক্তি হয়তো অনেকে মানবেন, অনেকে মানবেন না—তবে এই অঞ্চলে যে এক বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল তা বলাই বাহুল্য। যদিও এককালে এই জেলার বহু অংশ জঙ্গলে আবৃত ছিল। এর প্রাচীনত্ব ইতস্তত ছড়ানো পুরাকীর্তির মধ্যে আছে। এ অঞ্চলের পুরাকীর্তিগুলো মোটামুটি তিনটি এলাকায় কেন্দ্রীভূত। ক) জহুরী-তালমা, খ) ময়নাগুড়ি অঞ্চল ও গ) চিলাপাতা অঞ্চল। জহুরী তালমা অঞ্চলের উঁচু প্রাচীরকে সাধারণ লোকেরা বলে ''পৃথুরাজার গড়''। এখানে অন্তত দশটি পাল-সেন যুগের অসামান্য ধাতুর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ময়নাগুড়ি অঞ্চলে অবস্থিত বিখ্যাত জল্পেশ মন্দির। জল্পেশ মন্দিরের উল্লেখ কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্রে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের কিছুদূর বিশাল (কিন্তু) ভগ্ন গণেশের আরও অনেক মূর্তি পাওয়া যায়। এছাড়া এই অঞ্চলে আছে জটিলেশ্বর পূর্বদহ মন্দির। এ ছাড়া চিলপাতা অরণ্যে নলরাজার গড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক মন্দিরে বৌদ্ধ ছাপও স্পষ্ট। এই সঙ্গে জলপাইগুড়ির বর্তমান রায়কতপাড়ার কাছে পাওয়া গেছে বৌদ্ধ অবতার অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ মূর্তি। বিভিন্ন জায়গায় ইতস্তত যা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়ানো আছে তাতে বোঝা যায় প্রাচীনকালে এই অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধ—ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। আরেকটি কারণে জলপাইগুড়ি

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ও বর্তমানে জলপাইগুড়ি শহর ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ কেন্দ্র যা সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহ অন্তত ৪০ বছর চলেছিল। ইতিহাস সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে। কিন্তু তার ৯০ বছর আগে অন্তত সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ হয়। আর এই বিদ্রোহ হিন্দু-মুসলমান একত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আমরা ইংরেজদের বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চোখেই এই বিদ্রোহকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। ব্যতিক্রম অবশ্য স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর "বন্দেমাতরম" কথাটির উৎপত্তি কি আমাদের জলপাইগুড়ি অঞ্চল? হয়তো এ নিয়ে বিতর্ক আছে। মনে রাখা দরকার, উত্তরবঙ্গ বিদ্রোহের জায়গা ছিল। সহজে সব জিনিস বিশেষত অত্যাচার মাথা পেতে নেয়নি। বলা বাহুল্য অনেক প্রাচীন ইতিহাস এখনও আমরা ভালো করে জানি না।

দার্জিলিং ঃ বাকি অঞ্চলের তুলনায় দার্জিলিং জেলার ইতিহাস বোধহয় অত প্রাচীন নয়। দার্জিলিং জেলা ইংরেজদের সৃষ্টি। যদিও এই অঞ্চল এককালে "মোরাঙ্গ" বলে কথিত ছিল। তথ্যমূলক বিস্তারিত ইতিহাস এই অঞ্চলে প্রায় অনুপস্থিত। তবুও কালিম্পং-এ প্রথমে ওয়াল্‌স ও পরে শ্রী পরেশ দাশগুপ্ত কমপক্ষে চারশ'র বেশি নানা প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছেন। তবে দার্জিলিং পাহাড়ে অনেক মঠে দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধগ্রন্থাদি ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। আর অনেক মঠের প্রাচীনত্ব আজও আমরা জানি না। অনেক তিব্বতী ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি, যা বিভিন্ন মঠে ছড়িয়ে আছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকাও প্রস্তুত হয়নি। হয়তো আমরা যদি কোনোদিন এর পাঠোদ্ধার করতে পারি তবে আমাদের বহু লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে।

বস্তুত উত্তরবঙ্গের এই ছয়টি জেলা ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। আমরা আত্মবিস্মৃত। তাই এই প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এখনও পুরো জানতে পারিনি। যেটুকু জানি তা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, ভাষা, ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে হাজার বছর ধরে টিকে আছে। এই হাজার বছরে ভারতের সংস্কৃতির মহাসাগরে আমাদের এই অঞ্চলের দান অবিস্মরণীয়। তিনটি ধর্মের মিলন এই উত্তরবঙ্গেই হয়েছে যেমন হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ। যদিও এর একাঞ্চলে একদা জৈন ধর্ম বিশেষ প্রসাব লাভ করেছিল। কথিত আছে, গুরু নানকও এখানে কিছুদিন ছিলেন।

এখানকার প্রত্নখনি, মন্দির, মসজিদ, মঠ অতীতের বিরাট ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করে আসছে। তবুও কয়েকটি কথা অর্থনীতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, হয়তো বা স্থায়ী সভ্যতা ও কৃষি যাকে আমরা বলি Settled cultivation তার আরম্ভ হয় করোতোয়া নদীর অববাহিকায় বা দিনাজপুর অঞ্চলে।

দ্বিতীয়ত, দুটি ভাষার বর্তমান রূপান্তরে বিশেষত গদ্য সাহিত্যে কোচবিহারের কাছে আমরা ঋণী। এই দুটি ভাষা বর্তমান বাংলা ও অসমীয়া।

২. উত্তরবঙ্গে জনসংখ্যার স্ফীতি—বর্তমান যুগ

জনসংখ্যা যদি অভূতপূর্বভাবে হঠাৎ বেড়ে যায় তার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হতে বাধ্য। এই বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য চাই আহার, বাসস্থান ও পরিচ্ছদ। আর চাই চাকরি। বেকারিত্ব আমাদের সমাজ ব্যবস্থার নানান অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। যে হারে বেকারি উত্তরবঙ্গে বিদ্যমান এবং যে হারে ভূমির উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে ভাবে যথেচ্ছ বন নিধন হচ্ছে তাতে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা জনকল্যাণমুখী নীতি গ্রহণ না করতে পারি তবে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ ধ্বংস হবার সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে তার জন্য নিচে একটি সারণি তৈরি করা হল। সারণিটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি ভারত বিভাগের আগে ও অপরটি ভারত বিভাগের পরে।

সারণী—১ শতাংশ হিসাবে দশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

দেশ বিভাগের আগে

	১৯০১-১০	১৯১১-২১	১৯২১-৩১	১৯৩১-৪১	১৯৪১-৫১
পঃ বঙ্গ	+৬.২৫	—২.১১	৪.১৪	২২.৯৩	১৩.২২
কোচবিহার	+৪.৫৮	-০.০৭	-০.২৬	+৮.৪৩	+৪.৭৪
জলপাইগুড়ি	+২১.৩০	+৪.৯৩	+৬.৪৭	+১৪.৪২	+৪.১৩
দার্জিলিং	+৫.৩১	+৫.১২	+১২.৮৬	+১৭.৭২	+১৭.৫৮
দিনাজপুর	+৬.৭৮	-১২.১৩	+৭.২৩	+১১.৯২	+১৭.০৩
মালদহ	+১৫.৭২	-১.৭৭	+৪.৯৯	+১৭.১৯	+১১.০৫

সারণী—২ শতাংশ হিসাবে দেশ বিভাগের পর

	১৯৪১-৫১	১৯৫১-৬১	১৯৬১-৭১	১৯৭১-৮১	১৯৮১-৯১
পঃ বঙ্গ	১৩.২২	৩২.৮০	২৬.৮৭	২৩.১৭	২৪.৫৫
কোচবিহার	৪.৭৪	৫২.৪৫	৩৮.৬৭	২৫.২৮	২১.৮২
জলপাইগুড়ি	৪.১৩	৪৮.২৭	২৮.৭৬	২৫.২৮	২১.৮২
দার্জিলিং	১৭.৫৮	৩৫.৯০	২৫.১৬	৩১.০২	৩০.৪০
দিনাজপুর	১৭.০৩	৩৫.৫১	৪০.৫০	২৯.৩১	৩০.২৫
মালদহ	১১.০৫	৩০.৩৩	১১.৯৮	২৬.০০	২৯.৬৩

(সেনসাস্ ১৯৯১)

এই সারণী থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার—ভারত বিভাগেব আগে এই

জেলাগুলিতে লোকসংখ্যা বেড়েছিল তবে তার হার ছিল স্বাভাবিক বা নর্মাল। ভারত বিভাগের পর এই জেলাগুলিতে অস্বাভাবিক হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। Migration এই অঞ্চলে অত্যধিক—এবং কোনো সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাধারণ হার এই হার বেশি হবার প্রধানতম কারণ Migration এখানে সদা-নিয়তই হচ্ছে। তার কারণ আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে ও রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা। এই Migrationকে যদি আমরা স্থিতাবস্থায় না আনতে পারি তবে জনসংখ্যার হার অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাবে। এই শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা দু'বার দ্বিগুণ হয়েছে। হয়তো বা ২০০০ সালের মধ্যে আরেকবার দ্বিগুণ হবে। যা হিসেব তা হচ্ছে আমরা যদি এই লোকসংখ্যার হার কমাতে না পারি তবে আবার আগামী ১৭ বছরে জনসংখ্যা আবার দ্বিগুণ হবে। তার মানে তাদের শুধু বর্তমান অবস্থায় রাখতে গেলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে, লেখা-পড়া-ইস্কুল সেগুলোকেও দ্বিগুণ করতে হবে। অর্থাৎ আগের থেকে যদি পরিকল্পনা না করা হয় তবে সমস্যা ক্রমশ বাড়বে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকেও বড় সমস্যা জনসংখ্যার প্রতি কিলোমিটারে ঘনত্ব বা Density of Population। উত্তরবঙ্গের Density of Population দ্রুতহারে বাড়ছে। নিচে একটি সারণী দেওয়া হল।

সারণী—৩ প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব

	১৯৮১	১৯৯১	
কোচবিহার	৫২৩	৬৩৭	৮২%
জলপাইগুড়ি	৩৫৬	৪৪৮	৭৯%
দার্জিলিং	৩২৫	৪২৪	৭৬%
দিনাজপুর	৪৪৯	৫৮৫	৭৬%
মালদহ	৫৪৪	৭০৬	৭৯%

(সেনসাস ১৯৯১)

এখানে মনে রাখা দরকার যে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান বন ও পাহাড় আবৃত থাকায় বসবাসের উপযুক্ত জায়গা কম। সমতলভূমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই বেশি। এই অঞ্চলে কৃষিজমি ও সমতলভূমি অন্যান্য অঞ্চল থেকে কম। ঘনত্ব বৃদ্ধি মানে এই জনসংখ্যা এখন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তাদের খাদ্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ক্রমশ কমে যাবে। ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে বেকারি বৃদ্ধির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। অনুন্নত দেশে আমরা এর কুফল সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র পঃ বঙ্গ থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। এটা বোঝাবার জন্য সারণী দেওয়া হল।

সারণী—৪ শিক্ষার হার—১৯৯১ (Crude Literacy Rate)

	পুরুষ	স্ত্রী
পঃ বঙ্গ	৫৬.৫৫	৩৮.৯৫
কোচবিহার	৪৬.৮৩	২৭.৭১
জলপাইগুড়ি	৪৬.৬৭	২৭.৬১
দার্জিলিং	৫৬.৪৬	৪৫.৮২
পঃ দিনাজপুর	৪০ ২২১	২০.০২

(সেনসাস ১৯৯১)

শিক্ষার হারে দেখা যাচ্ছে দার্জিলিং জেলা ছাড়া অন্য সব জেলা পঃ বঙ্গের গড় থেকে কম। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে এই হার পঃ বঙ্গেব গড় থেকে প্রায় দশ শতাংশ কম---আর মালদহে প্রায় ২০ শতাংশ কম। এখন অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেছেন শিক্ষার হারের সঙ্গে উন্নতির সম্পর্ক আছে। বিশেযত যেখানে স্ত্রী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম সেখানে উন্নতি দ্রুত করার প্রচেষ্টা সফল হবে না। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, মকবুল হক্ প্রমুখের তত্ত্বে ও ইউনাইটেড্ নেশনস্ সর্বত্রই এখন HDI (Human Development Index) মাপার চেষ্টা হচ্ছে। এই HDI-তে শিক্ষার হাব একটি দরকারি মাপক ও সূচক। যেহেতু আমাদের জেলাগুলিতে শিক্ষার প্রসার কম, ইস্কুল, কলেজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা কম তাই HDI-তে আমাদের জেলাগুলির স্থান পঃ বঙ্গে ১৮টি জেলার মধ্যে একেবারে নিচের দিকে। এই শিক্ষার হার পঃ বঙ্গের গড়ের কাছাকাছি নিয়ে যাবার জন্য যে বিনিয়োগ শিক্ষাখাতে করা দরকার তাব কথা কোলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গেব দূবত্বের ফলে চিন্তা করা হয় না। HDI বা Human Development Index ছাড়া অমর্ত্য সেনের ও ইউনাইটেড নেশনসের আরও দু'টি সূচক আছে। একটি HDM অপরটি CPM।

HDM মানে (Human Deprivation Measure) আর এখানে তিনটি জিনিস সাধারণত ধরা হয়—(১) বিশুদ্ধ পানীয় জল কতটা পাওয়া সম্ভব ও শিশুর জন্ম-মৃত্যু পাঁচ বছর পর্যন্ত গড় থেকে কত কম বা বেশি। (২) কত লোক অশিক্ষিত আর কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে আর (৩) আয়েব দিক থেকে বাঁচবার জন্য যা ন্যূনতম তা পাচ্ছি কি না? HDM-Index-এ উত্তরবঙ্গের স্থান নিচু হতে বাধ্য, কারণ আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার, আয়ের উৎস ক্রমশ কমছে। এ বিষয়ে যা তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। যেমন দার্জিলিং-এর কথাই ধরা যাক। এই শহরে জলের যা সংকট তা পঃ বঙ্গের অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

এছাড়া আছে CPM অর্থাৎ (Capability Poverty Measure) আর এখানে আমরা তিনটি জিনিসের উপর জোর দিই। (১) কত বাচ্চা জন্মাবার সময় শিক্ষিত নার্স বা ডাক্তারের সাহায্য পেয়েছে। (২) পাঁচ বছরেব নিচে অপুষ্টিজনিত কাবণে নানান অসুখ বিসুখ ও কতখানি ওজন কম। (৩) আর স্ত্রীলোকদের অশিক্ষাব

হার। এখানে বলাই বাহুল্য আমাদের উত্তরবঙ্গের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে কি নেই, চলে কি চলে না অবস্থা। ওষুধ পাওয়া যায় কিনা, ডাক্তার থাকে কি না ইত্যাদি "গবেষণার" বিষয়। এই বিষয়ে সরকারি তথ্য আর বেসরকারি তথ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক। বস্তুত স্ত্রী শিক্ষার দিক থেকে আমরা এতই অনগ্রসর যে সেটা আমাদের জাতীয় লজ্জা হওয়া উচিত।

অর্থাৎ যে-কোনো "Development with Justice" আজকে যাকে বলা হচ্ছে "ন্যায় সঙ্গত উন্নতি" তার তিনটি সূচক সাধরাণভাবে বলা হয়। একটি Human Develompment Index (HDI) অন্যটি Human Deprivation Measure (HDM) আর অন্যটি Capability Poverty Measure বা (CPM)। যা সংখ্যাতত্ত্ব আমরা পাই, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের যে বর্ণনা আমরা পাই, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এখনও অনেক জায়গায় এতই কম, ইস্কুল ছেড়ে যাবার প্রবৃত্তি দারিদ্র্যর কারণে এতই বেশি যে এই তিনটি সূচকেই আমাদের উত্তরবঙ্গ সামগ্রিকভাবে পঃ বঙ্গের গড় থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছে আর এই গড় থেকে পার্থক্য যদি কমাতে চাই তবে যে ধরনের বিনিয়োগ দরকার আর সদিচ্ছার প্রয়োজন প্রায়শ সেটা নেই। আমরা শুধু পিছিয়ে আছি তাই নয়, পার্থক্যও হয়তো ক্রমশ বাড়ছে।

৩. উত্তরবঙ্গে পরিবেশের ধ্বংস—(Eco-Catastrophe)

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি? নানান মুনির নানান মত হতে পারে, তবে একবাক্যে সবাই স্বীকার করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এক উত্তরবঙ্গকে রেখে যাব যা প্রকৃতিকে ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছে। প্রকৃতি ধ্বংস হলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়—আর এই প্রতিশোধ আজ প্রচণ্ড হচ্ছে ঘন ঘন বন্যায়, ভূমিক্ষয়ে, অরণ্যের সংকোচনে আর পাহাড়ি ধসে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে প্রাকৃতিক কারণে ঘন ঘন বন্যা। বহু নদীই উত্তরবঙ্গকে বন্যায় ভাসাচ্ছে। এক একটা বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ কয়েকশ' কোটি টাকা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে, বন্যা আগেও হত—তবে এখন বন্যার সময়সীমা বা Time Gap ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আগে বড় ধরনের বন্যার Time Gap ছিল ২০ থেকে ৩০ বছর এখন বন্যার Incidence বড়জোর ২ থেকে ৩ বছর। অর্থাৎ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আমরা সব সময় বন্যার ভয়ে আতঙ্কিত হয় থাকব। একটা বন্যা মানে ভূমিক্ষয়, জমির অবক্ষয়, শহর-গ্রামের ধ্বংস, ব্রিজের ধ্বংস, রাস্তার ধ্বংস। অর্থাৎ বন্যা প্রতিরোধে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অন্তত দুই-বছরের Gap-এ বন্যার ফলে উত্তরবঙ্গেব উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কারণ উন্নয়নমূলক কাজগুলি বন্যার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর প্রতিকার করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন সহ উত্তরবঙ্গ বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে তার তহবিল থেকে বন্যা প্রতিরোধে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

কোচবিহার জেলাতে বন্যা ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধে কয়েক কোটি টাকার প্রকল্প রাজ্য সরকারের কাছে ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। ১৯৯৯ সালে বন্যা ও ভূমিক্ষয় মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কোচবিহারের সেচ বিভাগের জন্য মঞ্জুর করেছে মাত্র ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কোচবিহারের ঠিকাদারদেরই পাওনা সেচ দপ্তরের কাছে প্রায় চার থেকে পাঁচ কোটি টাকা। এই অবস্থায় কোচবিহারের সেচ বিভাগ একেবারে অসহায়। কোচবিহারের সেচ বিভাগে বন্যা ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধকল্পে ৩৯টি প্রকল্প মঞ্জুর থাকলেও রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেননি। ঠিকাদারদের পাওনা মেটানো সম্ভব হয়নি। তোর্ষার প্রকোপ থেকে কোচবিহার সদর মহকুমা, ইচ্ছামারী বাঁধের কাজ টাকার অভাবে কখনও চালু কখনও বন্ধ। আবার মানসাই নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার প্রকল্প নেওয়াই হয়নি।

উদাহরণ হিসেবে আবার বলা যায় ভুটান-সিকিমে বর্ষণ হলে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা হবার সম্ভাবনা। তার জন্য অন্তত ভুটান সরকারের সঙ্গে যে জয়েন্ট রিভার কমিশন (Joint River Commission) করার দরকার ছিল তার চেষ্টা কোনোদিনই হয়নি। কোচবিহার জেলায় সাতটি নদীকে ভয়ঙ্কর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই নদীগুলো হল তিস্তা, কালজানি, তোর্ষা, রায়ডাক, সংকোশ, মানসাই ও জলঢাকা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভুটান ও সিকিম রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি রাখার কথা ছিল তা হয়নি। হবার কোনো চেষ্টা হয়েছে কিনা জানা যায় না। অথচ এই ধরনের যৌথ প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি। উপরন্তু "সেচ দপ্তরের" টাকা নেই বলে যেভাবে হাত গুটিয়ে আছে তাতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। সরকারি দপ্তরের অর্থাভাবের অজুহাতে মানুষ ভিটেছাড়া হবে, কৃষিজমি হারাবে, জীবনের সম্বল হারাবে, এটা কোনো কার্যকরী কথা নয়। আবার মালদহ জেলায় গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ ভিটে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। মানুষ, জীবন, অর্থ, জমি, ভাত-কাপড়-আশ্রয় সবই "অর্থাভাবের" অজুহাতে নষ্ট হবে ও ধ্বংস হলে তার ক্ষতির পরিমাণের কোনো হিসেব হতে পারে না।

কোচবিহার-দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-মালদহ অঞ্চলে নদী নিয়ন্ত্রণে কোনো মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে এমন কোনো খবর নেই। ফি বছর বর্ষাতেই নদীভাঙ্গন ঠেকাতে সেচ দপ্তর বাঁশের খাঁচা ও জালি তৈরি করে শালখুঁটি বসিয়ে ভাঙন রোধের চেষ্টা করে। স্থায়ী নদী বাঁধ হচ্ছে না। অস্থায়ী বাঁধ বর্ষা শেষ হবার আগেই ভেঙে যায়। বছর তিন আগে বলরামপুরের সারেয়ার পাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁশের খাঁচা ও জালি তৈরি করেও তোর্ষার ভাঙন রোধের চেষ্টা বিফল হয়েছে—মানে টাকাটা জলেই গেছে। হারিয়ে গেছে জোড়াতালি বাঁধ। তুফানগঞ্জের নাককাটিগছ গ্রামেও রায়ডাক নদীর ভাঙন ঠেকাতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বাঁধ টেকেনি। ভাঙন কবলিত এলাকা ক্রমশ বাড়ছে। আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

তুফানগঞ্জের নাককাটিগছের দেবগ্রামে ৫০০ মিটার ও চাপড়ের পাড়ে ৮০০ মিটার গাইড বাঁধের জন্য ১৯৮৯ সালে অর্থ অনুমোদন হয়েছিল। অর্থাভাবে কাজ হয়নি। পরবর্তীকালে একইভাবে নাটাবাড়ি, কৃষ্ণপুর ও বালাভূতের খোনাপাড়াতে ভূমিক্ষয় প্রকল্প, মহিষকুচির গেদারচর বন্যা রোধে ৩৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার প্রকল্প, নাটাবাড়ির ভুজুঙ্গামারী নদীভাঙন রোধে ৪০ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন পেলেও অর্থাভাবে বাতিল হয়েছে। কালজানির নদীর ভাঙন ঠেকাতে চিলাখানা, বেলাকোবা, বালাভূত, রায়ডাক নদীর চাপড়ের পাড় ও হরিপুর এবং তোর্ষার ভাঙন প্রতিরোধে ইচ্ছামারী, লংকাবর, চাপাগুড়ি, পূর্ব গুড়িয়াহাট ও পালপাড়ার ভাঙন রোধে, রাখালমারি ও শিবপুরে প্রকল্প আরম্ভ হলেও অর্থাভাবে হয় কাজ আরম্ভ হয়নি অথবা কাজই শুরু হয়নি।

বোল্‌ডার সংগ্রহ নিয়ে বন দপ্তর ও সেচ দপ্তরের মধ্যে নানান গোলমাল। সম্প্রতি কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি বনবিভাগের আজ্ঞাধীন নদী থেকে বোল্‌ডার তুলতে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক। ফলে অর্থাভাবই নদীবাঁধ নির্মাণের প্রধান অন্তরায়।

বন্যার ফলে শুধু যে ভিটেমাটি ও কৃষিজমি ক্ষয় হচ্ছে তা নয়। বহু 'চা-বাগান' বন্যার কবলে পড়েছে। যতবার বন্যা হয় ততবার ডুয়ার্স অঞ্চলে বহু চা-বাগান ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে উত্তরবঙ্গের একমাত্র 'শিল্প' চা-বাগান উৎপাদন হ্রাসের ভয়ে অস্থির।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলি বিশেষ এক "আবহাওয়ায়" ১৫০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল। নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়া, অসময়ে আকস্মিক বৃষ্টি, প্রয়োজনীয় সেচের জল না পাওয়া, বন্যাতে চা-বাগানগুলি দিশেহারা। ভারত চায়ের বাজারে এখন নানান প্রতিকূলতার মধ্যে আছে। বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গেলে একহাজার মিলিয়ান কিলোগ্রাম চা উৎপন্ন করতেই হবে। অথচ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কোনো কোনো বাগানে আবাদি জমি ৫০ একর থেকে ৮০ একর উধাও হয়ে গেছে।

একটি রিপোর্ট (TCMC)-তে বলা আছে ধস্, ভূমিক্ষয় ইত্যাদিতে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে অন্তত ২৯টি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত। ঘনঘন ধস্, বৃষ্টি ঠিকমতো না হওয়া, আবার হঠাৎ বেশি বৃষ্টিতে ধস হবার ফলে শুধু প্রাকৃতিক কারণেই ২৯টি চা-বাগান ক্রমশ রুগ্ন হয়ে পড়েছে। ২৯টি চা-বাগান প্রাকৃতিক কারণে রুগ্ন হওয়া মানে লাখখানেক লোক বেকার বা বেকার হবার মুখে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করবে তা বলাই বাহুল্য।

৪. উত্তরবঙ্গে বন ধ্বংস

এখানে বলা দরকার আমাদের আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন (RBI)-এর একটি রিপোর্টে বলা আছে, উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের দিন ৩৬৫ দিনে ২০০-র উপরে। অর্থাৎ ২০০ দিন ধরে আগে (গড়)

বৃষ্টিপাত হত। এখন (১৯৯০) বছরে বৃষ্টির দিন কমে দাঁড়িয়েছে ১৫৩ দিন। অর্থাৎ বছরে বৃষ্টিপাত হওয়ার দিনের সংখ্যা কমেছে। বৃষ্টির দিন কম হয়েছে কিন্তু Intensity বেড়েছে! অর্থাৎ অল্পদিনে বেশিমাত্রায় বৃষ্টি হচ্ছে। এর মানে frequency কমছে অথচ Intensity বাড়ছে। ফলে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়—ধস্ এবং বন্যা এবার এই অঞ্চলে বেশি হবে।

ধসের কথা বলা যাক্। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে এখন ৫৫ শতাংশ গ্রামে যে-কোনো সময়ে ধস্ নামতে পারে। দার্জিলিং জেলায় দার্জিলিং অঞ্চলে ৬৯ শতাংশ, জোড়বাংলায় ২৬ শতাংশ, রঙ্গালী রঙ্গিলিয়াত অঞ্চলে ৭৫ শতাংশ, কালিম্পং ৩৫ শতাংশ ও কার্শিয়াং অঞ্চলে ৫৩ শতাংশ গ্রামে যে-কোনো সময়ে Landslides বা ধস্ হতে পাবে। এর মুখ্য কারণ যেমন একদিকে বন-ধ্বংস অন্যদিকে বৃষ্টির আকস্মিকতা। যেখানে সেখানে বাড়ি নির্মাণ, যত্রতত্র ঝোবাকে রুদ্ধ করার প্রবৃত্তি, সর্বত্র বনাঞ্চল কেটে কৃষি করার চেষ্টা এই Landslide হবার প্রধান কারণ।

বৃষ্টির আকস্মিকতা ক্রমশ বাড়ছে। গত নয় বছরে কোচবিহার অঞ্চলের হিসাব দেওয়া যাক।

সারণী—৫ কোচবিহার জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা

বছর	মিলিমিটার
১৯৮৯	৫৩৫০
১৯৯০	৩৫৫০
১৯৯২	২৫৭৪
১৯৯৩	৪২০৪
১৯৯৪	২৬০৪
১৯৯৫	৪২৯৫
১৯৯৬	৩৫৮৯
১৯৯৭	৩০১৪
১৯৯৮	৪৫২৫

এখানে কোচবিহাব জেলাকে উদাহবণ হিসেবে নেওয়া হল। এটা লক্ষণীয় যে, ১৯৮৯ সালে বৃষ্টিপাত যেখানে ছিল ৫৩৫০ মিলিমিটাব, ১৯৯২ সালে কমে দাঁড়াল ২৫৭৪, আবাব ১৯৯৫ সালে হল ৪৫২৫ মিঃ মিঃ। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতেব পরিমাণ বিচিত্র। হঠাৎ কোনো বছরে বেশি আব কোনো সময়ে কম. এই পরিবর্তনশীলতা কৃষি এবং সমস্ত ক্ষেত্রে যে নানান বিপদ আনতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

অধিকাংশ লোকই মোটামুটিভাবে স্বীকার করে এই আবহাওয়াব দ্রুত পরিবর্তন ও আকস্মিকতার অন্যতম কাবণ আমাদের বন ধ্বংস। অরণ্যেব আকাব ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বন ধ্বংস হলে মানুষও বাঁচবে না— এ কথাটি বোঝবাব

সময় বোধহয় এসেছে।

বনমন্ত্রী বলেছেন, এ রাজ্যের জনসংখ্যা অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চল দরকার। তা না হলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হবে না। কিন্তু সরকারি মতে বনাঞ্চল ১৯ শতাংশ। বেসরকারি মতে বনাঞ্চল এতটাই কমেছে যে, সেটা বর্তমানে ১২ শতাংশ। স্যাটেলাইট থেকে যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিরাট এলাকা নিয়তই ধ্বংস হচ্ছে। সামাজিক বন সৃজন প্রকল্প থাকুক বা-না থাকুক বন ধ্বংসের পরিমাণ কম হচ্ছে না।

সমস্যাগুলি কি কি?

(১) দুর্বৃত্তদের সঙ্গে এক শ্রেণীর কিছু বন দপ্তরের কর্মীর যোগসাজশ রয়েছে যার ফলে বনের কাঠ চুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। সব কর্মচারীর সঙ্গেই যে মাফিয়াদের যোগ আছে তা সত্যি নয়। সৎ-ভালো বন কর্মী অবশ্যই আছে। তাদের থাকা সত্ত্বেও বন-লুণ্ঠন থামানো যাচ্ছে না। আলিপুরদুয়ার থেকে দার্জিলিং সর্বত্রই একই অবস্থা।

(২) দুর্বৃত্তায়ন ছাড়াও নানাবিধ কারণে বন ধ্বংস হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে আগে "জ্বালানি নীতি" চালু থাকা উচিত ছিল। উত্তরবঙ্গের "জ্বালানি নীতি" বলে কিছু নেই। সুতরাং মানুষ যত বাড়ছে তত বেশি জ্বালানির চাহিদাও বাড়ছে। আর জ্বালানির তীব্র প্রয়োজনে একদল আইনি বা বেআইনি প্রথায় জ্বালানি সংগ্রহের নাম করে বন ধ্বংস করে যাচ্ছে। জ্বালানি সংগ্রহের নামে বনাঞ্চলে বিশাল পরিমাণে লুট চলছে।

(৩) বন ধ্বংস হচ্ছে আবার অভাবজনিত কারণে। লোকের চাকরি নেই, কৃষিকর্ম নেই—জনসংখ্যা বাড়ছে। অতএব এই অভাবি লোকদের অনেক সময়েই মাফিয়ারা নিযুক্ত করছে বন ধ্বংসের ব্যাপারে।

(৪) মাথা পিছু বন হেক্টর ক্রমাগত কমছে। ১৯০১ সালে মাথা পিছু বন ছিল ০.৬২ হে, ১৯৫১ সালে তা হয় ০.৩২ হে, আর ১৯৯১ সালে তা হয় ০.০০৯ হে।

(৫) যত জনসংখ্যা বাড়ছে তত বনাঞ্চল কমছে। তার নানাবিধ কারণ আছে। লোকবসতি যত বাড়ছে তত বনসম্পদ কমছে। যদি এক শতাংশ জনসংখ্যা বাড়ে তবে বনসম্পদ কমছে .৯৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় এক শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর বনসম্পদের সংকোচন প্রায় ১:১ রেসিওতে যাচ্ছে।

(৬) এক সময়ে বিশাল অরণ্য এলাকার রক্ষণাবেক্ষণে কোনো বিশেষ নীতি ছিল না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বৈকুণ্ঠপুর যে বনাঞ্চলকে সালুগাড়া রেঞ্জ বলা হয় তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য (প্রায় ৬৪০ বর্গ কিমি) একটি জিপগাড়ি ও কতিপয় রক্ষী। একটা হিসেবে বলা হচ্ছে যে মাসিক লুট-মাফিয়ারা এই অঞ্চল থেকে অবৈধ আয় করছে ৩০ লক্ষ টাকার উপর। আর কোচবিহার রেঞ্জে চোরাই কাঠ ১৯৮৫ সালে যা ধরা হয়েছিল তার দাম ৫০ লক্ষ টাকার উপর। আর কত যে লুট হয়েছে তার হিসেব কেউ জানে না। চিলাপাতা, মাদারিহাট, পাতলাখাওয়া

ইত্যাদি অঞ্চলে অবস্থা আরও ভয়াবহ। TP সিস্টেম চুরি বন্ধ করেনি বরং বাড়িয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কোলকাতা শহরে ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি লোক। তাতে শ্মশানঘাটের সংখ্যা সবশুদ্ধ ৩০টি। অথচ কার্শিয়াং অঞ্চলে TP যে ভাবে ইস্যু করা হয়েছে তাতে দেখান হচ্ছে শ্মশানঘাটের সংখ্যা ৩৯টি। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির নামে TP ইস্যু করা হয়েছে—তারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কিছু চা-বাগানের নামে TP ইস্যু করা হয়েছিল তারা জানায় যে এই সম্বন্ধে কিছুই জানে না। অর্থাৎ বন-বিভাগে তুঘল্কী কারবার আর মগের মুলুক বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে।

(৭) সৎ কর্মচারীরা বন-লুটেরাদের হাতে খুন হচ্ছে। যেমন শ্রীঅসিত ঘোষ সহ দশ বছরে প্রায় ৫০ জন সৎ কর্মচারীকে খুন করে দেওয়ার পরেও বন সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করা হয়নি।

(৮) বন-বিভাগের মতিগতি বোঝা দুরূহ। মে মাসে ১৯৮৫ সালে একটি টাস্ক ফোর্স (Task Force) গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্স তৈরি করার পিছনে জনমত খুব সক্রিয় ছিল। দুই মাসের মধ্যে টাস্ক ফোর্সকে উঠিয়ে দেওয়া হল। তার কারণ এক মাসের মধ্যে তারা অন্তত ১২টি বেআইনি কাঠ ভর্তি ট্রাক ও প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার কাঠ বেআইনি গুদাম থেকে উদ্ধার করেছিল। বলা হয় কাঠলুটেরা-সিন্ডিকেট এই টাস্ক ফোর্স উঠিয়ে দেবার জন্য বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়েছিল।

(৯) বন দপ্তরে একটা "সমান্তরাল পরিচালনা" বা Parallel Administration চলছে। আর এই পরিচালক সমিতি প্রচণ্ড শক্তিশালী। এরা যে সরকারি বনবিভাগকে (প্রায়) পরিচালনা করছে তাও নয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে দামী কাঠ বে-নামে বুকিং করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হচ্ছে। ফলে কালো টাকা ঠিক কত এখানে তা বলা মুশকিল।

(১০) কাঠচোররা বা সিন্ডিকেট সদস্যরা ধরা পড়লে বিচার প্রায় ধীরগতিতে চলে। জলপাইগুড়ি কোর্টে অন্তত ৫০০টি কেস ঝুলে আছে, প্রায় ৫০০টির মতো শিলিগুড়িতে আর ৪০০র কিছু বেশি কোচবিহারে। সবটা জানা যায় না —তবে পুলিশ এমনভাবে কেস সাজায় যাতে তাদের বিরুদ্ধে নাকি "সাক্ষ্য প্রমাণাদি" থাকে না। অর্থাৎ কোনো শাস্তি কেউ পায় না।

বন ধ্বংস হবার ফলে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়ছে অন্যদিকে Bio-Diversity নষ্ট হচ্ছে। বলা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে Bio-Diversity-র দিক থেকে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল অনন্য। এর তুলনা শুধু ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলের সঙ্গেই চলে। এই Bio-Diversity-র উপর আমাদের অজ্ঞতায়, লোভে ও লালসায় ক্রমাগত আঘাত হান্‌ছি। আর এই আঘাত যে কোন্ অভিশাপ বহন করে আনবে তা বলা মুশকিল। তবে যত Bio-Diversity কমবে তত নষ্ট হবে সভ্যতা। শুধু বন রক্ষার জন্যই আমাদের দরকার উত্তরবঙ্গে বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্ষদ। অন্তত যে জুতো পরেছে সে জানে কোথায় তার ব্যথা।

৫. উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনাই থেকে গেল

উত্তরবঙ্গে কোনো শিল্প নেই। যদি চা-বাগানকে শিল্প বলে ধরা হয় তবে এখানে একমাত্র শিল্প চা-শিল্প। চা-শিল্প আধুনিক শিল্প কিনা তা নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে।

যদি চা-বাগানকে শিল্প বলেই ধরি জলপাইগুড়ি জেলা শহরে চা-বাগিচার কেন্দ্রীয় হেড্ অফিস থেকে চা-বাগান পরিচালনা করা হত। কিন্তু একের পর এক চা-বাগানের হেড অফিসগুলি কোলকাতায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। চা-বাগানকে ঘিরে যে সহায়ক শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল তা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা প্রায় ১৫০টির উপর। অথচ চা-বাগানের হেড্ অফিস সংখ্যা মাত্র ২৫টি। এজেন্সি হাউসগুলি আগেই তাদের হেড্ অফিস কোলকাতায় নিয়ে গেছে।

ষাটের দশকে জলপাইগুড়িতে হেড অফিসের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০টি। আজকে কমতে কমতে তা দাঁড়িয়েছে ২৫টিতে। চা-বাগানের পরিচালন ব্যবস্থা যদি জলপাইগুড়িতেই হত তবে আর্থিক বিনিয়োগও বেশি হত। আর Remote Control প্রথায় এক শ্রেণীর মালিক যেভাবে চা-বাগিচা চালাচ্ছে তা সম্ভব হত না। চা-বাগিচার হেড অফিস যত জলপাইগুড়িতে কমবে তত কর্মসংস্থানের সুযোগ কমবে। চা-বাগানের মালিকদের বৃহৎ এক অংশের উত্তরবঙ্গের প্রতি কোনোরূপ সামাজিক দায়বদ্ধতাও নেই।

চা-বাগানের মালিকরা প্রায় ১৫০ বছর ধরে চা-বাগানের মুনাফা এই অঞ্চলে বিনিয়োগ করেনি। এই মুনাফা অর্থনীতির কুটিল কৌশলে বাইরে চলে গিয়েছে। চা-বাগান অর্থনীতি ব্রিটিশ আমলে ছিল কলোনিয়াল। এখন স্বাধীনতার পরে হয়েছে সেমি-কলোনিয়াল (Semi-Colonial) অর্থাৎ এখানকার Surplus অন্যত্র চালান হয়ে যাচ্ছে।

সহায়ক শিল্প হিসেবে অনেক শিল্পের কথাই বলা যায়। ছোট এক উদাহরণ দেওয়া যাক। চা-বাগিচার শ্রমিক-কর্মচারীদের জ্বালানির সংস্থান করার দায়িত্ব মালিকপক্ষের। সব ঠিকঠাক ছিল। মালিক-পক্ষ, সরকার-পক্ষ রাজি—কোল ব্রিকেট কারখানা হবে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হল না। অথচ কোল ব্রিকেটের জ্বালানি হিসেবে চাহিদা ছিল আর অমূল্য বন সম্পদ বাঁচত। কিন্তু সব ঠিকমতো থাকা সত্ত্বেও তা হল না।

সব ঠিকঠাক তবে হয় না এটাই উত্তরবঙ্গের ভাগ্য। বলা হয় উত্তরবঙ্গে 'শিলান্যাস অর্থনীতি'। উত্তরবঙ্গবাসীদের কথা দেওয়া হয়েছিল কোচবিহারে পাটকল আর দার্জিলিং জেলায় সরকারি আনুকূল্যে কাগজের কল হবে। অবশ্য পাটকলের শিলান্যাস বছর দু-তিনেক আগে হয়েছে। পাটকল স্থাপন করলে পাটচাষীদের যে সুবিধা হত তা আর হল না। জলপাইগুড়িতে ১৯৮৪ সালে জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় "ফল প্রক্রিয়াকরণ" কেন্দ্র করার চেষ্টা

হয়েছিল। যথাবিহিত ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছিল। Fruit Processing Industry থাকলে কৃষিদ্রব্য আলু, টমেটো ইত্যাদি মাঝে মাঝে জলের দামে বিক্রি করার দরকার ছিল না। কত চাষী তাদের উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে তার প্রমাণ বহু। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আনারস, আম এবং টমেটো পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সালেই টমেটো জলের দামে বিক্রি হয়েছে। Fruit Processing Industry যে তিমিরে সেই তিমিরে। ১৯৮০ সালের কাছাকাছি আলিপুরদুয়ারে ভেষজ উদ্যানের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপিত হয়েছিল। তবে এখনো সেটা কোথাও ফাইল বন্দী হয়ে আছে। অথচ বর্তমানে Globalisation-এর যুগে ভেষজ-ওষুধ সমস্ত উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে দিতে পারত। অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক শিল্প যা গড়ে উঠতে পারত—তা কোনো অজ্ঞাত কারণে Still born baby এখানে Preservative শিল্প, যা গড়ে ওঠার কথা ছিল তা আর কোনোদিন হয়নি। এখানে না আছে হিমঘর না আছে কৃষিভিত্তিক এবং বনভিত্তিক শিল্পস্থাপনার পরিকল্পনা।

এখানে নানান সংস্থা Eco-friendly শিল্প স্থাপনের কথা চলছে। তামাকের কারখানা কোচবিহারে হতে পারত। আগে অবশ্য চুরুটের কারখানা ছিল। হাভানা চুরুটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদেশী মুদ্রা আনতে সাহায্য করত। সে কারখানা বন্ধ। Medicinal Plant এখানে অফুরন্ত। তার থেকে কত রপ্তানি যোগ্য কত শত ওষুধ তৈরি হতে পারত। কিন্তু কোনো কিছুই হয়নি।

জলপাইগুড়ি শহরে ৫০০ কোটি টাকা খরচে আধুনিকতম Electronic ও কম্প্যুটার শিল্প গড়ে তোলার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। কোনো অজ্ঞাত কারণে ওয়েবেলের Electronic শিল্প দমদমে চলে গেছে। মালদহে Intregal Coach Factory হবার কথা ছিল। এখানে অবশ্য প্রস্তাব ছিল, ভিত্তি প্রস্তর ছিল না। এই Intregal Coach Factory এখন পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়িতে রেল লাইন ইলেকট্রিফিকেশনের কথা ছিল। CAG রিপোর্টে স্পষ্ট লেখা আছে। সেই টাকা এখন বাঙ্গালোরে খরচ হয়েছে শুধু আমাদের তদ্বিরের অভাবে।

মোট কথা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গ এখনও শিল্পহীন। ৯৫ শতাংশ শিল্প শ্রমিক এখনও দক্ষিণবঙ্গে আর মাত্র ৫ শতাংশ শিল্প শ্রমিক উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন SSI বা ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত। আবার উত্তরবঙ্গে একটার পর একটা ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্ন অথবা বন্ধ হবার ফলে এখন দক্ষিণবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের শিল্প শ্রমিক রেসিও দাঁড়িয়েছে ৯৭ : ৩।

আবার যে ক্ষুদ্র শিল্প বা SSI এখানে আছে তা কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ। মোটামুটিভাবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কয়েকটি অঞ্চলে অবস্থিত। আর সমগ্র উত্তরবঙ্গ মোটামুটিভাবে ক্ষুদ্র শিল্পে বঞ্চিত। কোচবিহারে Industrial Estate যা আছে তাতে শিল্প গড়ে ওঠেনি। আবার শিলিগুড়ি সেবক

রোডে যে Industrial Estate আছে সেখানে শতকরা ৮০ ভাগই বন্ধ।

এই বিষয়ে আমাদের যে সমস্ত আর্থিক সংস্থা আছে তারা কি কোনো উদ্যোগ নিয়েছে? ১৯৯০ সালে একটি IDBI-Report থেকে উল্লেখ করছি। "The Share of the region in the IDBI's Refinance Assistance sanctioned to the state of West Bengal has varied marginally.......As a percentage of assistance flowing to the backward regions of West Bengal North Bengal's share has been declined from 26% to 18%......" আরও আধুনিক সংখ্যা যা জানাচ্ছে IDBI থেকে অনুদান ক্রমশ কমছে। আর WBFC (West Benga Financial Corporation)-এর চিত্র একই। আবার IDBI রিপোর্ট থেকেই উল্লেখ করছি। "WBFC has assisted so far about 400 medium scale industries in the state : about 90% of these units have come up in South Bengal, while North Bengal's share is only about 5%".

যা ক্ষুদ্র শিল্প আছে তার অধিকাংশ রুগ্ন। রুগ্নতার বহুবিধ কারণ আছে। তবে IDBI এখানে শিল্প স্থাপনের জন্য যে ২৩টি Recommendation করেছিল তার সঙ্গে শ্রীকমল গুহের কথার খুব মিল পাওয়া যায়। কয়েকটি সুপারিশের সারাংশ দেওয়া হল।

১) আলাদা করে উত্তরবঙ্গের শিল্প উন্নতির জন্য শক্তিশালী ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড তৈরি করতে হবে। এবং এই শিল্প উন্নয়ন সংস্থা পৃথকভাবে কাজ করবে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় উত্তরবঙ্গের শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

২) প্রত্যেক জেলায় শিল্পের ভবিষ্যৎ আছে। কারণ এই অঞ্চল কাঁচামালে সমৃদ্ধ। তার জন্য প্ল্যানিং বোর্ড গঠন করতে হবে।

৩) রিসার্চ ও উন্নয়ন বা যাকে বলে R&D তার জন্য আলাদাভাবে টাকা খরচ করতে হবে। এই রিসার্চ Fruit Processing শিল্পে বেশি করে নজর দিতে পারবে ও স্থানীয় সমস্যার সমাধান করবে। হলদিবাড়ি থেকে দার্জিলিং অঞ্চলে Bio-diversity এতই বেশি অথচ সেই তুলনায় রিসার্চ এতই কম যে শিল্পপতিরা বিনিয়োগে উৎসাহ পাচ্ছে না।

৪) একটি টেকনোলজি ট্রান্সফার সেল (Cell) তৈরি জরুরি। তার মানে শিল্পহীন উত্তরবঙ্গে যদি নতুন শিল্পায়ন হয় তবে তা হবে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ।

৫) দরকার মতো সরকারি প্রচেষ্টায় Mother Industry অন্তত একটি তৈরি করতে হবে। এই মাতাকে ঘিরে সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবে।

৬) চা-বাগানের আধুনিকীকরণ হলে এই অঞ্চলে শিল্পের চাহিদা বাড়বে। চা-বাগানের আধুনিকীকরণ এখনও অসম্পূর্ণ।

৭) যাকে আমরা বলি Distributional Network তার উন্নতির জন্য মনিটর সিস্টেম চালু রাখা দরকার।

৮) বিদ্যুৎ উৎপাদন এই অঞ্চলে যথেষ্টই হয়—বিশেষত চুখা প্রকল্পের পরে। অথচ ট্রান্সমিশন লাইন এখনও স্থবির। এর আধুনিকীকরণ দরকার। যাতে ঘন ঘন লোডশেডিং খরচ বাড়াতে না পারে। আশ্চর্য কথা Rural Electrification উত্তরবঙ্গে প্রায় হয়নি। আর অনেক চা-বাগানে বিদ্যুৎ যায়নি। বিদ্যুৎ সরবরাহ যদি আধুনিক করা যায় তবে শিল্প যে উৎসাহ পাবে—তা আর্থিক উৎসাহের থেকে বেশি।

৯) শিল্পের উন্নতি করতে হলে এখানে "প্রফাইল ব্যাঙ্ক" (Profile Bank) তৈরি করতে হবে। তারা শুধু শিল্পের জন্য নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। বহু দেশে যেখানে শিল্পে Regional disparity আছে এই ধরনের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু আছে।

১০) রাস্তাঘাট এই অঞ্চলে কম। রেল-লাইন ব্রিটিশ আমলে যা ছিল প্রায় তাই আছে। এর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। একলাখি-বালুরঘাট প্রজেক্ট ছাড়াও আসামের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের পরিত্যক্ত রেল লাইনগুলি উদ্ধার করতে হবে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের শিল্পের বাজার আসাম ও সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রসারিত হবে।

আমি ২৩টি সুপারিশ (Recommendations) যা করেছে তার মাত্র দশটি তুলে দিলাম। Recommendation করার পর এখন SAARC দেশভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অন্তত ১৫০ থেকে ২০০টি দ্রব্যের মুক্ত বাণিজ্য হবে। আর এর জন্য কিছু Exit Point ও Export Point ঠিক করা আছে। অর্থাৎ বাজারের অভাব আমাদের শিল্পদ্রব্যের জন্য হবে না যদি আমরা চাহিদা ও কাঁচামাল যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে বর্তমান টেকনোলজি যুক্ত করতে পারি। SAARC-এর বর্তমান পরিকল্পনায় বিরাট এক বাজার ভবিষ্যতে আমাদের কাছে উন্মুক্ত। কথা হচ্ছে এর জন্য যে চেষ্টার দরকার তার অভাব আজও আছে।

৬. উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

উত্তরবঙ্গে চা-ই ছিল এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের Engine of growth বা উন্নয়নের চালিকা শক্তি। চায়ের প্রয়োজনে এখানে রাস্তাঘাট তৈরি হয় এবং রেলগাড়ি চালু হয়। তার কারণ চা-রপ্তানিযোগ্য পণ্য—আর বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রাস্তা বা রেল দরকার। এই অঞ্চলে রেললাইন যেভাবে পত্তন করা হয়েছিল তাতে চা-কে রপ্তানিযোগ্য করার চেষ্টা হয়েছিল।

পৃথিবীতে একটি বছর বাদ দিলে পরে (১৯৬৯) আমরাই চা-রপ্তানিতে প্রথম স্থানে ছিলাম। অর্থাৎ ১৮৬০ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আমাদের চা-ই ছিল পৃথিবী বিখ্যাত আর রপ্তানির লিগ টেবিলে সর্বপ্রথমে।

কয়েকবছর যাবৎ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা রপ্তানিতে ক্রমশ পিছু হটছি। আগে শ্রীলঙ্কাই আমাদের চা-রপ্তানিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। দু'দশক ধরে চায়ের রপ্তানি বাজারে Structural Change হয়েছে। এখন শ্রীলঙ্কা ছাড়া, পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া রপ্তানিতে প্রথম, চীন দ্বিতীয় এবং ইন্দোনেশিয়া আমাদের তীব্র

প্রতিদ্বন্দ্বী। বস্তুতপক্ষে গত কয়েক বছর ধরে কেনিয়া রপ্তানিতে প্রথম, চীন দ্বিতীয়, আর ভারত তৃতীয়। কখনও বা শ্রীলঙ্কা তৃতীয় তখন আমাদের স্থান চতুর্থ হয়ে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া যেভাবে চা-রপ্তানি ও উৎপাদন বাড়াচ্ছে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, চা-রপ্তানিতে আমরা পঞ্চম স্থানে চলে যাব বা যেতে পারি। চা প্রথম থেকেই রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য ছিল। যদি রপ্তানি বাজারে আমরা প্রতিযোগিতায় হেরে যাই তবে চা-র ভবিষ্যৎ কি এই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। উপরন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঘন ঘন মালিকানার পরিবর্তন, ম্যানেজমেন্টের গুণগত অপকর্ষতার ফলে চা-আর খুব একটা Dynamic শিল্প নয়। এর কারণ অনেক। ম্যানেজমেন্টের ঘুণ যে সর্বত্রই ধরেছে তাও সত্যি নয়। চা-বাগানে ভালো ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক টেকনোলজি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে তার সংখ্যাও হয়তো কম নয়। তবুও নানান কারণে চায়ের টার্গেট উৎপাদন করতে পারছি না। আমাদের রপ্তানি ২০০-২১০ হাজার মেট্রিক টনের উপর বাড়াতে পারছি না। যোজনা কমিশন যে টার্গেট দিয়েছে তাও পালন করতে পারছি না।

চা-বাগানে অসংখ্য সমস্যা আছে তবে চা-যে গতিশীল প্রাণবন্ত শিল্প নয় তার মধ্যে কয়েকটি কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১) সরকারি দপ্তর অধিকাংশ সময়ে চায়ের উৎপাদন সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন। টি বোর্ডের অগাধ ক্ষমতা আছে তবে মোটামুটিভাবে তা সুপ্ত। মাঝে মাঝে কয়েকটা মিটিং ইত্যাদি হয়। টি বোর্ড ঠিক কি কারণে রাখা হয়েছে আব তাকে এত ক্ষমতাই বা কেন দেওয়া হয়েছে তা বলা মুশকিল। সরকার শুধু একটি ব্যাপারে সক্রিয়। চায়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের হরেক রকম ট্যাক্স! এই একটি শিল্প যেখানে দু-রকম প্রত্যক্ষ কর দিতে হয়। একটি Corporate Tax অন্যটি Agricultural Income Tax এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নানান ধরনের পরোক্ষ ট্যাক্স বাড়িয়ে যাচ্ছে। এর বোঝাও বিপুল। এই বিপুল ট্যাক্সের চাপ থাকায় যা হয় তা হচ্ছে নানান ধরনের "ফাঁকি" দেবার প্রবৃত্তি বাড়ছে। এর ফলে ম্যানেজমেন্ট বাগান চালাতে অনেক সময়ে অসমর্থ হয়। আর তার ফলে চা-বাগানে Instability ক্রমশ বাড়ছে।

২) অধিকাংশ চা-বুশ আজ প্রাচীন ও বয়েসের ভারে ন্যুব্জ। অন্তত ৫০ শতাংশ চা-গাছেব বয়েস ৬০ বছর পার হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে যে চা-গাছ লাগানো হয়েছিল তারপব নতুন চা-গাছ লাগানো হয়নি। ২৮ শতাংশ চা-গাছ অপেক্ষাকৃত যুব—বয়স ৫ থেকে ৩০ বছর! আর ১২ শতাংশ চা-গাছের বয়স ৭০ বছরের বেশি। অর্থাৎ যথার্থ ফলনশীল হতে পারে না। চা-গাছের নতুন চারা লাগাবার জন্য সরকার ও ম্যানেজমেন্টের যে সব জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল তা নেওয়া হয়নি। Re-plantation rate কম হবার ফলে আমাদের চা-বাগানগুলি ক্রমশ স্থবির হচ্ছে। আমরা যখন কেনিয়া বা চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চাই, তখন মনে রাখা দরকার এই দুটি দেশের চা-বাগানের

বুশ অপেক্ষাকৃত যুব ও নবীন। যার ফলে এই দুই দেশের Productivity আমাদের চা-বাগান থেকে বেশি।

৩) আমাদের ভুল ধারণা ছিল যে, ভারতের দার্জিলিং চা গুণগত মানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি আর সত্যি নয়। কেনিয়ার চা-র গুণগত মান কোনো অংশেই কম নয়। বরং নতুন নতুন টেকনিক ব্যবহার করে এইসব দেশের চা গুণমানে যথেষ্ট উন্নত।

৪) কেনিয়ার Cost of production একটি I L O রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের থেকে কম। যেখানে ভারতবর্ষে গড়ে ১ কেজি চা-উৎপাদন করতে খরচ লাগে US $ 1.09 সেখানে কেনিয়াতে লাগে ১ কেজির খরচ US $ 0 96 অর্থাৎ কেনিয়া আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু যে গুণগত মানের উন্নতি করেছে তাও নয় খরচের দিকেও সাশ্রয় করছে। আর কেনিয়ার শ্রমিক ভারতের শ্রমিক থেকে কম মাইনে পায় এটাও সত্যি নয়। অর্থাৎ কেনিয়া Productivity-র দিক থেকে আমাদের থেকে উন্নত। আমরা যদি চায়ের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে না পারি তবে সমস্যা আরও গভীর হবে।

৫) আমরা মুখ্যত যে ধরনের চা বেশি উৎপাদন করি তার নাম CTC ও Orthodox. আমরা এই চা উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে প্রতিযোগী। এই চা উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার খরচ বা Cost of production কম প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। Globalisation-এর যুগে যেখানে বাণিজ্য মুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেখানে শ্রীলঙ্কা তার সস্তা চা ভারতে রপ্তানি করতে চাইছে। আর আমাদের তদানীন্তন ফিনান্স মিনিস্টার শ্রীচিদাম্বরম শ্রীলঙ্কার CTC চা ভারতে আমদানির ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন। বলা হচ্ছে, এই বিষয়ে দুটি বহুজাতিক সংস্থা ব্রুকবণ্ড আর লিপ্‌টন নাকি সরকারের উপর জরুরি তাগাদা দিয়েছিল বা যাকে বলে Pressure group সেইভাবে কাজ করেছিল। যদি শ্রীলঙ্কার চা ভারতে আসার ও আমদানির ঢালাও অনুমতি পায় তবে ডুয়ার্সের বহু বাগান বন্ধ হবার সম্ভাবনা। স্বীকার করা উচিত যে বহু বাগান বন্ধ হবেই।

৬) চা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে বাগান থেকে বিক্রি করা যায় না। চা-বিক্রি করতে গেলে নীলাম বাজার বা Auction Market লাগে। এর কারণ এই যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও চায়ের গুণগত মান অকশন বাজারে ঠিক হয়ে দাম নির্ধারিত হবে। হয়তো তাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নীলাম বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নেই। নীলাম বাজার অন্তত কয়েকটি Big House দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এরা দরকার মতো চায়ের দাম বাড়াতে ও কমাতে পারে। অনেক সময় বাগানগুলি এই নীলাম বাজারের কাছ থেকে বন্দী বা (Captive) অর্থাৎ উপযুক্ত দাম পায় না। ফলে চা-বাগানে Instability ক্রমশ বাড়ছে।

৭) চা-বাগানের উৎপাদন Seasonal---অর্থাৎ বছরের সব সময় চা উৎপন্ন হয় না। এর জন্য চা-বাগানকে ঋণ বা লোন নিতে হয়। স্বাধীনতার পরে ঋণ

পাওয়া যায় কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে। অর্থাৎ চা-বাগানে যে Liquidity সমস্যা তা পূরণ করে কিছু ব্যাঙ্ক। আর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে গেলে টাইটেল ডিড্ (Title Deeds) ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে। ঋণ কিভাবে দেওয়া হবে তার মাপকাঠি কি, ইত্যাদি সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানান কমিটি তৈরি করেছিল। যেমন দত্ত কমিটি, চোবে কমিটি, ট্যান্ডন কমিটি, ঘোষ কমিটি ইত্যাদি। এর ফলে সরকারি ঋণদান কিভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা অনেক সময়ে প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণে দরকার মতো ঋণ পাওয়া যায় না। ফলে বাগানগুলিতে অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে।

৮) ব্রিটিশ আমলে চা-শ্রমিকদের ওপর ছিল নানান অত্যাচার। মজুরি ছিল অল্প। পুরুষ ও স্ত্রী এমনকি শিশুকেও চা-বাগানে নিযুক্ত করা হত। ট্রেড ইউনিয়ন ছিল নিষিদ্ধ। চা-বাগানে সরকারিভাবে ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতি পায় স্বাধীনতার পরে। বর্তমানে চা-বাগানে অন্তত ৩২টি বিভিন্ন ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন। আর মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার থেকে নিজেদের মধ্যেই আন্দোলন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাগানে ঘন ঘন লকআউট।

বস্তুত চা-শিল্প এখন আর গতিশীল শিল্প নয়। আর চা-বাগানে যে খুব বেশি লোকের কাজ পাওয়া যাবে এমন ভরসাও নেই। বরং Permanent Labour থেকে এখন Casual Labour নিয়োগ করার প্রবৃত্তি বাড়ছে। যে সব শ্রমিক-কল্যাণমূলক অনুদান বাধ্যতামূলক তা প্রায়ই দেওয়া হয় না। সমস্ত চা-বাগানগুলি একত্র হয়ে উত্তরবঙ্গের একটি Central Hospital করবে তাও হয়নি। বোধহয় কোনোদিনই হবে না—যদিও এটা করা বাধ্যতামূলক। শ্রমিক অসন্তোষ নানান বিষয়ে ধূমায়িত।

অর্থাৎ এক সময়ে এই অঞ্চলে চাকরির সুযোগ বেড়েছিল চা-বাগানের পত্তনের সঙ্গে। অন্তত ২৫টি শহর চা-বাগানের জন্যই এই অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল। আজকে সেই সূর্য প্রায় অস্তগামী।

৭. উত্তরবঙ্গের কৃষি

উত্তরবঙ্গে কৃষিই প্রধান জীবিকা। কৃষিজমি এখানে অন্তত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি। আর এখানে Terrace Cultivation প্রচলিত। অর্থাৎ পাহাড়ের গা কেটে জমিতে ফসল উৎপাদন। বলা বাহুল্য এই প্রথায় লাঙ্গল চাষ খুব একটি প্রচলিত পদ্ধতি নয়। আর জমির সামান্য অংশ কৃষিতে ব্যবহৃত। বস্তুত দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে মাত্র ১৪ শতাংশ জমি কৃষির জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকি জমি হয় পাহাড়, বিশাল জঙ্গল অথবা কৃষিকার্যে অনুপযুক্ত। এই ১৪ শতাংশ কৃষিজমিতে নানা ধরনের ভুট্টা, ফল, সবজি ইত্যাদি হয়। চালের জন্য অত্যন্ত সীমিত। এই অঞ্চলে সেচ পদ্ধতি 'ঝোরা' ভিত্তিক। (খ) তরাই ডুয়ার্স অঞ্চল। এখানে পাহাড়ের সমতলে চা বাগান ও কৃষিজমি পাশাপাশি। বর্তমান প্রায় ৩০০০০ হেক্টর কৃষি চা বাগানে রূপান্তরিত। অর্থাৎ

কৃষিজমি ও চাষের জমির মধ্যে একটা অশুভ প্রতিযোগিতা। এখানে সেচের ব্যবস্থা বিশেষ নেই। জমির উৎপাদিকা শক্তিও সীমিত। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোর জন্য যে সেচের প্রয়োজন তা এই অঞ্চলে আপাতত নেই। (গ) এছাড়া আছে কোচবিহার, মালদা ও দিনাজপুরের উর্বরভূমি। প্রায় ৮০ শতাংশ জমি কৃষির জন্য নির্দিষ্ট। এই অঞ্চল উর্বরা ও বহু শতাব্দী ধরে এখানকার কৃষিকার্য বিখ্যাত। তবুও কিছু সংক্ষেপে বলা দরকার।

(১) কৃষি উন্নতির জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন। একটি ভূমিসংস্কার আর অন্যটি সেচ ব্যবস্থা। সমগ্র পঃ বঙ্গে ভূমি সংস্কার হয়েছে। তবুও উত্তরবঙ্গে সবুজ বিপ্লব আসেনি। সবুজ বিপ্লব আনতে পারত যদি সেচের ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু এখনও সেচের ব্যবস্থা মাত্র ৩৩ শতাংশ জমিতে হয়েছে। এটা বর্ধমান বা হুগলি থেকে আলাদা। বর্ধমান অঞ্চলে বা হাওড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষত নদীর জল মারফত।

(২) তিস্তা-প্রকল্প প্রায় ২২ বছর আগে আরম্ভ হয়েছে। তিস্তা প্রকল্প এখনও সেচ ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে আছে। ৩০০০ থেকে ৪০০০ হেক্টর জমি তিস্তা প্রকল্পের সেচের আওতায় এসেছে মাত্র। তিস্তা প্রকল্প শেষ হলেই যে Feeder Canal তৈরি করা যাবে তার গ্যারান্টিও নেই অথচ এই প্রকল্প শেষ না হলে উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা কখনই তৈরি হতে পারে না। আবার Feeder canal কোন্ কোন্ অঞ্চলে হবে তার কোনো প্ল্যান ও প্রোগ্রাম এখনও তৈরি হয়নি। প্রথমে তিস্তা প্রকল্প যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল এখন তার অনেক পরিবর্তন এসেছে।

(৩) যা আরম্ভ হয় তা এইখানে শেষ হয় না। মেখলিগঞ্জে কৃষি ফার্মের অবস্থা আজ বেহাল। ভোটবাড়িতে ৭৫ বিঘা জমির উপর ওই ফার্মটি অবস্থিত। বর্তমানে ওই ফার্মটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ ওই ফার্মে উৎপাদিত বীজ কৃষকদের সরবরাহ করা যেত। ওই ফার্মে হস্তচালিত পাওয়ার ট্রাকটার সহ নানা কৃষি যন্ত্রপাতি নানা শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হত। পাওয়ার টিলার অকেজো।

(৪) বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় পঃ বঙ্গে এবং তার মধ্যে আবার উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের fluctuation অর্থাৎ আগের বছরের দামের সঙ্গে পরের বছরে উৎপাদন নির্ভরশীল। অথচ পাট শিল্পজাত দ্রব্য কোচবিহার-দিনহাটায় এই পাট দিয়ে 'মাদার ইন্ডাস্ট্রি' হতে পারত। এটা মনে করার কারণ আছে যে, মাঝে পাটকে ত্যাগ করে মানুষ কৃত্রিম পলিথিনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পলিথিন সস্তা হতে পারে কিন্তু পরিবেশ-বন্ধু নয়। পাটজাত দ্রব্য পরিবেশ দূষিত করে না। অনেক জায়গায় পলিথিন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। Eco-friendly পাটের বিকাশ সম্ভব যদি সহায়ক শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টা না হওয়ায় পাট উৎপাদন ফড়িয়া-নির্ভরতার জন্য ওঠানামা করে।

(৫) এখানকার তামাক জগৎ বিখ্যাত—গুণে ও মানে। তামাক থেকে শুধু

চুরুট বা সিগারেট নয়, অনেক ওষুধ ইত্যাদিও হতে পারে। অথচ যে দাম সরকার তামাকের জন্য নির্দিষ্ট করেছে তা চাষীদের পক্ষে লাভজনক নয়। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। আর সেটার বিরাট অংশ Pesticide এবং Medicinal উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এর জন্য যে উদ্যোগ দরকার তা করা হয়নি। বরং দেখা যায় গুণগত মানের তামাকের উৎপাদন হয় কমছে কিংবা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

(৬) ব্রিটিশদের স্বার্থে মালদহ অঞ্চলে সিল্ক এখনও Raw আর এই Raw সিল্ক বিভিন্ন জায়গায় Manufactured হয়। অথচ একদা Manufacturing Centre মালদহে ছিল বর্তমানে এই বিষয়ে কারুর নজর নেই। মালদহের Manufactured Silk কি ভাবে ব্রিটিশরা উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল তার ইতিহাস হয়তো অনেকের জানা বা অনেকের কাছে অ-জানা। শুধু এখানে বলে রাখা দরকার একজন রাশিয়ান অর্থনীতিবিদ নাম পাপলভ (Paplov) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত লিখেছেন। যদি রেশম শিল্পকে আমরা কৃষির আনুসঙ্গিক শিল্প হিসাবে দেখি তবে রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব।

(৭) এখানকার আনারস বাজারের অভাবে বাইরে রপ্তানি করা যাচ্ছে না। অথচ ফিলিপাইন্‌সে আনারসকে ঘিরে নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। আনারস থেকে যেমন রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে তেমন আনারসের পাতা থেকে কৃত্রিম রেশম তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে এখানে আনারসের পাতা কোনো কাজেই লাগে না। অথচ এই কাঁচামাল থেকে আমরা অন্য ধরনের রেশম ও পেটের অসুখের নানা ওষুধ তৈরি করতে পারতাম। অনুন্নত দেশ ফিলিপাইন্‌সে যা সম্ভব আমাদের দেশে তা সম্ভব হচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ—যথার্থ উদ্যোগের অভাব।

(৮) গ্রামীণ বিদ্যুতের অভাবের জন্য Lift Pump ব্যবহার সীমাবদ্ধ। শুধু সীমাবদ্ধ তাই নয়, অনেক সময় খরচও বেশি। গ্রামীণ বিদ্যুৎ আসেনি বলে হিমঘর তৈরি হয়নি। হিমঘর যতদিন না তৈরি হবে ততদিন আমাদের চাষীরা বিপন্ন। এটা এই বছরেই প্রমাণ। এই বছরে টমাটো আর গত বছরে আলুর দাম এমন হারে কমে যায় যে বহু চাষী আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কৃষি উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ বিদ্যুৎ যেমন প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন হিমঘর। অথচ কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নের জন্য যে এই হিমঘর দরকার তার দিকে কারুর দৃষ্টি এতদিন ছিল না। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি মানে যে 'মৃত্যু' এটা এই কয়েক বছরে প্রমাণিত।

(৯) দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যদি আমাদের প্রতিবেশী ভুটান রাজ্যের তুলনা করি তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, দার্জিলিং জেলার কমলালেবু গুণমানে বিখ্যাত। অথচ উৎপাদন গত ২০ বছর ধরে প্রায় স্থিতিশীল বা Static— অথচ ভুটানে এই ফলের উৎপাদন শুধু ক্রমশ বাড়ছে তাই নয়, কমলালেবুকে উপযুক্ত ব্যবহার করে নানা ধরনের পানীয় তৈরি করছে—অর্থাৎ Fruit Processing শিল্প ভুটানেও যা হয়েছে উত্তরবঙ্গে তা হয়নি।

(১০) Fertiliser ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন। এখানে বলা দরকার যে, Fertiliser ব্যবহার যত বেশি হবে তত বেশি কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। শ্রীসরোজ পাঞ্জা বিভিন্ন জেলায় Fertiliser ব্যবহার সম্বন্ধে একটি সারণী তৈরি করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে Fertiliser ব্যবহার সবচেয়ে কম উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে।

সারণী—৬ সার ব্যবহার বিভিন্ন জেলায় (১৯৮৯)

জেলা	Fertiliser per ha (kg)	Production per ha (Qtl)
দার্জিলিং	৫.৭৪	১৪.৪৬
কুচবিহার	৫২.৮৪	২৪.৭৯
চব্বিশ পরগনা		
হুগলি, মেদিনীপুর	১০৭.৮৯	৩৭ ৫৮

পুরো সারণী যদিও দেওয়া হল না তবু একটা জিনিস পরিষ্কার, উত্তরবঙ্গে সেচের ব্যবহার যেমন নেই তেমন নেই সারের ব্যবহার। ফলে উৎপাদিকা শক্তি যা বাড়ানো দরকার ছিল তা হয়নি। এই লেখা থেকে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার, সেচের জন্য মালদহ-কোচবিহার অঞ্চলে খরচ হেক্টর প্রতি ৩০.৯০ পয়সা অথচ মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া জেলায় হেক্টর প্রতি সেচের খরচ ১৪০১.২২ পয়সা। এখানে বলা ভালো Irrigation আর Fertiliser ব্যবহারে সরকারি অনুদান (subsidy) পাওয়া যায়। তার মানে এই উত্তরবঙ্গ সরকারি অনুদান (Subsidy) ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারছে না।

(১১) এই বিষয়ে অর্থনীতিতে এখন প্রচণ্ড বিতর্ক। বিতর্কের দুটি ভাগ। কৃষিতে কি পশ্চিমবঙ্গে Rate of growth সবচেয়ে বেশি? পাঞ্জাব থেকেও কি বেশি? পঃ বঙ্গে সরকারি তত্ত্ব তাই বলছে—অনেকে তা স্বীকার করেন না। যদি পঃ বঙ্গ সরকারি তথ্যই আমরা ধরি তবে পঃ বঙ্গে কৃষি উন্নতির হার বর্তমানে ৬ শতাংশ আর ভারতবর্ষে গড় ৩ শতাংশ। কিন্তু পঃ বঙ্গ সরকার যা তথ্য দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে জেলাগুলিতেই উন্নতির হার ৬ শতাংশের বেশি অথবা কাছাকাছি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দেখা যাচ্ছে উন্নতির হার ২ থেকে ৪ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি তথ্যই যদি আমরা নেই আমরা দেখি সবুজ বিপ্লব উত্তরবঙ্গকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে পরিকাঠামোর অভাব। পরিকাঠামো মানে গ্রামের সঙ্গে শহরের সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তা, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, রেল পরিষেবা, বিদ্যুতায়ন সব দিক থেকেই আমরা পিছিয়ে আছি।

৮. উত্তরবঙ্গে Informal Sector—বিধিবহির্ভূত কাজের স্ফীতি

উত্তরবঙ্গে যে সেক্টর ক্রমশ বাড়ছে তার নাম দেওয়া হচ্ছে Informal Sector এর অন্য নাম Irregular Economy বা প্রথা বহির্ভূত অর্থনীতি। এই সেক্টরে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। (ক) এখানে সহজে প্রবেশ করা যায় আবার ছেড়ে

চলে যাওয়া যায়। (খ) অধিকাংশ সময়ে এগুলো কিছুটা স্ব-নিয়োজিত অথবা পরিবার নিয়ন্ত্রিত। (গ) এদের মূলধন বিশেষ লাগে না এবং আকারে খুবই ছোট। (ঘ) অধিকাংশ সময়েই এগুলো শ্রমনির্ভর। টেকনোলজির প্রয়োগ বিশেষ থাকে না। যা আছে তা অত্যন্ত প্রাচীন বা পরম্পরাগত টেকনোলজি। (ঙ) ফর্মাল স্কুল প্রথা থেকে এই সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে। (চ) সরকারি সাহায্য অধিকাংশ সময়েই পাওয়া যায় না। ব্যাঙ্কিং প্রথার মধ্যে এরা আসে না। (ছ) আর এই চাকরির বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক।

এই প্রথা বহির্ভূত স্ব-নিয়োগ পদ্ধতি আজকে উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি গতিশীল। এর প্রয়োজন আছে কি নেই, এদের আয় কি ধরনের, উৎপাদিকা শক্তিই বা কি, মজুরি কত তার তত্ত্ব অবশ্য এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। তবে সবাই লক্ষ্য করেছে যে, স্থানে অস্থানে, রাস্তার উপর, ফুটপাথে অসংখ্য দোকান। এই দোকানগুলি কখনও অতি ক্ষুদ্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের আয় সামান্য। তবে এগুলি Struggle for existence-এর চূড়ান্ত রূপ। কোনো চাকরি নেই, চাকরির আশা নেই, অতএব কিছু একটা করার চেষ্টাই এই অসংখ্য দোকান। শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক পুস্তকে প্রমাণ করেছেন যে হাজার জনসংখ্যা প্রতি এই ধরনের দোকান উত্তরবঙ্গে ভারতের গড় থেকে বেশি। বলা বাহুল্য এটা এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বেকারি। বিখ্যাত সুইডিশ অর্থনীতিবিদ মিরডাল (Myrdal) এই নিয়ে অনেক তত্ত্ব দিয়েছেন। কত রিকশা, রিকশা ভ্যান চলছে? হিসেব নেই।

শুধু দোকানদারি বা ভেন্ডারগিরি, চায়ের দোকান বা লটারি বিক্রির দোকান নয়, প্রচুর সংখ্যায় পুরুষ-মহিলা Construction Work-এ কাজ পাবার জন্য দলে দলে শহরে আসছে। এদের মধ্যে একদল কাজ পায়, অন্য দল কাজ পায় না। এ ছাড়া অসংখ্য বাড়িতে কাজ করার পরিচারিকা, হাসপাতালে, নার্সিংহোমে আয়া ইত্যাদি।

Informal Sector যে কত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তা আমাদের ধারণার বাইরে। অথচ এই Sector ছাড়া কোনো চাকরির সুযোগ কোথাও বাড়ছে না। Informal Sector বাড়লে সামাজিক Criminalisation হতে পারে তার সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা দরকার। যে কোনো মিউনিসিপ্যাল সমস্যা এদের উপস্থিতির জন্য সমাধান অসম্ভব। Informal Sector বাড়াব অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. কৃষিতে বর্গা দেওয়া সত্ত্বেও Landless Labour-এর সংখ্যা প্রচুরভাবে বাড়ছে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর ধারণায় যদি ভূমিহীন কৃষক পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ বাড়ছে প্রতি দশকে, তবে উত্তরবঙ্গে তা বাড়ছে ২০০ শতাংশেরও বেশি। এই Surplus জনসংখ্যা আজ Informal Sector-এ ভিড় করছে।

২. জমি একফসলী অনেক জায়গায়। কারণ সেচের বন্দোবস্ত হয়নি। এক সমীক্ষায় জানা যায়, কৃষিতে ১২০ দিনের নিচে কাজ পায় এমন কৃষক জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ। ১২১ থেকে ১৫০ দিন কাজ পায় এমন কৃষকের সংখ্যা ১৭ শতাংশ আর ১৫০ থেকে ১৮০ দিন কাজ পায় ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ বহু সংখ্যক কৃষক বছরে ৩ থেকে ৬ মাস কাজ পায়। বাকি সময় নানা ধরনের Informal Sector-এ নিয়োজিত। আর এখানে যে কৃষি সহায়ক Handicraft Industry ছিল তার প্রসার বিশেষ হয়নি।

৩. আশ্চর্য কথা World Bank-এর একটি রিপোর্ট ভারতবর্ষে আলোচিত হয়নি। এই রিপোর্টে Cross-Boarder Migration সম্বন্ধে অনেক তথ্য দেওয়া আছে। সোজা কথা, আমাদের সীমানা পার হওয়া কোনো সমস্যাই নয়—যখন তখন লোকেরা সীমানা পার হয়ে আসতে পারে। এদের সংখ্যা বিপুল। World Bank এর জন্য দায়ী করেছে আমাদের B S F কে—তারা কর্তব্য পালন ঠিকমতো করেনি। আর দায়ী করেছে আমাদের রেশন বিভাগকে। তারা সহজেই আমাদের রেশন কার্ড ইত্যাদি দিয়ে দেয়। আর এর মধ্যে কত ধরনের দুর্নীতি থাকতে পারে তার তালিকাও তৈরি করেছে। এই বিপুল জনসংখ্যার আগমনে যা বাড়ছে তা হচ্ছে জমির উপর এবং জমি নিয়ে টাগ্ অব ওয়ার (Tug of War) এবং প্রথা বহির্ভূত নানান বৃত্তি।

৯. কিছু বিবিধ সমস্যা

সমস্যা অনেক আছে তবে সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

ক) **ছিটমহল সমস্যা** : ছিটমহল সমস্যা আজকের নয়, বহুদিনের। এই ছিটমহলের সংখ্যা দেড়শ বা তার কিছু কম-বেশি। এখানে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। ভারতীয় হয়েও তারা নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ কোনো পরিষেবাই নেই তাদের জন্য। বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির অবস্থা ঠিক এমন নয়। এপার-ওপার যাতায়াতের জন্য আছে তিনবিঘা করিডর। এই ছিটমহল সমস্যার আশু সমাধান দরকার।

খ) **উত্তরবঙ্গে পরিবেশ সমস্যা** : আমাদের বিদ্যুৎ যা খরচ হয় তা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের দুই বা তিন শতাংশ। অথচ বিদ্যুতের অবস্থা চতুর্দিকে বেহাল। প্রায় ৫০ বছর ধরে আধুনিকীকরণ করা হয়নি। গ্রামে বিদ্যুৎ যায়নি। গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রায় নেই বললেই চলে। স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলি কেরালায় চলে অথচ পঃ বঙ্গে চলে না। অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই ওষুধ নেই, ডাক্তার আসে না। যদি কেরালা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে আমরাই বা তা পারি না কেন। এর জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এখানে রেললাইনের মাইলেজ স্বাধীনতার পর বিশেষ বাড়েনি। বহু জায়গায় এখনও রেল সার্ভিস নেই। আর যা আছে তারও

পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। রাস্তাও জনসংখ্যা প্রতি কম। এখানে ১ কিমি রাস্তা ৩০০০ লোককে সেবা করে, ভারতবর্ষে এই গড় ৪৪৩, ৭২০ উত্তরপ্রদেশে, ৩৮৪ মহারাষ্ট্রে, আর ৩২৮ কর্নাটকে। আর রোডের এখানে খুবই অভাব। কোচবিহার জেলার ১১৪৪টি গ্রামের মধ্যে শহর-সংযোগকারী রাস্তা মাত্র ৩৬১টি গ্রামে। অর্থাৎ ৭৮৩টি গ্রাম শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ঠিক মূল্য পায় কিনা সন্দেহ। সংযোগ রাস্তা যত কম হবে তত মহাজন ও ফড়িয়ার অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে।

গ) **ভিত্তিপ্রস্তর অর্থনীতি** : ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়, কাজ শেষ হয় না। তিস্তা প্রকল্প আজ ২২ বছর ধরে চলছে। তোর্ষা ব্রিজ শেষ করতে ১৭ বছরের বেশি সময় নিচ্ছে। সর্বত্রই ব্রিজগুলির ভগ্নদশা। সারাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও ১০ বছরেও কিছু নড়েচড়ে না। অথচ সামরিক দিক থেকে এই অঞ্চল খুব গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে অর্থনীতির উন্নতি সর্বত্রই স্বীকৃত।

১০. উপসংহার

যে কোনো সূচিকা নেওয়া হোক না কেন উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর। এই অনগ্রসরতা বুঝবার জন্য যদি মাথাপিছু আয়, শিক্ষা, মৃত্যু হার, কৃষি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিল্পহীনতা লক্ষ্য করি তবে উত্তরবঙ্গ Backward অনগ্রসর। আর অনগ্রসর কেন হয়েছে তা বোঝা যেমন উচিত তাকে কিভাবে দূর করা যায় তাও আমাদের জানা উচিত। আর যদি সমস্যা বুঝি তবে তার সমাধানও সহজ হয়।

Backward ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কেন হয় তা অধ্যয়ন করা আজকে UNO থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সর্বত্রই জোর দেওয়া হয়। বস্তুত আমাদের অনগ্রসর এলাকা নিয়ে যোজনা কমিশন নানান 'বিশেষ ব্যবস্থা' গ্রহণ করেছে। Marxian শাস্ত্রে Unequal Development -কেন হয় এবং তার পরিণাম কি তার সম্বন্ধে বিখ্যাত Marxist-রা অধ্যয়ন করেছেন—যেমন ইমানুয়েল, প্রেবিশ, হান্ট, ম্যানিয়োলিস্কি, পুলিনট্‌জাস প্রমুখ। অসম উন্নতি দূর করা না হলে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে তা সব বামপন্থী লেখকেরা স্বীকার করেছেন। সুতরাং উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর এই কথা বলার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ঘটনাটি বলা দরকার এই জন্য যে, উত্তরবঙ্গের অনগ্রসরতার কথা বললেই নানান ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

বস্তুত সমগ্র পৃথিবীতে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক টেকনোলজির যুগে বাজার বড় হতে হবে। তাই ইউরোপে ছোট ছোট রাজ্য-রাষ্ট্রগুলি এখন ছোট রাজ্য থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্রের দিকে যাচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকায় একই ধরনের আন্দোলন—এশিয়াতে ASEAN সবচেয়ে বড় সংস্থা। অর্থাৎ যুক্ত

হওয়াই এখন বিশ্বায়নের রূপ, বিযুক্তি হওয়া নয়। তবে কিভাবে কেন্দ্রীভূত শাসনের সঙ্গে অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব তা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা। বিরাট রাষ্ট্রে বিকেন্দ্রীভূত যোজনা দরকার আজ অমর্ত্য সেন থেকে মহবুল হক্ এশিয়ার অর্থনীতিবিদরা যেমন জোর দিচ্ছেন তেমন পাশ্চাত্য দেশেও এবং চীন দেশে Regional Planning-এর কেন দরকার তা বোঝান হচ্ছে।

অর্থনীতিতে বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্যই দরকার। আর এই দাবি ইতিহাস ও অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটা কোনো আলাদা থাকবার প্রচেষ্টা নয়। সুতরাং 'উত্তরবঙ্গ বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্ষদ' তৈরির কথা স্বীকৃত। আর এটা হলে কেন্দ্রীভূত যোজনা থেকে সহজেই বিকেন্দ্রীকরণ যোজনার দিকে যেতে পারবে। এর ফলে উন্নতি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে—আঞ্চলিক আশা-আকাঙক্ষার প্রতিফলন হবে।

বন্যা ও উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ

উত্তরবঙ্গের নানান সমস্যা। সমস্যাগুলি এতই বহুল যে, অল্প কথায় তার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এখানে অর্থনীতির উন্নতি শ্লথ। শিল্প এখানে প্রসার লাভ করেনি। কোনো জেলায় কোনো শিল্প নেই। হবে যে এমন স্থিরতাও নেই। কৃষি এবং চা এখানে একমাত্র অবলম্বন। আর কৃষি ও চা দুই-ই আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, বন্যা, নদী ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনে নদীতে ঘন ঘন প্লাবন, ডুয়ার্স ও পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ধস নিত্য ঘটনা। অথচ লোকসংখ্যা এখানে বিপুল পরিমাণে বাড়ছে। লোকসংখ্যা বাড়ার দু'টি কারণ—একটি নর্মাল বা যে হারে দেশের জনসংখ্যা বাড়া উচিত সেই হারের থেকে বেশি। তার কারণ Cross Border Migration—সেটি হচ্ছে মূলত তিনটি সার্বভৌম দেশ থেকে—বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান। উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা এই শতাব্দীতে তিনবার দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ যে জমি বা ভূমির ওপর লোকেরা নির্ভর করে আছে তা বন্যার প্রকোপে ক্রম ক্ষীয়মাণ। পাহাড়ি নদীকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় আজ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। যা করা হচ্ছে তা নিতান্তই টোটকা। কিছুটা বা লোক ভুলানো বা লোক দেখানো।

টোটকা দাওয়াই দিয়ে এই বিরাট সমস্যা সমাধান করতে যাওয়া রাজনৈতিক চাল হতে পারে তবে কোনো রকমেই বৈজ্ঞানিক নয়। ডুয়ার্সে বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্যার আশু সমাধান কেউ যে বৈজ্ঞানিকভাবে চেষ্টা করছে তা বলা যাচ্ছে না। গতবারের বা বছরের কিছু ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

প্রত্যেক বছরে বর্ষাতে নদী ভাঙন ঠেকাতে সেচ দপ্তর বাঁশের খাঁচা ও জালি তৈরি করে শাল খুঁটি বসিয়ে ভাঙন রোধের ব্যর্থ চেষ্টা। স্থায়ী নদী বাঁধ কোথাও বিশেষ হচ্ছে বলে খবর নেই। যেমন বলরামপুরের সাড়েয়ার পাড়ে সাড়ে আট লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁশের খাঁচা ও জালি তৈরি করে তোর্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। এই জোড়াতালি বাঁধ নদীর এক ধাক্কায় উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে। (উঃ বঃ সঃ 28th June, 1994) তুফানগঞ্জের নাককাটিগছ গ্রামেও রায়ডাক

নদীর ভাঙন ঠেকাতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাময়িক বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। বাঁধ সেখানে এক বছরও টেকেনি।

এই দুটি উদাহরণ মাত্র। সেচ দপ্তর হয়তো ভালোভাবে জানে না ঠিক কত এলাকা নদী গ্রাস করে যাচ্ছে—কত বসতি নষ্ট হয়েছে। ডুয়ার্স অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে কোনো সময়ে বন্যার কবলে পড়তেই পারে। তার কোনো হিসাব কোথাও আছে বলে জানা যায় না।

যা শোনা যায় বা বোঝা যায়, তা হচ্ছে সমস্যা যত গভীর অর্থের যোগান ততই কম। ঠিক সময়ে হয়তো মেরামত করলে হয়তো টাকা পয়সা কম লাগত—তবে সরকারি দপ্তরে হই হই রই রই ভাব আসে যখন বন্যার দাপট বাড়ে। আগের থেকে ভেবে চিন্তে কোনো পরিকল্পনা কোথাও বিশেষ নেই। অর্থাৎ টাকা নেই। পঃ বঙ্গের সামগ্রিক যোজনায় উঃ বঙ্গ Residual (দুয়োরানী) যেমন কোচবিহার জেলার কথাই ধরা যাক। এই জেলায় সেচ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ দুই কোটি টাকার কিছু বেশি। যখন সমস্যা আসে তখন সেচ দপ্তর জরুরি ভিত্তিতে ঠিকাদারদের নিয়ে কাজ শেষ করায়। সেটা বাজেট বরাদ্দ থেকে গত বছর এক কোটি দু কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ বাজেটের বরাদ্দ দুই কোটি আর জরুরি ঠেকা দিতে দিয়ে ঠিকাদারদের পাওনা তিন থেকে চার কোটি। আর এই কোটি হাতে না পেলে ঠিকাদাররা কাজ করবে না। জেলা শাসক চিঠি লেখেন সেচ দপ্তরকে, সেচ দপ্তর চিঠি লেখেন অর্থ দপ্তরকে, অর্থ দপ্তর বাজেট বহির্ভূত খরচের ভার বহন করতে রাজি, তবে টাকা নেই। অর্থাৎ শিব্রাম চক্রবর্তীর ভাষায় সেই বিখ্যাত কালান্তক লালফিতা। লালফিতা বাঁধন এতই শক্তপোক্ত যে কাজ কোথাও বেশি এগোয় না।

কাজের কাজ যে কিছুই হয় না—তা সত্যি নয়। নাককাটিগছের দেবগ্রামে ৫০০ মিটার গাইড বাঁধের ১৯৮৯ সালে (বিটিসি) অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দ্বীপর পাড়, নাটাবাড়ি, কৃষ্ণপুর, বালাভূত, সোনাপাড়া, মহিষকুচি গেদারচর, ভুঞ্জংমারী ইত্যাদি বিরাট অঞ্চলের জন্য বন্যা প্রতিরোধ ও ভূমি ক্ষয়ের প্রতিরোধে বহু ছোট বড় পাকা, স্থায়ী ইত্যাদি বাঁধ প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। এটা না হলে বন্যায় উঃ বঃ ভাসবে একথাও বলা ছিল। তার মিলিত খরচ অবশ্যই দু কোটির বেশ কয়েকগুণ। অর্থাভাবে কাজ কোথাও বেশি এগোতে পারেনি। আর প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ নাকি বাতিল। কোথাও কোথাও অর্ধপথে কাজ ফেলে রাখতে হয়েছে। ইচ্ছামারী, লংকাবাড়ী, বালাভূত, পূর্ব গুড়িয়াহাটি, যোপাতুলি, পুটিমারীতে বাঁধের জন্য সেচ দপ্তরের অনুমোদন নাকি ছিল। তবুও কাজ আরম্ভ হয়নি, হলেও মাঝপথের আগেই কাজগুলি শিকেয় তোলা হয়েছে।

অর্থাৎ আমরা এক খেলা দেখছি। সেচ দপ্তর প্রকল্প তৈরি করছে, অনুমোদনও পাচ্ছে, তবুও কাজ শেষ হচ্ছে না। অর্থের অভাব। অর্থের বরাদ্দ

থাকলেও তা ঠিক সময়ে পাওয়া অসম্ভব। প্রকল্প করা ও করে বাতিল এক খেলা। এই খেলায় কত গ্রাম, কত বসতি, কত কৃষিজমি, চায়ের জমি যে পাতাল বন্দী হচ্ছে তা বলা মুশকিল।

বোল্ডার সরবরাহ অন্য একটি সমস্যা। আগে বলা হত কেন্দ্রীয় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে রাজ্য বন দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করায় নদী বাঁধ নির্মাণে ঠিকমতো বোল্ডার পাওয়া সমস্যা। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পাহাড়ি নদীগুলি থেকে বোল্ডার তুলতে নিষেধাজ্ঞা ছিল বন দপ্তরের। পরবর্তী পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। বসরা, ধূমপাড়া সহ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কাছের নদীগুলি থেকে বোল্ডার তুলতে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ভুটান থেকে বোল্ডার সংগ্রহ বা ভুটান সংলগ্ন নদীগুলি থেকে বোল্ডার সংগ্রহে বন দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবুও রয়েলটির প্রশ্ন থাকায় বোল্ডার আনার খরচ নাকি কয়েকগুণ বেড়ে যাচ্ছে। সেচ দপ্তর জানিয়েছে খরচ বেশি পড়ায় টেন্ডার ডাকার পর ঠিকাদাররা অধিক রয়েলটি দিয়ে বোল্ডার নিয়ে আসতে চায় না। ফলে অর্থের অভাব, বোল্ডারের অভাব সব মিলেমিশে এক অদ্ভুত অবস্থা। যে কোনো কারণই থাক না কেন, কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই।

শোনা যাচ্ছে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের আওতাধীন নদী থেকে বোল্ডার তুলতে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক। বর্ষা আসার এক মাস আগে নাকি বোল্ডার তোলা হবে। বর্ষা যদি দেরি করে আসে তবে কি হবে? তা জানা যায় না। অর্থের অভাব তো আছে, আর আছে পরিকল্পনার অভাব। যেটা হচ্ছে, তার নাম Taut Planning. প্ল্যানিং হয় তবে রূপায়ণ হয় না। কর্মে ঠিকঠাক Substance নেই। দোয়াত আছে কালি নেই উত্তরবঙ্গে অনেকটাই ভিত্তিপ্রস্তর অর্থনীতি—যাকে বলা হয় Taut Planning। এই টাউট প্ল্যানিং উত্তরবঙ্গে সর্বত্র। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়—কাজ এগোয়নি· এমন অসংখ্য ঘটনা। এই কথা বলার সঙ্গে ভুটানের কথা বলা দরকার। কারণ ভুটানের পরিবেশে যা হচ্ছে তা ভারতবর্ষকে বিশেষত সংলগ্ন অঞ্চলকে প্রভাবান্বিত করবে। ভুটান অবশ্যই তার উন্নতি চায়—আর তার জন্য দরকার অর্থ ও বিশেষত বিদেশী মুদ্রা। এখানে বলে রাখা দরকার, ভুটানের বাজেটের ও উন্নতির এক বিরাট অংশ ভারত থেকেই আসে। ২০ বছর আগে ভুটানের বাজেটের খরচ প্রায় ৯০ শতাংশই বা বেশি ভারত থেকেই আসত। কিন্তু নানান রাজনৈতিক কারণে সম্পূর্ণ ভারত মুখাপেক্ষী হওয়াটা ভুটানীরা পছন্দ করছে না। ভারতের অনুদান এখন সমগ্র বাজেটের ৫০ শতাংশ বা তার কম বেশি। সংখ্যাতত্ত্বের গূঢ় তত্ত্বের মধ্যেও না গিয়ে বলা যায় ভুটান এখন keeping all eggs in one basket পছন্দ করছে না। এখানে basket-এর নাম Indian basket। ফলে ভুটান যেমন অন্য দেশ থেকে অনুদান পাবার চেষ্টা

করছে তেমন নিজস্ব সম্পদ বাড়াবার চেষ্টা করছে। যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি এখনও ভুটানে অনুদান ক্ষেত্রে প্রবেশ করেনি, তবুও যুক্তরাষ্ট্রের বকলমে কানাড়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং চীন দেশ ভুটানে তাদের প্রতিপত্তি ও অনুদান বাড়াবার চেষ্টা করছে। এটা আশ্চর্যের কিছু নয়, ভুটানের স্ট্র্যাটেজিই হচ্ছে ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক যতটা সম্ভব শীতল যুদ্ধের আকারে রাখা যায় ভুটানের ততটাই লাভ।

তবে আধুনিকতার ছোঁয়া ভুটানে আসতে আরম্ভ করেছে। এই আধুনিকতার ছোঁয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যাকে বলে গণতন্ত্রের অধিকার। পার্টি তৈরি করার অধিকার। নিজের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। খবরের কাগজ পড়ার অধিকার। এমন কি T.V.-র News ও গান শোনার অধিকার। ভারতের পক্ষে এর নিটফল হচ্ছে ভুটান থেকে বিতাড়িত এক বিরাট নেপালিভাষী জনসংখ্যার এই ডুয়ার্সে আগমন। ঠিক কত এসেছে বলা মুশকিল। তবে 'সেনসাস' থেকে কিছু জানা যেতে পারে। যদিও আমরা যে অর্থে সেনসাস করি ভুটান সরকার সেই অর্থে করে না। ভুটানের সেনসাসে নানান অসঙ্গতি আছে। সে কথা এখানে আলোচনার দরকার নেই।

তবে ভুটান United Nations-কে জানিয়েছিল যে ১৯৬০ সালে ভুটানের জনসংখ্যা 1.60 Million। মোটামুটি ভাবে বলা যায় ভুটানের জনসংখ্যা 2 million-এর নিচেই ছিল। তবে বর্তমানে নানান রাজনৈতিক অস্থিরতা। দেশ থেকে তথাকথিত নেপালিভাষী অ-নাগরিকদের বিতাড়ন করার পর সরকারিভাবে ভুটান জানাচ্ছে তাদের লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষর কাছাকাছি। সোজা হিসেবে প্রায় ৬-৭ থেকে লক্ষ লোক দেশ থেকে বিতাড়িত, নির্বাসিত। পৃথিবীতে সেনসাসে লোকসংখ্যা বাড়ে, কমে না। তবে ভুটান একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না—তবে বলাই বাহুল্য এক বিরাট ছিন্নমূল জনসাধারণ ভুটান থেকে ডুয়ার্স অঞ্চলে আজ এসেছে এবং তারা এখানেই থাকবে। স্বদেশে ফিরবার কোনো উপায় নেই। মানে আবার বনাঞ্চলে, নদীর চরে, গ্রাম ও শহরের বাইরে ও ভিতরে একদল লোক জীবিকার আশায় ঢুকে পড়েছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি কিছুটা বেহাল হতে বাধ্য। ভদ্রতার খাতিরেই বেহাল কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে।

এর থেকেও এক বড় প্রশ্ন আছে। ভুটান নানা জাগতিক, পারিভৌতিক, পারত্রিক কারণে স্বাবলম্বী হতে চায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভারত মুখাপেক্ষী হতে চায় না। নতুন সম্পদের খোঁজার চেষ্টায় ভুটান এখন নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে। আবার পাহাড়ের নিচের লুক্কায়িত গুপ্তধন খনিজ পদার্থের উত্তোলনে নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর অস্থির পাহাড়ের যেখানে খনিকার্য করা উচিত নয় সেখানেও অবস্থার ও অর্থের তাগিদে

ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটিয়েই যাচ্ছে। উন্নতির নাম করে আরও একটি জিনিস হচ্ছে, তা বনজ সম্পদ রপ্তানি করা।

বনজ সম্পদ রপ্তানি করা ছাড়া নেপালে বা ভুটানের Exportable surplus কি থাকতে পারে? আগে নেপালে চাল রপ্তানিযোগ্য বা Exportable surplus ছিল। এখন আর চাল রপ্তানি বিশেষ সম্ভব নয়। ভুটান কি Export বা রপ্তানি করতে পারে? বনজ সম্পদ রপ্তানি ছাড়া ভুটানের বিশেষ গত্যন্তর নেই। ফলে ভুটান অঞ্চলে যেভাবে বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে তথাকথিত আর্থিক উন্নতির স্বার্থে তা আমাদের অঞ্চলে এনেছে অজস্র সমস্যা। আমাদের বহু নদীর উৎপত্তিস্থল ভুটান। ফলে নদীর উৎসে বন থাকলে বন যে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ করত তা আর হচ্ছে না। ভুটানের নদী আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই তরঙ্গ রুখিবে কে? কারণ অর্থের অভাব, পরিকল্পনার অভাব এবং কিছুটা ইচ্ছার অভাব। ভুটানের সঙ্গে ভারতের বোঝাপড়ার অভাব। ভুটান তার আর্থিক স্বাবলম্বিতার জন্য বন কেটেই যাচ্ছে। আর এটাও ঠিক, ভারতের বিশেষত ডুয়ার্স ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বনাঞ্চল ক্রমশ সঙ্কুচিত। বছরে এই অঞ্চলে যেভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে তা নাকি আকারে হাঙ্গেরীর সমান।

এ শতাব্দীর সবচেয় বড় খবর কি? দু'টি যুদ্ধ? রাশিয়ায় কম্যুনিজমের আগমন এবং আপাত নিষ্ক্রমণ? ভারতের স্বাধীনতা? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাওয়া? টেকনোলজি? একদল লোকের ধারণা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় খবর চেরাপুঞ্জিতে জল কিনে খেতে হচ্ছে। আবহাওয়ার এমনি পরিবর্তন? বৃষ্টির দিনের সংখ্যা কমছে কিন্তু Intensity বাড়ছে। একটি রিপোর্টে তো বলাই আছে যে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে এই অঞ্চলে দুটি জিনিস নাকি থাকবে না। Tea এবং Timber চা-ভূমি আর অরণ্যভূমি। কেনই বা বনের এই অবক্ষয়। "Usually uncontrolled deforestation is a symptom of society's inability to get a grip on other fundamental development problems: agricultural stagnation, grossly unequal land-tenure, rising unemployment, rapid population growth and the incapacity to regulate private enterprise to protect the public interest." (Eric Eckholm :- World Watch Paper_World World Institute Washington Feb. 1974).

অমর্ত্য সেনের বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ। "In 1974 extensive flooding in Bangladesh partly caused by progressive deforestation in the Himalayan region and Eastern Indian Watersheds sharply reduced the rice harvest and the ensuing famine claimed a third of million lives" (Lester R. Brown-Signs of stress-World watch Paper-8)

অর্থাৎ বনাঞ্চল মানে শুধু প্রকৃতির পরিবর্তন নয়, দুর্ভিক্ষ মহামারী যে কোনো জায়গায় আসতে পারে। পৃথিবী খুবই Interrelated. ব্রিটিশদের এক রিপোর্টে আছে জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চলে বনাঞ্চল ধ্বংস হলে সুন্দরবনের অস্তিত্বও নাকি থাকবে না। ভুটানের বা নেপালের জঙ্গল কাটা হলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে। ব্রাজিলের আমাজন অরণ্যের ধ্বংস হলে সমস্ত পৃথিবীতে তার প্রভাব পড়বে। পৃথিবীতে কোনো বনাঞ্চল বা পাহাড় ঠিক কোনো এক দেশের নয়, বিশ্বমানবের।

ভুটান-ডুয়ার্সের কথায় আসা যাক। আমরা যাকে বলি sustainable society তা কিছুটা নির্ভর করছে Bio-diversity-র উপর। পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় পৃথিবী থাকার ফলে মানুষ ও অন্য প্রাণী ও জীবজগৎ বেঁচে আছে। UNO থেকে যে Bio-diversity-র Map তৈরি করা হয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে যে Bio-diversity ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, ভুটান-নেপাল-হিমালয় সংলগ্ন ডুয়ার্স, তরাই অঞ্চলের গাছপালা পশুপাখি, জীব-বৈচিত্র্যের মধ্যে। যত Bio-diversity নষ্ট হবে তত বেশি মানুষের ভবিষ্যৎ হবে আকস্মিকতার শিকার। যদিও Bio-diversity এই অঞ্চলে অরণ্যের উচ্ছেদে, বন্যার আক্রমণে, ঘন ঘন Landslide-এ ধ্বংস হয় তবে যে sustainable society-র কথা আমরা বলছি তার মূল প্রায় উচ্ছেদ হবার উপক্রম।

যেহেতু ডুয়ার্স, ভুটান, নেপাল অঞ্চল Bio-diversity-র কেন্দ্রমূল তাই এখানে বাঁধ করে Irrigation করাই শেষ কথা হতে পারে না। আবোল-তাবোল অবৈজ্ঞানিক Irrigation বা সেচ ব্যবস্থা এই অনুভবনশীল ও সতত ক্রিয়াশীল অঞ্চলে নানা সমস্যা আসতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে আমাদের Subterranean Hydrology বা ভূ-তলে জলের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। 1979 সালে UNO Report জানাচ্ছে Tigris Euphrates সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ অবৈজ্ঞানিক সেচ ও জল ব্যবস্থা। UNO একটি Statistical কাজ করেছে। তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জল, নদী ভূতলে জল, নদীর নাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা যদি ভালোভাবে পঠন-পাঠন না করি জমির উৎপাদিকা শক্তি হঠাৎ কমে যেতে পারে। অর্থাৎ salinisation waterlogging. একটা সময়ের পর, সমস্যা দেখা যেতে পারে। Water balance কথাটি আজকাল UNO প্রায়ই ব্যবহার করছে। Mesopotamia-র সভ্যতা কি Water balance ধ্বংস হবার ফলেই পতন হয়েছিল? Aswan Dam কি ইজিপ্টের Water balance নষ্ট করেছে? Mexico-র সভ্যতার হঠাৎ পতন হবার পেছনে কি জল সমস্যা? টেকনোলজি দরকার তবে কোন্ টেকনোলজি ব্যবহার করা দরকার তার জন্য প্রয়োজন সংখ্যার গভীরে যাওয়া। চটজলদিতে সমস্যার সমাধান হবার নয়। আর বিশেষভাবে বলতে হয় ভুটান Bio-diversity-র কেন্দ্রমূলে অবস্থিত হয়েও যেভাবে উন্নতির মডেল তৈরি করেছে তাতে Sub-Himalayan

অঞ্চলে আজ সমস্যা। ভূমিক্ষয়, বন-সংকোচন, ঘনঘন বন্যা আজ এ অঞ্চলে এক ভারসাম্যর সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

ইথিওপিয়াতে আজ প্রায় ৯ বছর ধরে একনাগাড়ে দুর্ভিক্ষ। ঐতিহাসিক ভাবে ইথিওপিয়া বিশ্ব সভ্যতার বাল্যভূমি। হঠাৎ ঘন ঘন এত দুর্ভিক্ষ কেন? একটি UNO Report জানাচ্ছে "Famine is the result of the acts of millions of Ethiopians struggling for survival : scratching the surface of eroded land and eroding it further, cutting down the trees for warmth and fuel and leaving the country denuded...... Over one billion-one billion tons of top. soil flow from Ethiopia's highlands each year." এই ডুয়ার্স অঞ্চলে ঘনঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমরা কত ভূমিক্ষয় দেখছি। ইথিওপিয়ার যে সমস্যার কথা বললাম তা কি ডুয়ার্সের সমস্যা থেকে আলাদা? না History repeats itself? ইথিওপিয়া কিংবা ডুয়ার্সের সমস্যা কি এক?

কিছু সমস্যার কথা বলি।

১. বন্যায় ও ভূমিক্ষয়ে আমরা যা top soil হারাচ্ছি তার পরিমাপ বিশেষ নেই। অর্থাৎ estimate নেই Guesstimate বড় জোর আছে

২. বন কাটার ফলে এক ধরনের Green House effect দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যার ফলে বছরে Rainy days-এর সংখ্যা কমছে কিন্তু অনেক বছরে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়াতে বন্যার প্রকোপ বাড়ছে।

৩. অনেক নদীর উৎস আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভুটান ও নেপাল। ভুটানের অর্থনীতির প্রয়োজনে বা স্বাবলম্বী হবার চেষ্টায় mining এবং বনাঞ্চল ক্ষীয়মাণ। ফলে ভুটানের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের ডুয়ার্সেও বিপর্যয় আনছে।

৪. বিপর্যয় আমাদের দেশেও হচ্ছে। মাথাপিছু বনাঞ্চল দার্জিলিং জেলায় বর্তমানে মাথাপিছু .009 হেক্টর। ১৯০১ সালে তা ছিল 0.62h অর্থাৎ প্রায় বছরে মাথাপিছু অন্তত 9 গুণ কমেছে বা তার কিছু কম বেশি।

৫. এখনও ডুয়ার্সে 42 শতাংশ fuelwood বা জ্বালানি আসে বন থেকেই। ফলে জ্বালানি সমস্যা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। আর ভুটানই হোক বা ডুয়ার্সই হোক আমাদের কোনো জ্বালানি নীতি নেই।

৬. নগরায়ন যত বাড়ছে তত বেশি বন কমছে। correlation co-efficient for population growth in relation to forest cover 1901-1991 সাল পর্যন্ত 0.97034। আরও বলা যায় যদি নগরায়ন ১ শতাংশ বাড়ে forest coverও প্রায় ১ শতাংশ হারে কমছে।

৭. Bio-diversity conservation-এর প্রয়োজনে man forest সম্পর্ক কি হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। —যদিও তর্ক হয়েছে প্রচুর।

৮. সব দোষই ভুটান এই থিওরি অচল। আমরা সরকারি অনুমোদিত

Replantation ও Reforestation টার্গেটে পৌঁছাতে পারেনি। এবং এই ঘাটতি বা Short fall ডুয়ার্সে ও দার্জিলিং অঞ্চলে ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ—আরও বেশি।

৯. বনাঞ্চলে চুরি ও মাফিয়ারাজ আমরা বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি। এটা ভুটানে যেমন সত্য ডুয়ার্সেও সেটা সত্যি। প্রশ্ন থেকেই যায়। এই মাফিয়াদের আনুকূল্য কোথা থেকে আসছে? বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌দের কাছ থেকে, না স্থানীয় VIP-দের কাছ থেকে, না forest-এর খোদ বুরোক্রেসির থেকে। উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো সবাই মাফিয়ারাজই চায়।

১০. যদি ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, যেমন বন্যা, তবে Land-man Ratio আরও প্রতিকুল হতে বাধ্য। যত Land-man Ratio খারাপ হবে তত Intensive Cultivation -এর ফলে সাময়িক সমাধান আর ভবিষ্যতের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। এখানে Choice-এর যেমন সমস্যা, তেমন সমস্যা Technology-র। আমরা এই বিষয়ে খুব যে চিন্তা করছি তাও নয়। টেকনোলজি বা নতুন কোনো system-ই আমরা এই বন্যা বা ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারব কিনা সন্দেহ। বিশেষত যদি টেকনোলজি ধার করা হয়। এই বিষয়ে রিসার্চ এখানে হাঁটি হাঁটি পা পা। মোট কথা আমরা এখন তিন ধরনের চাপ বা বেদনা অনুভব করছি। প্রথমটার নাম Ecological Stress—এতে সম্পদ কমছে বা ধ্বংস হচ্ছে, ভূমিক্ষয় হচ্ছে। Ecological Stress- থেকে আসছে অর্থনৈতিক বা Economic Stress—মানে মাথা পিছু উৎপাদন কমছে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে আর বেকারি আকাশচুম্বী। Economic Stress থেকেই আসছে Social Stress, ক্ষুধা, নীতিহীনতা, দেশান্তর যাত্রা, মাইগ্রেশন, শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি আর সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এই ত্রিভুজে Ecological, Economic আর Social stress-এর মধ্যে থাকলে জাতীয় মেরুদণ্ড ক্ষীয়মাণ হতে বাধ্য। We have inherited the Duars from our fathers but we are borrowing it from our children.

ডলার বিশ্বমুদ্রা, তাই মার্কিন আধিপত্য

পৃথিবীব্যাপী এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা বলবে তাই সবাইকে মানতে হবে। অন্তত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব ধারণা তাই। এর প্রধান কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরের মুদ্রা ডলার এখন বিশ্বমুদ্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে এখন বিশ্ববাণিজ্য চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারই বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রিজার্ভ কারেন্সি। অনুন্নত দেশগুলি ঋণ পায় ডলারে। অর্থাৎ ডলার এখন বিশ্বব্যাপী আর যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার 'একমাত্র' বাণিজ্য মুদ্রা আর রিজার্ভ কারেন্সি তাই মার্কিন আধিপত্য এখন অন্তত আকাশচুম্বী।

ডলারই একমাত্র বাণিজ্য মুদ্রা—এই কথাটির মানে বোঝা দরকার। পৃথিবীতে অন্তত ২০০টি সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে। আর সার্বভৌম রাষ্ট্র মানে প্রত্যেক দেশের আলাদা মুদ্রা আছে। যেমন, ভারতবর্ষে রূপি, বাংলাদেশের টাকা, ফ্রান্সের ফ্রাঁ, জার্মানির ডয়েচমার্ক, ইংল্যান্ডে পাউন্ড, স্টার্লিং, ইতালিতে লিরা, জাপান দেশে ইয়েন, নরওয়েতে ক্রোনার ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি প্রায় দু'শটি দেশ থাকে তবে প্রত্যেক দেশেরই আলাদা ও পৃথক মুদ্রা আছে। আর এই মুদ্রায় স্বদেশে জিনিস কেনা যায় কিন্তু বিদেশে কেনা যায় না। যেমন, ভারতবর্ষের রূপিতে ভারতেই জিনিস কেনা যায়। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রা রূপিতে জাপানে জিনিস কেনা যায় না। উল্টোটাও সত্য, জাপানি ইয়েন ভারতবর্ষে অচল। কোনো দোকানদার জাপানি ইয়েনে ভারতে কেনাবেচা করবে না।

এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে, যদি ভারত জাপান থেকে কোনো জিনিস কেনে তবে কোন্ মুদ্রায় জাপানিদের অর্থ দেবে? ভারত যদি জাপানকে অর্থ দিতে চায়, তাকে বলে বিশ্ববাণিজ্য, তবে সেটা কোন্ মুদ্রায় হবে? ভারত যদি জাপান থেকে আমদানি করে তবে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারই জাপানিরা গ্রহণ করবে। ভারতও যদি ব্রাজিলে রপ্তানি করে তবে ব্রাজিলও ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দিতে বাধ্য। ভারতও অন্য কোনো মুদ্রায় তার পাওনা নেবে

না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য। অন্য কোনো মুদ্রায় আমদানি-রপ্তানি হয় না। আর যদি হয় তবে সামগ্রিক বিশ্ববাণিজ্যের তা এক ক্ষুদ্র অংশ। প্রশ্ন উঠতে পারে, জাপানিদের ইয়েন কিংবা জার্মানির মার্ক বিশ্বমুদ্রা নয় কেন? তার কারণ, একাধারে ঐতিহাসিক, অন্যদিকে গ্রহণযোগ্যতা। ইয়েনের গ্রহণযোগ্যতা কম, জার্মানির মার্কও তাই। গ্রহণযোগ্যতা একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বিশ্বমুদ্রা আর পৃথিবীতে সব লেনদেনের সিংহভাগই হয় ডলারে।

গ্রহণযোগ্যতা কিসের ওপর নির্ভরশীল। বলা মুশকিল—কারণ ব্যাপারটা অনেকটাই 'মানসিক' বা সাইকোলজিক্যাল। তাই রাশিয়ার রুবল বিশ্বমুদ্রা নয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার সর্বত্রই গ্রহণযোগ্য। পৃথিবীর সব সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কই ডলার গ্রহণ করে কিন্তু ভারতের মুদ্রা রূপি, রাশিয়ার রুবল বা চীন দেশের মুদ্রা গ্রহণ করে না। বিশ্বে প্রায় একমাত্র বাণিজ্য মুদ্রা ডলার হল ১৯৭১ সাল থেকে। যদিও তারিখ নিয়ে কিছু বিবাদ আছে।

কথা উঠতে পারে, ১৯৭১ সালের আগে কি বিশ্ববাণিজ্য হত না? পৃথিবীর আদিকাল থেকেই বিশ্ববাণিজ্য চলে আসছে। আমাদের দেশে চাঁদ সওদাগর পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে বাণিজ্য করেছেন। আরব দেশেও বাণিজ্য পৃথিবীর আদিকাল থেকেই হয়েছে। ইতালির ভেনিস শহর বিশ্ববাণিজ্যের জন্য এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেছে। পৃথিবীতে আগেও বিশ্ববাণিজ্য ছিল প্রায় সৃষ্টির আদিকাল থেকে। তখন কোন্ মুদ্রায় কেনাবেচা হত? তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে পৃথিবীতে কোনো দেশই ছিল না।

সাধারণভাবে বলা যায়, আদিকালে বিশ্ববাণিজ্য হত দুই প্রথায়। প্রথম প্রথা ছিল বার্টার পদ্ধতিতে। অর্থাৎ কোনো দ্রব্য রপ্তানি করলে বিনিময়ে কোনো দ্রব্য আমদানি করতে হবে। বার্টার বা বিনিময় প্রথায় প্রধানত এখনও রাশিয়া বিশ্ববাণিজ্য করে। আর দ্বিতীয় প্রথা ছিল স্বর্ণমুদ্রায়। জিনিস অন্য দেশে বিক্রি করলে স্বর্ণে তার মূল্য ঠিক হত। সোনা বা স্বর্ণ পৃথিবীতে আদিমতম বিশ্বমুদ্রা। পৃথিবীতে অনেক স্বর্ণজাতীয় ধাতু পাওয়া যায়। যেমন লৌহ। তবে লৌহ কেন বিশ্বমুদ্রা হল না? উত্তরটা হচ্ছে, পৃথিবীর আদিযুগ থেকেই স্বর্ণমুদ্রাই সর্বত্রই গ্রহণযোগ্য। সবাই মনে করে সোনার দাম সব সময় বাড়বে কখনও কমবে না। আর অন্য ধাতু বহন করাটা কষ্টসাধ্য। অতএব পৃথিবীতে আদিযুগ থেকে স্বর্ণমুদ্রাই ছিল বিশ্বমুদ্রা। যদিও কখনও কখনও রৌপ্যমুদ্রায় পৃথিবীতে বিশ্ববাণিজ্য চলত। আমাদের ভারতবর্ষে রূপি কথাটি নাকি রৌপ্য থেকে এসেছে। তবে মনে রাখা দরকার রৌপ্যমুদ্রা মুখ্যত ছিল দেশজ—আর স্বর্ণমুদ্রা ছিল বিশ্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য। স্বর্ণমুদ্রায় যতটা বিশ্ববাণিজ্য হত অন্য কোনো মুদ্রায় বিশ্ববাণিজ্য ততটা হত না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আই এম এফ বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা। তখন ঠিক হল, স্বর্ণ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দুটোই বিশ্ববাণিজ্যে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বর্ণ ও ডলারে কেনাবেচা হবে আর স্বর্ণের মূল্য স্থির করা হল। ভিয়েতনামের যুদ্ধ প্রায় ১২ থেকে ১৩ বছর চলেছিল। হঠাৎ দেখা গেল, এই যুদ্ধে স্বর্ণের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল আর ওঠানামা করতে লাগল। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী সোনার দাম যত বাড়ে বা কমে তত বিশ্বব্যাপী নানান সমস্যা। কেন সোনার দামে পৃথিবীতে কেনাবেচা হবে তা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ঠিক করতে পারল না। উপরন্তু দেখা গেল, স্বর্ণ উৎপাদন পৃথিবীব্যাপী কমছে। পৃথিবীর বাণিজ্য বাড়ছে ১০ থেকে ১২ শতাংশ হারে অথচ সোনা পাওয়া যাচ্ছে ১ থেকে ২ শতাংশ হারে। মুখ্যত, সোনা পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় আর সোনার দাম বাড়লে দক্ষিণ আফ্রিকার পীড়ন, জাতিবিদ্বেষ, পৃথকীকরণ বা যাকে বলা হয় অ্যাপারথাইড় তা বাড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া স্বর্ণ পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতে কোলার স্বর্ণ মাইন্সে অত্যল্প পাওয়া যায়। এখন তাও প্রায় বন্ধ। অর্থাৎ পৃথিবীতে সোনার অভাব, বাণিজ্যের প্রয়োজনে সোনা পাওয়া যাচ্ছে না।

সোনার সঙ্গে যখন ডলারের দাম ওঠা-নামা করছে, তখন নিক্সন বা তদানীন্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দুটো জিনিস করলেন। প্রথমত, সোনার সঙ্গে ডলারের দাম De-link বা যোগসূত্র ছেদ করে দিলেন। আর দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাপী মুদ্রার বিনিময় হার বা যাকে রেট অব এক্সচেঞ্জ বলে তা উন্মুক্ত করে দিলেন। রাষ্ট্র বা আই এম এফ এখন আর মুদ্রার বিনিময় হার ঠিক করবে না। বাজারের চাহিদা ও যোগানের ওপর মুদ্রার বিনিময় হার ঠিক হবে। এর বর্তমান নাম ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ রেট। যার মানে ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে। রাষ্ট্র নয়, এখন বাজারই ঠিক করবে বিনিময় হার কি হবে।

পৃথিবীর আদিকাল থেকে যে সোনা বিশ্বমুদ্রা ছিল তা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের এক সভায় শেষ করে দেওয়া হল। একে বলা হয় জামাইকা কনফারেন্স, যেটা ১৯৭৮ সালে হয়। ১৯৭৮ সালে ঠিক হয় স্বর্ণ দিয়ে পৃথিবীতে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না। বিশ্ববাণিজ্য থেকে স্বর্ণ নির্বাসিত হল। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম খুব আপত্তি জানাল। কিন্তু কোনো আপত্তি টিকল না। স্বর্ণ দিয়ে বর্তমানে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য হবে না। ১৯৭৮ সাল থেকে বিশ্ববাণিজ্যে স্বর্ণ ব্যবহৃত হয় না—যদিও দু-একটি ব্যতিক্রম আছে। যেমন, ১৯৮২ সালে ইতালি বিপদে বাণিজ্যে স্বর্ণ ব্যবহার করেছিল।

স্বর্ণ যদি না থাকে তবে ডলারেই বিশ্ববাণিজ্য হবে—কারণ কোনো একটা মুদ্রা দরকার বিশ্ববাণিজ্যে। ফ্রান্সের দ্য গল খুব চিৎকার করে বললেন,

নিশ্চয়ই আছে। অবশ্যই আমরা নতুন এক পৃথিবীতে পদার্পণ করছি। তার সম্ভাবনাও আছে, আবার মনে রাখতে হবে বিপদও আছে। লাভও যেমন হবে, ক্ষতিও প্রচুর হতে পারে।

ক্ষতিটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে একদল লোকের ও সংস্থার হাতে 'কাঁচা টাকা' জমা হয়ে আছে। সেই কাঁচা টাকা তো এরা মাটিতে পুঁতে রাখবে না। টাকাটা খেলাবে। আর 'খেলাবার' প্রধান এবং আদর্শ জায়গা হচ্ছে বিশ্বের শেয়ার বাজার। আর বিশ্বে যদি কোনো শেয়ার অল্প দামে কিনি আর বেশি দামে বিক্রি করি তবে লাভ হবে। আর শেয়ার বাজারে দু'ধরনের লোক দালাল বা ফাটকাবাজ থাকবেই। এক দলের নাম 'ভালুক বা বেয়ার'। আর অন্য দলের নাম ষাঁড় বা বুল। ভালুকরা মনে করে শেয়ারের দাম কমবে আর ষাঁড়রা মনে করে শেয়ারের দাম বাড়বে। বাজারে ভালুক ও ষাঁড় থাকাতে শেয়ার বাজারে ঘন ঘন উত্থান-পতন আবার দাম কমাবার ও বাড়াবার সতত প্রয়াস। কম দামে শেয়ার কিনে যদি বেশি দামে বিক্রি করা যায় তবে লাভ।

অনেকে বলবে শেয়ার বাজার তো আগেই ছিল। আর সেখানে দালালরা শেয়ার বেচা-কেনা করে শেয়ারের দাম ওঠাতো ও কমাতো। তবে বর্তমানে কি পরিবর্তন হল? পরিবর্তনটা হল এই যে, আগে দেশীয় লোকরাই শুধু শেয়ার বাজারে দালালি করত এখন দেশী বাজারে বিদেশীরাও কেনা-বেচা করতে পারে। আর এটাই বিরাট এক 'গুণগত' পরিবর্তন।

দেশী দালালদের হাতে অর্থ ছিল তবে সীমিত। আর বিদেশী ফাটকাবাজারীরা আসাতে অর্থের জোগান প্রায় অফুরন্ত। তারা বাজারে কম দামে শেয়ার কেনে, আর যখন কেনে তখন শেয়ারের দাম চড়া হয়, তখন বিক্রি করে দেয়। মাঝখান থেকে লাভ করে নেয়। আর শেয়ার বাজারে কত বিদেশী মুদ্রা কেনা-বেচা করছে তার হিসেব এখন বিলিয়ন ডলারে রাখা হয় না, রাখা হয় ট্রিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ অনুন্নত দেশে শেয়ার বাজারে এখন ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন বিদেশী মুদ্রা। তারা সব দেশের শেয়ার কিনছে। যেখানে কম দাম সেই সব শেয়ার কিনে চড়া দামে বিক্রি করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত লাভ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশে ফাটকাবাজারি করছে। আর যখন ক্ষতির সম্ভাবনা তখন সেই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। লাভের আশায় এই দেশে এসেছে, না পোষায় অন্যত্র চলে যাচ্ছে। আজকে থাইল্যান্ডে আছে, কালকে চিলিতে চলে যাবে। আজকে ভারতে আছে, কালকে মেক্সিকোতে চলে যাবে। এর জন্য এর নাম হট্ মানি—সতত সঞ্চরণশীল, নিয়ত ভ্রমণশীল, কোথায় লাভ আর কোথায় লোকসান এই হিসেবে দক্ষ। তারা মুখ্যত দালাল, দেশের উন্নতি ও অবনতিতে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

দু'বছর আগে থাইল্যান্ডে, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতে যে বিপর্যয় হয় তার প্রধান কারণ এই গরম টাকা। থাইল্যান্ডের উদাহরণ দেওয়া

যাক। ১৯৮০ সাল থেকে থাইল্যান্ডের অর্থনীতি খুবই শক্তিশালী। রপ্তানি প্রচুর বেড়েছে। শিল্পেও থাইল্যান্ডে প্রভূত উন্নতি করেছে। নতুন নতুন কোম্পানি তৈরি হচ্ছে। আর শেয়ার বাজারে বিদেশী গরম টাকা, এইসব শেয়ারের দাম চড়া হতে আরম্ভ করল। যখন দাম বাড়ল বিদেশীরা বিক্রি করে লাভ পেল। এখন লাভটা হয়েছে থাইল্যান্ডের মুদ্রায় নাম 'ভাট' (Bhat)—বিদেশীরা এখন তাদের পুরো লাভটাই 'আমেরিকার ডলারে' বিনিময় করতে চাইল। ভাটের যোগান বৃদ্ধি হল, ডলারের দাম বেড়ে গেল। থাইল্যান্ডের বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় কমে গেল। যত কমে গেল তত বেশি ভাটকে ডলারে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হল। তত থাইল্যান্ডের বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় কমে গেল। থাইল্যান্ডে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা বা ক্যাওস (Chaos)। থাইল্যান্ডে একদিনে মুদ্রার অবমূল্যায়ন হল ৮০ শতাংশ। আর সবটাই হট মানি তাদের মুনাফা ডলারে রূপান্তরিত করতে চাইল বলে হল।

এখানেই শেষ হল না। থাইল্যান্ড দঃ কোরিয়া বা জাপান থেকে আমদানি করে। থাইল্যান্ডের যেই বিদেশী মুদ্রা কমে গেল তারা আর আমদানি করতে পারল না। ফলে কোরিয়ান শিল্পগুলি তাড়াতাড়ি অন্য বাজার তৎক্ষণাৎ খুঁজে পেল না। কোরিয়ার রপ্তানি কমে গেল। অনেক শিল্প বন্ধ হল। যে শিল্পগুলি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিল তা শোধ করতে পারল না। ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ না হওয়ায় ব্যাঙ্ক বন্ধ। যত ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ তত শিল্পও বন্ধ। যত শিল্প বন্ধ হয় তত বিদেশী গরম টাকা কোরিয়া ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। ফলে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি। যত ঘাটতি তত গরম টাকা কোরীয় মুদ্রা ছেড়ে আমেরিকার ডলারে বিনিময় চাইল। যা আরম্ভ হয়েছিল থাইল্যান্ডে তা চলে গেল কোরিয়াতে। আর কোরিয়া থেকে জাপানে। আর জাপান থেকে ইন্দোনেশিয়া। আর ইন্দোনেশিয়া থেকে মালয়েশিয়া। অর্থাৎ গরম টাকা যদি এক দেশ ছেড়ে যায় তবে তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। আর গরম টাকা যে কোনো বিশেষ দেশে থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আজ আছে কাল নেই। সবটাই নির্ভর করছে শেয়ার বাজারে লাভ হবে কিনা তার ওপরে।

এই গরম টাকা কি আগে ছিল? উত্তর হচ্ছে, গরম টাকার উৎপত্তি সত্তর দশকে, তবে বিশ্বায়নের পর এর মাত্রা বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। বিশ্বায়ন মানে এক দেশের ক্যাপিটাল বিনা বাধায় অন্য দেশে চলে যেতে পারবে এবং অন্য দেশের শেয়ার কিনতে বা বেচতে পারবে। এর ওপর বিশেষ বিধি-নিষেধ থাকবে না। ক্যাপিটাল মানে যে অনেক সময় গরম টাকা এই খেয়ালটা তখন অনেকের হয়নি। মালয়েশিয়া থেকে দাবি উঠেছে এই গরম টাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

আবার প্রশ্ন আসে এত ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলারের উৎপত্তি কি করে হল। এই ধরনের কাঁচা টাকার আসল উৎস কোথায়? এর উত্তর পাওয়া সহজ নয়।

কারণ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভারতে কত 'কালো টাকা' আছে তার উত্তর সোজা নয়। গরম টাকার একটা উৎস বিশ্বব্যাপী কালো টাকার 'সাদা' করার প্রয়াস। আবার দ্বিতীয় উৎস বলা হয় পেট্রো ডলার (Petro Dollar)। আরব শেখরা তাদের তেল বিক্রির রয়্যালটি তাদের দেশে রাখছে না। তারা নিজেদের দেশে না রেখে বিশ্বে বিভিন্ন ফাটকাবাজারি করে এমন সংস্থায় এবং ব্যাঙ্কে তাদের ডলার রাখছে। এই পেট্রো ডলার কয়েক ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলার। কত বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার তা ভাবলে মাথা খারাপ হবার যোগাড়। তৃতীয় উৎস হিসেবে বলা হচ্ছে ইউরো ডলার (Euro Dollar)। তার মানে বেশি লাভের আশায় আমেরিকানরা তাদের ডলার দেশে না রেখে বিদেশে বিনিয়োগ করছে। আমেরিকায় রাখলে তাদের ব্যাঙ্কের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রবল হতে পারে। অতএব বাইরে যদি ডলার বিনিয়োগ করা যায়, তবে লাভও বেশি আর নিয়ন্ত্রণও কম। ইউরো ডলার ছাড়া আছে ইউরো-ইয়েন, ইউরো পাউন্ড বা ইউরো মার্ক। মোদ্দা কথা নানা কারণে নিজের দেশে না রেখে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। ফলে হট মানি বা গরম টাকার যোগান এখন অফুরন্ত বলা যায়।

হঠাৎ এই গরম টাকার উৎপাত ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়েছে। আর দক্ষিণ এশিয়ার বিপর্যয়ের পরে প্রভূত গরম টাকা এখন ভারতে শেয়ার বাজারে এসে গেছে। হঠাৎ তারা শেয়ারের দাম বাড়ায়—হঠাৎ কমায়। কম টাকায় প্রভূত শেয়ার কেনে আবার বেশি দামে বিক্রি করে। অর্থাৎ লাভ করে যাচ্ছে। লাভের টাকা হচ্ছে ভারতের রুপিতে। সে রুপি যখন ডলারে বিনিময় করতে যায়— রুপির অবমূল্যায়ন হয়। বস্তুত গরম টাকার খেলায় এখন ভারতীয় মুদ্রা রুপির অমূল্যায়ন। সবারই চিন্তা, ভারতবর্ষে কি থাইল্যান্ডের ঘটনা আবার ঘটবে? ঘটলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমেরিকার ক্যাপিটালিজমের এক গভীর সংকট

বর্তমানে আমেরিকার ক্যাপিটালিজম এক গভীর সঙ্কটে। প্রায় দুই বছর ধরে আমেরিকাতে 'মন্দা'। আমেরিকার মন্দা এমনই ধরনের যে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী শুধু এই জন্যই মন্দা। কারণ পৃথিবীর বাণিজ্যে আমেরিকার এমনই গুরুত্ব যে বলা হয় আমেরিকায় হ্যাচ্চো হলে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী নিউমোনিয়া হবে। আমেরিকাই পৃথিবীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই আমেরিকার মন্দা মানে পৃথিবীব্যাপী বেকারি।

কিছুদিন যাবৎ আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা নানান অঙ্ক কষে প্রমাণ করছে যে আমেরিকার মন্দা ২০০২ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। জুলাই মাসে এই মন্দা যেই শেষ হবে পৃথিবীব্যাপী আবার ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়বে। তার ফলে বিশ্বব্যাপী বেকারত্ব দূর হবে। মাথাপিছু আয় বাড়বে ও পৃথিবীব্যাপী আমদানি ও রপ্তানি বিপুল বেগে বাড়বে।

যা ভাবা যায় তা অবশ্য হয় না। আমেরিকার সব অর্থনীতিবিদদের সব অঙ্ক কষাই বিফল। আমেরিকাতে জুলাই ২০০২ সালে মন্দা দূর হবার বদলে নতুন ধরনের মন্দা দেখা যাচ্ছে। আর এই মন্দা আরও সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম হুহু করে কমছে। চতুর্দিকে কোম্পানিগুলি দেউলিয়া ঘোষণা করছে। আমেরিকাতে এখন আর 'মন্দা' নয় নতুন করে আসছে এক ক্র্যাস। আগে ছিল রিসেসন এখন যেটি আসছে তার নাম ডিপ্রেশন। আব এই ডিপ্রেশন বড্ড ছোঁয়াচে। একবার আমেরিকায় আরম্ভ হলে পৃথিবীব্যাপী সেটা ছড়িয়ে পড়বে।

এখানেই সমস্যা। মন্দা যদি দক্ষিণ কোরিয়াতে হয় তবে চট করে অন্য দেশগুলি তাতে খুব একটা বিপদে পড়বে না। বস্তুত দক্ষিণ কোরিয়ায় চার বছর আগে যে মন্দা হয়েছিল তাতে পৃথিবীর অর্থনীতি ওলট-পালট হয়ে যায়নি। বর্তমানে আর্জেন্টিনাতে মন্দা। কিন্তু তাতে পৃথিবীর অন্য সব দেশই

আতঙ্কিত তা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু আমেরিকা দেশটি অন্যরকম। যদি আমেরিকায় মন্দা ক্রমশ বাড়ে, রিসেসন যদি ডিপ্রেশন হয় তবে পৃথিবীব্যাপী তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। আর এই জুলাই মাসেই দেখা যাচ্ছে আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলি একটার পর একটা বন্ধ। এনরন, জেরক্স, টাইকন, গ্লোবাল ক্রশিং আর বর্তমানে ওয়ার্ল্ড কম বন্ধ। একটার পর একটা বৃহৎ কোম্পানি দেউলিয়া।

সমস্ত বৃহৎ কোম্পানিগুলি একই ধরনের সমস্যায় ভুগছে। আর সমস্যাটা বাজারের ক্রেতা থেকে আসছে না। সরকারি নীতি থেকে আসছে না, বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা থেকে আসছে না, আসছে নিজেদের দুর্নীতির জন্য। কর্পোরেশন হাউসগুলি কি ধরনের দুর্নীতি করছে তা সংক্ষেপে বলা যাক।

আমেরিকা অন্যতম বৃহত্তম কর্পোরেশন ওয়ার্ল্ডকম। তারা কিছু অডিটর ভাড়া করে নিজেদের লাভ লোকসান জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাইল। অডিটররা তাদেরই ভাড়া করা লোক। তারা অডিট করে হিসাবের গরমিল করে দেখাতে চাইল ওয়ার্ল্ড কম বিরাট মুনাফা করছে। ওয়ার্ল্ড কম বিরাট মুনাফা করছে তা সর্বত্রই প্রকাশিত হল। যারা শেয়ার কেনে তারা সবাই ওয়ার্ল্ড কম শেয়ার কেনার জন্য বিশাল বিনিয়োগ করল। ওয়ার্ল্ড কমের শেয়ারের দাম বাজারে হুহু করে বাড়ে। কোম্পানির অ্যাসেট ফেঁপে ফুলে ওঠে।

হঠাৎ জানা গেল যে, ওয়ার্ল্ড কম মোটেই মুনাফাতে চলছে না। এই মুনাফা অডিটরদের মনগড়া। যেই মুনাফা কৃত্রিম বলে প্রকাশিত হল সবাই বিশেষত শেয়ার হোল্ডাররা তাদের ওয়ার্ল্ড কমের শেয়ার বাজারে বিক্রি করে দিতে চাইল। ফলে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম হুহু করে কমে গেল। কোম্পানি যে সম্পূর্ণ অসুস্থ তা আর লুকনো গেল না। কোম্পানির ক্যাপিটাল ধরে টানাটানি—অবশ্য দু'সপ্তাহ আগে ওয়ার্ল্ড কম নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করল।

শুধু ওয়ার্ল্ড কম নয়, কৃত্রিম উপায়ে অডিটররা যে বিশাল লাভ দেখিয়ে শেয়ার হোল্ডারদের ঠকিয়েছে তা অন্য কর্পোরেট হাউসে স্পষ্ট হয়ে গেল। জেরক্স, এনরন, টাইকন ইত্যাদি বিশাল বিশাল কোম্পানিগুলি হয় আপাতত বন্ধ কিংবা দেউলিয়া।

একটা কোম্পানির তথাকথিত অডিটররা মিথ্যা লাভ দেখিয়ে শেয়ার হোল্ডারদের ঠকিয়েছে সুতরাং অন্য কোম্পানিগুলি তাই করছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শেয়ার হোল্ডাররা অন্য কোম্পানির শেয়ার বেচে দিতে আরম্ভ করল। সর্বত্র শেয়ার বাজার নিম্নমুখী। একটার পর একটা কোম্পানি বন্ধ। শেয়ার বাজারের সমস্যা আর শুধু আমেরিকায় সীমাবদ্ধ থাকল না। ইউরোপেও নাভিশ্বাস। ইউরোপে গত সপ্তাহে শেয়ার বাজারের পতন। যুদ্ধের পর এত দ্রুত পতন আর নাকি কখনও হয়নি। যত শেয়ার বাজারে শেয়ারের

দাম কমে তত কোম্পানিগুলির নাভিশ্বাস। নতুন বিনিয়োগ নেই। চতুর্দিকে বেকারি বৃদ্ধি। অডিটররা মিথ্যা করে লাভ দেখাচ্ছে এই দুর্নীতিতে দেখা গেল বুশ প্রশাসনের বিরাট এক অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। বুশ নিজে এর মধ্যে জড়িত। বুশ নিজে কিভাবে জড়িত তা বলা যাক। কোম্পানিটির নাম হারকেন এনার্জি। যথা নিয়মে অডিটররা কোম্পানি যে লাভজনক তা ঘোষণা করল।

বুশ (বর্তমান প্রেসিডেন্ট) এই কোম্পানির ২,১২,০০০ শেয়ার কিনলেন। কিন্তু বুশের 'ভিতরের খবর' জানা আছে। আমরা আমাদের ভাষায় বলি ইনসাইড নলেজ। বুশ জানে কোম্পানিটি লাভে চলছে না। কিন্তু অন্য লোকরা কিছু করার আগেই বুশ শেয়ারগুলি একই সঙ্গে বেচে দিল। লাভ করল ৮,৪৮,০০০ ডলার। সত্যি সত্যি এই কোম্পানি লোকসানে চলছিল। অন্য লোকরা জানে না। বুশ ভিতরের খবর জেনে লাভ করল। আর বাকি শেয়ার হোল্ডার যারা জানত না তাদের হল ক্ষতি। বুশের বিরুদ্ধে একটি মামলাও হল। কিন্তু যা হয় এখানেও তাই হল। বুশের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারল না।

বলা হচ্ছে মিথ্যা লোভ দেখানো আমেরিকার এক বিরাট ব্যাধি। আর বুশ তাঁর প্রশাসনে এমন সব লোকদের নিয়েছেন যারা এই বৃহৎ কোম্পানির অংশ বিশেষ: আমেরিকার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, হ্যালিবারটন বলে এক তেলের সঙ্গে যুক্ত বৃহৎ কর্পোরেশনের মালিক। ট্রেজারি সেক্রেটারি পল ও নিল এলকোয়া বলে এক বৃহৎ অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির মালিক। ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফিলড জেনারেল ইনস্ট্রুমেন্ট বলে কোম্পানির কর্ণধার। ডন ইভান্স বর্তমান কমার্স সেক্রেটারি টম ব্রাউন বলে এক তেল ও গ্যাস কোম্পানির ডিরেক্টর। অর্থাৎ বুশ প্রশাসনের মাথায় যাঁরা আছেন তাঁরা বৃহৎ কর্পোরেশনের লোক এবং ছলে-বলে-কৌশলে এই কোম্পানিগুলিকে কৃত্রিমভাবে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করছেন। সুতরাং অডিটররা যখন মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে শেয়ার বাজার আপাত চাঙ্গা করছে তারা বিশেষ কিছু করছে না বা করতে দিচ্ছে না।

বুশ প্রশাসনের চিফ অফ স্টাফ হচ্ছে এন্ড্রু কার্ড। তাঁর আগেকার প্রফেসন ছিল মোটরগাড়ি শিল্পকে কিভাবে সরকারি সুবিধা দেওয়া যায় তার দেখাশোনা করা। মিঃ পিট যাঁর দায়িত্ব হচ্ছে শেয়ার বাজারে দুর্নীতি রোধ করা তিনি অডিটরদের তরফ থেকে বুশ প্রশাসনে অ্যাকাউন্টেন্সিতে দেখাশোনা করেন। তিনি অডিটরদের লোক। অর্থাৎ বুশকে ঘিরে আছে বৃহৎ কর্পোরেট সেক্টরের লোক।

আজ পর্যন্ত আমেরিকার যত প্রেসিডেন্ট এসেছেন তাঁদের কাছাকাছি কর্পোরেশন সেক্টরের এত লোকজন আসতে পারেনি। শেয়ার বাজারে

কৃত্রিমভাবে এতদিন শেয়ারের দাম বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। ক্ষতিতে চলছে সেইসব কোম্পানিগুলো জোর করে লাভে চলছে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে পৃথিবীর এবং আমেরিকার সব লোককে চিরকালের জন্য হোতা বানানো যায় না। এখন রটে গেছে সমস্ত শেয়ার বাজারে ওঠানামা কৃত্রিম-অর্থনীতির 'আসল এবং মৌলিক' সমস্যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

শেয়ার বাজারে দ্রুত পতন ঘটে যাচ্ছে। আমেরিকার শেয়ার বাজারের পতনের সঙ্গে ইউরোপের বাজারের পতন হচ্ছে। যে আমেরিকার ডলার পৃথিবীব্যাপী বিশ্বস্ত মুদ্রা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল তারও পতন চোখের সামনে ঘটছে। লোকেরা এখন ডলার ছেড়ে জাপানি ইয়েন অথবা ইউরোপের ইউরোতে চলে যাচ্ছে। মোট কথা আমেরিকার ক্যাপিটালিজমের বিপর্যয়।

যা আমেরিকায় ঘটবে ভারতেও তাই হবে। এর অপর নাম বিশ্বায়ন। মুম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেট নিম্নমুখী। ভারতের রপ্তানি কমছে। ভারতেও মন্দা। এই বিশ্বব্যাপী মন্দায় দেশের অবস্থা আরও খারাপ হবার সম্ভাবনা।

আমেরিকা এই অবস্থায় আবার মুক্ত বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে প্রোটেকশনের দিকে ঝুঁকছে। কৃষি দ্রব্যে ভর্তুকি ক্রমশ বাড়ছে। লৌহ শিল্প ও বস্ত্র শিল্পে প্রটেকশন দিচ্ছে। ফলে ইউরোপও দিচ্ছে। অর্থাৎ মন্দার বাজারে বিশ্বায়নের অন্যরূপ আমরা দেখছি। ভারতবর্ষ যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পরিবর্তন না করে তবে মন্দা আরও তীব্র হতে বাধ্য। হয়তো শিক্ষা নেবার সময় এসেছে।

ইরাকের যুদ্ধ মানে ডলার আর ইউরোর যুদ্ধ

আমেরিকা ও ব্রিটেন হঠাৎ কেন ইরাক আক্রমণ করেছিল তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। আমেরিকা অবশ্য কারণ দেখিয়েছিল যে ইরাকে ধ্বংস করার মারণাস্ত্র বা WMD (Weapon & Mass destruction) আছে তার জন্য এই আক্রমণ। যুদ্ধের আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের ইন্সপেক্টররা ইরাকে কোনো আণবিক, কেমিক্যাল বা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র খুঁজে পায়নি। পাছে রাষ্ট্রপুঞ্জ কোনো রিপোর্ট দেয় যে ইরাকের মারণাস্ত্র নেই তাই আগেভাগে রাষ্ট্রপুঞ্জকে পাশ কাটিয়ে ইরাক আক্রমণ হল। রাষ্ট্রপুঞ্জকে আমেরিকা ও ব্রিটেন কোনো তোয়াক্কাই করল না। ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হিটলার ও মুসোলিনি দুই ডিক্টেটর যা করেছিল প্রায় ৭৫ বছর বাদে আমেরিকা তাই করল, সঙ্গে দোসর ব্রিটেনের ব্লেয়ার।

এখন আমেরিকায় ও ব্রিটেনে খুব শোরগোল যে আমেরিকা-ব্রিটেন কোথাও মারণাস্ত্র খুঁজে পায়নি—সবটাই মিথ্যে কথা ও বানানো। এখন আমেরিকার পত্রপত্রিকাগুলি বুশকে 'যুদ্ধবাজ মিথ্যেবাদী' বলছে। আর ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ারের অবস্থা আরও খারাপ। তাঁকেও বলা হচ্ছে 'জোচ্চুরি করে রিপোর্ট তৈরি করে মিথ্যা কারণে ইরাক আক্রমণ হয়েছে।' ব্লেয়ার শুধু মিথ্যাবাদী নন, আমেরিকার পোষা কুকুর ছানা—অবশ্য ইংরেজিতে বলা হচ্ছে Puppy কথাটি খুবই খারাপ। ব্যবহারের যোগ্য নয় তবে ব্লেয়ারকে তাই বলা হচ্ছে। ব্লেয়ারের গদি টলায়মান। ক্যাবিনেট থেকে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করছেন। তবে আমেরিকা ও ব্রিটেন অবশ্য বলে যাচ্ছে 'আজ না পাওয়া গেলেও কাল ঠিক পাওয়া যাবে'। অর্থাৎ সময় কাটাবাব ছল এবং তার জন্য আবার মিথ্যে কথা।

ইরাকে মারণাস্ত্র আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। তবে কি কারণে ইরাক আক্রমণ হল? তার অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য তেল বা পেট্রোল। সব তথ্যই বলছে

যে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল রিজার্ভ বা পেট্রোল ভাণ্ডার বর্তমানে ইরাকে। কেউ কেউ আবার বলছে দ্বিতীয় নয়, ইরাকেই সবচেয়ে বেশি তেল ভাণ্ডার আছে। ইরাকের তেল পৃথিবীর প্রথম না দ্বিতীয় তর্ক করে লাভ নেই। তবে বলা যায়, এই তেল ভাণ্ডার আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আমেরিকা তেলের জন্য এতদিন সৌদি আরবের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সৌদি আরবের তেল ফুরিয়ে আসছে। আর এর থেকে বড় কথা সৌদি আরবকে আমেরিকা খুব বিশ্বাস করছে না কারণ সব টেরোরিস্টদের আশ্রয়স্থল সৌদি আরব। সৌদি আরব ঠিক কি পথে যাবে আমেরিকা বুঝছে না। সৌদি আরবের উপর এখনও আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ আছে।

এই তেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমেরিকার ডলারের। এতদিন পর্যন্ত সব কিছু পাওনা হত আমেরিকার ডলারে। হঠাৎ কিছু আরব দেশ আমেরিকার ডলারে আর ব্যবসা করতে চাচ্ছে না, তারা অন্য একটি কারেন্সিতে ব্যবসা করছে বা করতে যাচ্ছে তার নাম 'ইউরো'। 'ইউরো' আমেরিকার কারেন্সি নয়—সংযুক্ত ইউরোপের। অবশ্য ব্রিটেন এর থেকে বাদ।

যদি দেশগুলি আমেরিকার ডলারে ব্যবসা ও বাণিজ্য না করে এবং ডলারের বদলে ইউরো ব্যবহার করে তবে আমেরিকার আধিপত্য পৃথিবীতে খর্ব হতে বাধ্য। আমেরিকার আধিপত্যর মূল কারণ পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে ডলারই একমাত্র বিশ্বমুদ্রা হল।

পৃথিবীতে বিশ্বমুদ্রা ডলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। এর মানে বোঝা দরকার। ভারত যদি জাপান থেকে আমদানি করে তবে জাপানিদের আমাদের অর্থ দিতে হবে। ভারতের মুদ্রা রুপি, কিন্তু জাপানিরা রুপিতে রপ্তানি করবে না বা নেবেও না। আমাদের যদি জাপানকে পাওনা দিতে হয় তবে আমাদের তা আমেরিকান ডলারেই দিতে হবে। আবার উল্টোটাও সত্য। জাপান ভারত থেকে আমদানি করল। ভারতীয়দের জাপান অর্থ দেবে ইয়েনে বা জাপানি মুদ্রায় নয় বা ভারতীয় মুদ্রায় নয়—দিতে হবে আমেরিকান ডলারে। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমাদের যদি আমদানি বা রপ্তানি করতে হয় তা হবে একমাত্র গ্রাহ্য মুদ্রায় তার নাম আমেরিকান ডলার। আর এই ডলার যোগাড় করলে পরে বাণিজ্য হবে নচেৎ বন্ধ। অর্থাৎ ডলার ছাড়া বিশ্ববাণিজ্য বন্ধ।

আমাদের বা ভারতকে যদি বিশ্ব থেকে কোনো ঋণ নিতে হয় তবে তা হবে ডলারে। আর যদি ঋণ শোধ করতে হয় তবে তাও করতে হবে ডলারে। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী একটাই বিশ্বমুদ্রা ছিল তার নাম আমেরিকান ডলার। কিন্তু গত পাঁচ বছর হল আরও একটি বিশ্বমুদ্রা পৃথিবীতে চালু হল তার নাম 'ইউরো'। 'ইউরো' ইউরোপের মুদ্রা। ইউরোপের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বর্তমানে ১৫টি দেশ আছে। তাদের মধ্যে ১২টি 'ইউরো'-কে গ্রহণ করেছে।

গ্রহণ করার মানে জার্মানি তার মুদ্রা মার্ক উঠিয়ে 'ইউরো'-কে মুদ্রা হিসেবে নিয়েছে। ফ্রান্স তার মুদ্রা 'ফ্রাঁ'-কে উঠিয়ে 'ইউরো' গ্রহণ করেছে। ১৫টি ইউরোপিয়ান দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ এই 'ইউরো' আপাতত গ্রহণ করেনি—আর সেই দেশগুলি হল ব্রিটেন, সুইডেন আর ডেনমার্ক। 'ইউরো' শুধু যে ইউরোপিয়ান মুদ্রা তা নয়—গত পাঁচ বছর থেকে 'ইউরো' বিশ্বমুদ্রা। অর্থাৎ ডলারের বিকল্প আরও একটি মুদ্রা চালু হল তার নাম 'ইউরো'।

'ইউরো' যদি বিশ্বমুদ্রা হয়, তবে আমেরিকার আধিপত্য কিছুটা খর্ব হতে বাধ্য। সামান্য হলেও কারণগুলি বোঝা যাক।

এতদিন পর্যন্ত ডলার একমাত্র বিশ্বমুদ্রা হওয়ার ফলে আমেরিকা অনেক সুবিধা ভোগ করেছে। আবার এও মনে রাখা দরকার যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডলারের সঙ্গে স্বর্ণ বা সোনাও বিশ্বমুদ্রা এককালে ছিল। ১৯৭৮ সালে আইন করে স্বর্ণকে বিশ্বমুদ্রা থেকে অপসারণ করা হয়। তারপর থেকে ডলারই একমাত্র বিশ্বমুদ্রা ছিল অন্তত পাঁচ বছরের আগে পর্যন্ত।

ডলার বিশ্বমুদ্রা হবার ফলে আমেরিকা কি কি সুবিধা ভোগ করে তা জানানো যাক। ধরা যাক আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্যে ঘাটতি—আর ভারতেরও বাণিজ্যে ঘাটতি। আমেরিকার যদি ঘাটতি হয় তবে আমেরিকার খুব একটা বিপদ হবে না। অন্য দেশকে যদি অর্থ দিতে হয়, তবে তাদের ছাপানো ডলার দিলেই হবে। কত ডলার ছাপানো হবে তা নির্ভর করে আমেরিকার ঘাটতি কতটা। কিন্তু ভারতীয়দের তা হবার উপায় নেই। ভারতীয়দের ঘাটতি মেটাবার জন্য ডলার 'যোগাড়' করতে হবে। হয় আগেকার রোজগার করা ডলার দিতে হবে কিংবা 'ঋণ' নিতে হবে। অর্থাৎ বাণিজ্যে ঘাটতি মানে অনেক সময় 'ঋণের বোঝা' অন্তত ভারতবর্ষের। আমেরিকার 'ঋণের বোঝা' কিছুই নেই। কারণ তাদের ঘাটতি মানে দেশে ডলার নোট ছাপানো। অর্থাৎ আমেরিকা (প্রায়) যত ইচ্ছা বাণিজ্যে ঘাটতি করতে পারে। ভারত তা পারে না বা আর্জেন্টিনা পারে না বা ইন্দোনেশিয়া পারে না। পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশই আছে যার ঘাটতি মানে ঋণের বোঝা নয়—আর তার নাম আমেরিকা। বলা দরকার, পৃথিবীতে বাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি বর্তমানে আমেরিকার। তাতে আমেরিকার অর্থনীতিতে কোনো প্রভাব বিশেষ নেই। অন্তত বাইরের থেকে 'ঋণ' নিতে হয় না।

আবার ধরা যাক ভারত খুব রপ্তানি করেছে। মানে বিশ্ববাজারে ডলার পেয়েছে। তবে ভারতের অর্জিত ডলার ভারতে থাকবে না কোথায় যাবে? ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য। আমরা ডলার আয় করেছি মানে আমাদের বিদেশী মুদ্রা 'সঞ্চয়' করতে হবে। 'সঞ্চয়' মানে কি? আমাদের অর্জিত ডলার দিয়ে আমেরিকার অ্যাসেট বা নানান সিকিউরিটি কিনতে হবে। অর্থাৎ আমাদের

ডলার চোরাপথে আবার আমেরিকায় ফিরে যাবে। আবার আমরা চাইব আমেরিকা যেন মুদ্রার অবমূল্যায়ন না করে। কারণ ডলার যদি অবমূল্যায়ন হয় তবে আমাদের ডলার সম্পদ কমে যাবে। অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব যেন ডলার অবমূল্যায়ন না হয়। আমাদের অর্জিত ডলার বিশ্বের নানা চোরাপথে আমেরিকায় থাকবে। আমেরিকা আবার হম্বিতম্বিও করতে পারে। আমাদের পাওনা ডলার আমাদের নাও দিতে পারে কারণ ডলার বেশি অন্য দেশে গেলে ডলারের অবমূল্যায়ন হবে। কি আশ্চর্য পদ্ধতি।

এবার তেলের কথায় আসা যাক। তেল বা পেট্রোল মধ্য এশিয়া থেকে পৃথিবীতে যাচ্ছে। আরব শেখরা রয়েলটি পাচ্ছে। কত রয়েলটি পায়? মোটামুটি হিসাব করে বলা যায় প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার। এক ট্রিলিয়ন মানে একের পরে ১৮টি শূন্য। অর্থাৎ বিরাট এক অঙ্ক শেখরা ডলার পায়। তবে আমেরিকার তাতে ক্ষতি হচ্ছে কি? হচ্ছে না। কারণ এই পুরো ডলারটা শেখরা আমেরিকান ব্যাঙ্কে রাখে। বা আমেরিকার সরকারি সিকিউরিটিতে রাখে। অর্থাৎ তেল বিক্রির পুরো টাকাটাই (প্রায়) আমেরিকায় আবার ফিরে আসে। আমরা একে বলি 'পেট্রো ডলার'। অর্থাৎ ডলার আমেরিকান কোম্পানি শেখদের দিলেও আবার আমেরিকায় ফিরে আসে।

আর এইখানে সাদ্দামের যত বিপদ। ২০০০ সালে দেখা গেল 'ইউরো'-তে অর্থ রাখলে সুবিধা বেশি। ইরাকের সাদ্দাম Food for oil-এর পুরো টাকাটাই 'ইউরো'-তে রাখল। আবার ইরাকের গচ্ছিত ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে তুলে 'ইউরো'-তে রাখল। সাদ্দামের দেখাদেখি ইরানও ডলার থেকে ইউরোতে চলে গেল। কত ডলার ইরান তুলে নিল। কথিত আছে প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলার। সৌদি আরব, উত্তর কোরিয়া, চীন, হংকং প্রভৃতি অনেক দেশই ডলারে মুদ্রা রাখার বদলে 'ইউরো'-তে রাখল। তার কারণ দুটি। প্রথম, 'ইউরো'র দাম ক্রমশ বাড়ছে আর ডলারের দাম কমছে। দ্বিতীয়, শেয়ার বাজার আমেরিকায় যতখানি 'Bust' ইউরোপে ঠিক ততটা হয়নি। এখন সাদ্দামের দেখাদেখি বহু দেশ ডলারের বদলে ইউরো চাইল। বলা হচ্ছে যারা তেল উৎপাদন করে তারা অনেকেই ডলার ছেড়ে 'ইউরো'তে গেল।

এই ভয়টাই আমেরিকা করছিল। যদি বিশ্ববাণিজ্যে সবাই ইউরো চায় আর ইউরোতে বাণিজ্য করে তবে আমেরিকার ডলারের গুরুত্ব কমে যাবে। ডলারের গুরুত্ব কমা মানে আমেরিকা আর যত ইচ্ছা তত ঘাটতি করতে পারবে না। আর 'পেট্রো ডলার' বলে কোনো বস্তু থাকবে না। অর্থাৎ ফ্রান্স আর জার্মানি চায় ইউরো শক্ত হোক আর আমেরিকা চায় না। ফলে ফ্রান্স ও জার্মানিতে আমেরিকার ইরাক আক্রমণ নিয়ে সমালোচনার ঝড় কিন্তু ব্রিটেন করছে না। ব্রিটেনে 'ইউরো' এখনও মুদ্রা নয়।

অর্থাৎ সাদ্দাম যেভাবে 'ইউরো'-কে বিশ্বমুদ্রা করতে চেয়েছিল আমেরিকা তাতে দেখেছিল বিপদ। বুশ এখন ইরাকের তেল দখল করেছে। তেলের আমদানি-রপ্তানি আর 'ইউরো'-তে হবে না। ডলারেই করতে হবে। আর ইরানকে ধমক যদি তারা ডলারের বদলে 'ইউরো' দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। ইরান খবরদার।

আমেরিকার ডলারের কাছে 'ইউরো' বড্ড এক চ্যালেঞ্জ। আমেরিকার আধিপত্যের মূলে আছে যে ডলার এতদিন পর্যন্ত শুধু একমাত্র বিশ্বমুদ্রা ছিল। 'ইউরো' উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। অতএব ইরাক আক্রমণ করে আমেরিকা শুধু সাদ্দামকেই হটালো না, ইউরোপ বিশেষত ফ্রান্স ও জার্মানিকে 'টাইট' করে ছেড়ে দিল। বাকিটা কি হবে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মানবাধিকার ও গুয়ানতানামো বে

পৃথিবীতে পাশ্চাত্য দেশগুলি সব সময় অনুন্নত দেশগুলিকে মানবাধিকার নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেয়, উপদেশ দেয়, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে, অথচ নিজেদের দেশে মানবাধিকার যে প্রতিনিয়তই লঙ্ঘিত হচ্ছে তা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না। আমেরিকা বর্তমানে সুপার পাওয়ার। অতএব আমেরিকার অধিকার আছে 'যা ইচ্ছা তা ইচ্ছা' করার এবং তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র সমালোচনা করলেই তার কপালে অশেষ দুঃখ। আমেরিকায় একটার পর একটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে--বর্তমানে সবচেয়ে জঘন্যতম লঙ্ঘন আফগানিস্তান থেকে বন্দীদের নিয়ে। বলা হয় 'গুয়ানতানামো বে'র স্ক্যান্ডাল। 'গুয়ানতানামো বে' (Guantanamo Bay)-র ঘটনা বলার আগে বলা উচিত আমেরিকা কিভাবে বিশ্বের জনমত উপেক্ষা করার সাহস দেখায়। একটার পর একটা ঘটনার উল্লেখ করে দেখানো যায় যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন বোধহয় 'গণতন্ত্রের' প্রধান পুরোহিতই করছে।

ধরা যাক ১৯৮৮ সালের ৩রা জুলাই-এর ঘটনা। আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ ভিনসেনে কিছু মিসাইল ছিল। হঠাৎ আমেরিকার যুদ্ধজাহাজের নাবিকদের মজা করার ইচ্ছা হল। আকাশে মিসাইল ছুড়ে একটি ইরানি এরোপ্লেনকে গুলি করে নামাল। ২৯০ জন যাত্রী ওই প্লেনে ছিল। সব ইরানিরাই মারা গেল। প্রথম জর্জ বুশ বা বর্তমানে প্রেসিডেন্টের বাবা তখন আমেরিকার প্রেসিডেনটিয়াল ক্যান্ডিডেট! তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন 'আমি আমেরিকার হয়ে কখনই ক্ষমা প্রার্থনা করব না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কারুর কাছে ক্ষমা চায় না। আর কি ঘটনা ঘটেছে তা সম্বন্ধে জানার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই- 'I don't care what the facts are'।

অর্থাৎ আমেরিকা যা বলবে সেটাই সত্য বা ঘটনা। আর অন্য লোক ঘটনা বললেও সেটা ঘটনা নয়—যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা তাকে স্বীকার করে।

অর্থাৎ সত্য হচ্ছে আমেরিকা যা মনে করে।

ইরাকে ঠিক কি কারণে যুদ্ধ হল তা জানা যায় না। ইরাকের 'মারণাস্ত্র' বা Weapon of mass Destruction আছে অতএব ইরাককে আক্রমণ করা হল। যদি WMD না থাকে? তবুও আমেরিকার ইরাককে আক্রমণ করার অধিকার আছে—কারণ আমেরিকা 'ভেবেছে' যে ইরাকের WMD আছে। আমেরিকা 'ভাবলেই' যথেষ্ট—অন্য কোনো প্রমাণের দরকার হয় না।

অথবা ইরাকের সাদ্দামকে সরানো দরকার। কারণ সাদ্দাম ডিকটেটর। 'গণতন্ত্র' মানে না। তাই আক্রমণ করা হল অথচ ইজিপ্টে, সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় অজস্র ডিকটেটর আছে। তারা যেহেতু আমেরিকার 'বশংবদ' অতএব তারা গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। কারণ এটাই আমেরিকা মনে করে। আমেরিকার সংজ্ঞা অনুযায়ী পৃথিবী চলবে। অন্য লোকেরা কি বলে বা ভাবে আমেবিকা তাকে 'পরোয়া' করে না। আমেরিকা এই থিওরি অনুযায়ী বর্তমানে U.N O. বা রাষ্ট্রপুঞ্জকেও কেয়ার করে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের চাঁদা গরিব দেশগুলি ঠিক সময়ে দেয়—কিন্তু আমেরিকা দেয় না। বহুদিন ধরেই আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জকে অবজ্ঞা করেই চলছে। কিছুদিন আগে যখন রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশ ছাড়াই ইরাক আক্রমণ করা হল তখন আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল জন এসক্রফট। (John Ashcroft) দার্শনিকভাবে বললেন, আমেরিকা যা বলে এবং করে তাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশের দরকার নেই কারণ আমেরিকার নীতি—'not the grant of any government or governments or document or documents but our endowment from God' অর্থাৎ আমেরিকা যা করে তাতে স্বয়ং ভগবান সমর্থন করে। আমেরিকার নীতি ঈশ্বর ঠিক করে দিয়েছে অতএব ভয় কিসের। স্বয়ং ভগবান আমেরিকার নীতি যদি ঠিক করে দেন তবে অন্য লোকদের বলার কিছু নেই। আগেও নীতি সব ভগবানই ঠিক করে দিতেন। অতএব ইরাক আক্রমণের আগে কোনো কারণ ছাড়াই, কিউবা, নিকারাগুয়া, লিবিয়া বা পানামা আক্রমণ ভগবানের নির্দেশেই হয়েছিল।

আবার বলা হয় পৃথিবীতে যতগুলি দুঁদে ডিকটেটর আছে সবই প্রায় আমেরিকার সৃষ্টি। ওসামা বিন লাদেন বা মুশারফ বা পাকিস্তানের মিলিটারি ডিকটেটররা সবই আমেরিকার সৃষ্টি। নিজের স্বার্থের জন্য পৃথিবীব্যাপী এইসব ডিকটেটরদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর আমেরিকার ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুশারফ-মুবারক পাকিস্তান বা ইজিপ্টে গণতন্ত্র তৈরি করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রয়োজনেই ডিকটেটর সৃষ্টি। এই ব্যাখ্যাই আমেরিকার (অধিকাংশ) কাগজগুলি দিচ্ছে। আর আমেরিকার পত্রপত্রিকাদের অফিসিয়াল নাম দেওয়া হয়েছে Embeded Journalist অর্থাৎ আমেরিকার সরকার যেভাবে বলবে এবং দেখবে আমেরিকার পত্রপত্রিকাকেও সেইভাবে লিখতে হবে। আর এর নাম

'স্বাধীনতা'! অন্তত আমেরিকান স্বাধীনতা।

আফগানিস্তান থেকে বন্দী করা লোকজন আমেরিকা নিয়ে এসে রাখল গুয়ানতানামো (Guantanamo) বলে একটি দ্বীপে। হঠাৎ এই দ্বীপে রাখা হল কেন? কারণ এই দ্বীপটি সিজে আমেরিকান সরকার গ্রহণ করেছে—ঠিক আমেরিকার অংশ নয়। আর যেহেতু আমেরিকার অংশ নয়, অতএব আমেরিকার 'মানবাধিকার' সংক্রান্ত, আইনি মোকদ্দমা সংক্রান্ত উকিল দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

বিদেশী বন্দীদের অনেকসময় বলা হয় যুদ্ধবন্দী। যেহেতু আফগানিস্তানের যুদ্ধটা 'গৃহযুদ্ধ' অতএব তারা যুদ্ধবন্দী নয়। অর্থাৎ জেনিভা কনভেনশন সংক্রান্ত আইনি অধিকার এদের উপর প্রযোজ্য নয়। আমেরিকা কোনো বিশ্বসংস্থাকে এই দ্বীপে যেতে অনুমতি দেয়নি। রেড ক্রশ পৃথিবীর সর্বত্রই যেতে পারে ব্যতিক্রম এই গুয়ানতানামো।

আফগানিস্তান থেকে কত বন্দী ধরা হয়েছিল। কোনো হিসাব নেই। কেউ বলে ৬০০ আবার কেউ বলে ৬০০০ আর এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী আছে। বলা হয় ২২ থেকে ৩০টি দেশের নাগরিকরা এই বন্দিশালায় বন্দী। আফগান আছে, পাকিস্তানি আছে, অস্ট্রেলিয়ান আছে, ব্রিটিশ আছে আর ছিল একজন মাত্র আমেরিকান।

এই একজন আমেরিকান V.I.P ব্যবহার পেল। অর্থাৎ যেই জানা গেল একজন আমেরিকান বন্দিশালায় আছে তাকে তার বাড়িতে আনা হল। আর আমেরিকার ক্রিমিনাল আইন অনুযায়ী সাধারণ কোর্টে তার বিচার হল। তার জন্য আমেরিকার উকিলও ছিল। তার সাজা হল তবে নামমাত্র এবং কিছুটা লোক দেখানো। লোক দেখানো এই জন্য যে আমেরিকানকে আমেরিকান আইন অনুযায়ী বিচার করা হচ্ছে। আমেরিকার পাবলিক শান্ত থাকল।

আর বাকি বন্দীরা? তাদের জন্য বরাদ্দ একটি করে খাঁচা। প্রত্যেক খাঁচায় এক একটি বন্দী। এই রকম ৬০০ থেকে ৬০০০ খাঁচা। কেউ কারুর সঙ্গে ২৪ মাস কথাও বলেনি; আর মাঝে মাঝে খাঁচা থেকে ছাড়া হয় তবে চলে থার্ড ডিগ্রি।

ইলেকট্রিক শক আজকাল পুরনো হয়ে গিয়েছে। শোনা যায় মারাত্মক সব অত্যাচারের যন্ত্র। দিনের পর দিন ঘুমোতে না দেওয়া 'গণতন্ত্রী' রক্ষীদের দাওয়াই। এইসব খাঁচার ইতিহাস জানা যেত না। জানা গেল এইবার যখন মুশারফ বুশের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিডে গিয়ে দেখা করেন। মুশারফের অনুরোধে দুই ডজনের কিছু পাকিস্তানিকে ছাড়া হল। তারাই অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা দেয়। সেটা অবশ্য পাকিস্তান সরকার পুরোটা ছাপেনি—ধরা যাক যা বলেছে তা Tip of Iceberg।

হঠাৎ ব্রিটেনে নানান আন্দোলন। ব্রিটিশ নাগরিককে আমেরিকার সরকার

বিনা বিচারে কোন্ আইনে বছরের পর বছর আটকিয়ে রাখে? ব্রিটিশরা তাদের নাগরিকদের ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী বিচার চায়। জানা গেল অন্তত দু'জন ব্রিটিশ বন্দী গুয়ানতানামোতে আছে। একজনের নাম মোয়াজ্জাম বেগ, বয়স ৩৬ আর অন্যজন ফিরোজ আব্বাসী বয়স ২১ আর দু'জনার বাবাদের এককথা—আমাদের ছেলেরা জীবনে কোনোদিনই কোনো টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত নয়। বেগের বাবা বললেন, আফগানিস্তানে স্কুলে চাকরি পেয়ে তার ছেলে সেখানে গেছিল। অর্থাৎ এই দুইজনকে নিয়ে ভদ্রভাষায় বলতে গেলে Diplomatic Row—আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের। আমেরিকা অবশ্য বলছে, 'সামরিক আইনে' এইসব বন্দীদের বিচার হবে। 'সামরিক আইন' ঠিক যে কি তা কেউ ভালো করে জানে না। বলা হচ্ছে, এর মানে বাইরে থেকে কোনো উকিল নিয়োগ করা যাবে না। যার বিচার হবে সামরিক আদালতে তার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষই সামরিক 'উকিল' দেবেন। আর এই 'উকিল' বাছার ক্ষমতা বন্দীদের নেই। আর এই বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না। যদি বন্দী উকিল চায়? তবে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের 'উকিল' দেবে। তবে কোনো 'খবরাখবর' দোষী ব্যক্তি এই উকিলকে দিতে পারবে না। অর্থাৎ বিচার হবে 'Flexible' পদ্ধতিতে।

এই 'Flexible' পদ্ধতি নিয়ে এখন মানব অধিকার নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তারা সোচ্চার। তারা বলছে এই ধরনের 'বিচার' গণতন্ত্রের বিরোধী—মানব অধিকারের বিরুদ্ধে।

তবে আমেরিকা খুব একটা চিন্তিত নয়। নির্দোষ প্রমাণ হলেও আমেরিকার বন্দিশালায় যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে আবার পুনঃ গ্রেপ্তার করা যাবে। আবার ছাড়া পেলে আবার গ্রেপ্তার করা হবে। আবার ছাড়া পেলে আবার গ্রেপ্তার।

বিভিন্ন জায়গায় নানান বিরোধিতা সত্ত্বেও আমেরিকা এই 'কিম্ভুত' পদ্ধতিতে বন্দীদের বিচার করবে। এখনও করেনি। করবে। তবে মোটামুটি প্রায় ২৪ মাস পার হয়ে গেল। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য মানবাধিকার খর্ব করার ক্ষমতা আমেরিকাকে স্বয়ং ভগবানই দিয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে আপাতত কোনো ফল হয়নি।

এক ইউরোপ ও এক মুদ্রার প্রতিষ্ঠায় নতুন পরিকল্পনা—ইউরোর পদক্ষেপ

এই বছরের ২রা মে এক বিশেষ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনই ঠিক হল যে, সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইউরোপের অন্তত ১১টি দেশ তারা রাজনৈতিক ঐক্য ও ইউরোপিয়ান ফেডারেল প্রথার দিকে অগ্রসর হবার জন্য 'একটি মুদ্রার' প্রচলন করবে। ১১টি দেশের যে বিভিন্ন মুদ্রা আছে তার শেষ। এখন সমগ্র ইউরোপে একটি মুদ্রার প্রচলন করা হবে আর একটি মাত্র সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠা হবে। মুদ্রার নামকরণ নিয়ে নানান মতভেদ ছিল তবে ঠিক হয়েছে মুদ্রার নাম হবে 'ইউরো' আর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নামকরণ হয়েছে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা ECB। সমস্ত মতভেদ যে দূর হয়েছে তা সত্যি নয়, কারণ ইউরোপের কিছু দেশ বিশেষত ব্রিটেন এই ইউরো কারেন্সির বাইরে থাকবে। অর্থাৎ বর্তমানে ব্রিটেন এই ফেডারেল পদ্ধতিতে যোগ দিচ্ছে না। যদি সত্যি সত্যি ইউরোপে এক যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় আর সত্যি সত্যি যদি একই মুদ্রার প্রচলন হয় তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক আঞ্চলিকতা ও সার্বভৌমত্ব দূর হয়ে প্রতিষ্ঠা হবে 'এক ইউরোপ'। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন লোকের দ্বারা স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এই 'এক ইউরোপ' শুধু যে মানচিত্রে বিরাট পরিবর্তন আনবে তা নয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কালচার, আর্টস ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই বিরাট পরিবর্তন আনবে। আমাদের বর্তমান 'জানা' ইউরোপ হবে অন্য ধরনের' ইউরোপ। যদি অবশ্যই তা হয়। তবে ইতিহাসের ধারা সেইদিকেই যাচ্ছে যদিও নানান উত্থান-পতন, মনান্তর-মতান্তর, বাদানুবাদ সব সময়েই হচ্ছে। তবে ইতিহাসের ধারার বিরুদ্ধে যাওয়া কিছুটা প্রগলভতা, কিছুটা মূর্খামি। 'এক ইউরোপ' বোধহয় ইতিহাসের ধারা।

একই মুদ্রার প্রচলন কেন হল তা বুঝতে গেলে ইউরোপের অতীতের

সমস্যার দিকে একটু আলোকপাত করা যাক। ১৯৬০ সাল থেকেই আরম্ভ করা যাক। ইউরোপের বুকে তখন দু-দুটো মহাযুদ্ধ শেষ। এই মহাযুদ্ধের উৎপত্তিস্থল সব সময় ইউরোপ। এই দুটো যুদ্ধে কে হারল বা জিতল তা বড় কথা নয়, দেখা গেল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সব কলোনিই প্রায় হাতছাড়া। ফ্রান্স এখন ছোট একটি দেশ। জার্মান দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পর্যুদস্ত। গ্রেট ব্রিটেনে আর 'গ্রেটনেস' বিশেষ নেই—ব্রিটিশ সিংহ বর্তমানে শৃগাল। ইতালিতে সম্পূর্ণ অরাজকতা—গ্রেট রোমান এম্পায়ারের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি সহ সব দেশগুলি ১৯৬০ সালে বোঝা গেল তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র দাঁড়াল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া। তাদের এক একটি দেশের লোকসংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন-এর বেশি। আর দুই বৃহৎ শক্তির মাঝখানে একদা প্রবল একদা পৃথিবী ছড়ি-ঘুরানো কর্তা ইউরোপের দেশগুলির না আছে অর্থের জোর, না আছে মিলিটারির জোর, না আছে শিল্পের ভবিষ্যৎ। আমেরিকা ন্যাটো (NATO)-র সাহায্য ছাড়া ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশই দুর্বল। আমেরিকা বাঁচালে বাঁচবে না হলে মৃত্যু। অর্থাৎ অন্তত ইউরোপের কিছু দেশ আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্র। আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া ইউরোপের একটি দেশও শিল্পের পূর্বতন কাঠামোও বজায় রাখতে পারবে না। অর্থাৎ ১৯৬০ সালে বোঝা গেল ইউরোপ খণ্ডিত, বিখণ্ডিত ও আমেরিকার তাঁবেদার। অতীত নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সমস্যাটা ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলি বুঝছিল না তা নয়। তবে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা প্রথম বাজালেন ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট, দ্য গল। তিনি হঠাৎ জার্মান চ্যান্সেলর আডেন আওয়ারের কাছে ১ জানুয়ারি ১৯৩০ সালে উপস্থিত। ফ্রান্স ও জার্মানের সম্পর্ক কয়েকশ' বছর ধরে অহি-নকুল থেকেও খারাপ। দ্য গল আডেন আওয়ারকে বললেন যে ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রগুলির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। শিল্পে বাণিজ্যে বর্তমান টেকনোলজিকাল যুগে ছোট ছোট দেশ অচল। অতএব জার্মান-ফ্রান্সের নেতৃত্বে যুক্ত ইউরোপের সংগঠন চেষ্টা করা যাক। জার্মানও রাজি। তবে সবাই বুঝল 'রাজনৈতিক ঐক্য' বা 'ফেডারেল ব্যবস্থা' একেবারে সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে এগোতে হবে। ধাপটা হল প্রথমে 'কমন মার্কেটের প্রতিষ্ঠা' আর তাতে সাফল্য লাভ করলে 'মুদ্রার ঐক্য' আর তাতে সাফল্য লাভ করলে 'এক ইউরোপিয়ান' পার্লামেন্ট।

'কমন মার্কেট' জিনিসটা কি বোঝা দরকার। কমন মার্কেট মানে হল যে সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে 'মুক্ত বাণিজ্য' করবে। এক দেশের শিল্পজাত দ্রব্য বিনা শুল্কে ও বিনা বাধায় অন্য দেশে বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য বা ফ্রি ট্রেড (Free Trade) করবে।

(যেমন বিহার ও বাংলার মধ্যে জিনিসপত্রের চলাচল মুক্ত, লোক চলাচলও মুক্ত)। কমন মার্কেটের দ্বিতীয় একটি মানে আছে। তা হচ্ছে তৃতীয় দেশের (এখানে ভারত বা অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বা আমেরিকা বা অন্য রাষ্ট্রগুলি) বিরুদ্ধে কমন মার্কেট সদস্যগুলি একই শুল্ক বা কাস্টমস বা একই নীতি হবে। কেউ কোনো আলাদা নীতি নিতে পারবে না।

প্রথম দফায় কমন মার্কেটে ছ'টি দেশ যোগদান করে—প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই ছ'টি দেশ হল পঃ জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ। ছ'টি দেশের মধ্যে তিনটি অপেক্ষাকৃত বড় আর তিনটি ছোট। বড় দেশগুলি হল পঃ জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও ছোট রাষ্ট্রগুলি হল বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ। ঠিক হল কেউ কারোর ওপর সর্দারি না করতে পারে তার জন্য সব হেড অফিস, পার্লামেন্ট ইত্যাদি হবে বেলজিয়াম নামক ছোট দেশের রাজধানী ব্রুসেলস-এ। আশ্চর্যের কথা ১৯৩০ সালে যে ইউরোপিয়ান কমন মার্কেট আরম্ভ হল তা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল। জার্মানি শিল্পে অনেকটাই এগিয়ে গেল আর বাণিজ্যে সারপ্লাস। ফ্রান্সও শিল্পে ও কৃষিতে এগিয়ে গেল—আর ফ্রান্সের কৃষিজাত দ্রব্য কমন মার্কেটের বাজার দখল করল। সাফল্য আবার সাফল্য আনে। কমন মার্কেট যত পরিণত হয় তত অন্য ইউরোপীয় দেশগুলি কমন মার্কেটে যোগদান করতে চায়।

প্রথম দফায় ব্রিটেন আসেনি। ব্রিটেনের ভাবনা ছিল যে কমন মার্কেটে যোগ দিলে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের কৃষিদ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্য ব্রিটেনে চড়া দামে বিক্রি হবে। ব্রিটেন তখন কমন মার্কেটের তুলনায় কমনওয়েলথকেই বেছে নিয়েছিল। তাতে ব্রিটেনের শিল্প ক্রমশ পিছিয়ে গেল। ঘরের সামনে বিরাট বাজার কমন মার্কেটে ব্রিটেন যোগদান না করাতে ব্রিটেনের শিল্পে এক বিরাট সঙ্কট। ১৯৭০ সাল থেকেই একদল ব্রিটিশ বিশেষত কনজারভেটিভ পার্টির অধিকাংশ সদস্যই কমন মার্কেটে যোগ দিতে চায়। তবে ভয়ও আছে কমন মার্কেটে দেরিতে যোগ দিলে নেতৃত্বে থাকতে পারবে না—নেতৃত্বে থাকবে পঃ জার্মানি। ব্রিটেনের নানা টানাপোড়েন, নানান মত, নানান দ্বিধা। অবশেষে ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি ব্রিটেনে 'বিবেক ভোট'-এ রেফারেন্ডাম হয় আর অল্প সংখ্যক মার্জিনে ব্রিটিশরা কমন মার্কেটে যোগদানে সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটেন যখন কমন মার্কেটে যোগ দিল তখন আরও ৭টি দেশ বিশেষত তিনটি স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশ, সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে যোগ দিল। আয়ারল্যান্ড, স্পেন, গ্রিস, পর্তুগাল যোগ দিতে চায়। এছাড়া পূর্ব ইউরোপের দেশ যেমন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক ও স্লাভ ও ইউক্রেনও কমন মার্কেটে যোগ দিতে চায়। কেউ কেউ পূর্ণ মেম্বার হয়ে গেল আবার কেউ কেউ 'বিশেষ' সদস্য হয়ে থাকল। মোটামুটিভাবে বলা যায় কমন মার্কেট ছ'টি দেশ নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল—যত দিন যায় সদস্য সংখ্যা বাড়ে। তার প্রধানতম কারণ ঘরের

কাছে বিরাট বাজার আর নেতাদের উচ্চ আয়।

কিন্তু কমন মার্কেটের আসল উদ্দেশ্য হল 'সর্ব সার্বভৌমত্ব' বিসর্জন দিয়ে রাজনীতির একীকরণ। সেই উদ্দেশ্যে মুক্ত বাণিজ্য—কিন্তু তাতে কি 'এক ইউরোপ' আসবে! আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

১৯৯১ সালে রাজনৈতিকভাবে একীকরণের জন্য নতুন ফর্মুলা তৈরি হল। তার নাম মাস্ট্রিক্ট ট্রিটি (Maastrict Treaty)। এই চুক্তি অনুযায়ী একটি সময়ের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা উঠিয়ে একটি মাত্র 'মুদ্রা' আর একটি মাত্র 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে মাসট্রিক্ট ট্রিটির কিছু শর্ত আছে যেমন—মুদ্রাস্ফীতির হার একটি দেশের অন্য সমস্ত দেশের গড় মুদ্রাস্ফীতি থেকে যেন ১.৫ শতাংশ বেশি না হয়। আর একটি শর্ত আছে সরকারি বাজেট ডেফিসিট যেন কোনো সময়েই ৩ শতাংশ জাতীয় আয়ের বেশি না হয়।

বলা বাহুল্য, ব্রিটেন এই শর্ত মানতে চায় না। তাদের ভয় মাসট্রিক্ট মানে ব্রিটেনের সার্বভৌমত্ব হরণ। ব্রিটেন ক্রমাগত এই 'এক মুদ্রার' আরম্ভ করা নিয়ে ওজর-আপত্তি তুলতে লাগল। ১৯৯৬ সালেই এক অভিন্ন মুদ্রার আরম্ভ হওয়ার কথা। তারিখ ক্রমশ পাল্টাতে লাগল। এখানে বলে রাখা ভালো কমন মার্কেটে মুখ্য মীমাংসাগুলি ঠিক হবার কথা 'সর্বসম্মত' মতে বা যাকে বলা হয় Unanimity Principle.

আপাতত ঠিক হয়েছে যে পরের বছর থেকেই ইউরোপের ১১টি দেশে অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু হচ্ছে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ইত্যাদি দেশে নতুন মুদ্রা পরের বছরে আসবেই। আর ব্রিটেন বা অন্য যে সব দেশ আপাতত এক মুদ্রা চালু করতে চায় না তারা 'আপত্তি' জানাবে না। অর্থাৎ কিছু দেশে 'ইউরো' চালু হবে তারাই বেশি—আর ব্রিটেন সহ আরও কয়েকটি দেশে চালু হবে না—তারা সংখ্যায় কম।

এটা বোঝা যাচ্ছে আমেরিকা ব্রিটেনের মারফত তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছে। কমন মার্কেটের আমেরিকান ট্রোজান হর্স (Trojan Horse) ব্রিটেন। আমেরিকার ভয় 'ইউরো' যদি একবার চালু হয়, তবে আমেরিকার ডলারের 'সমান্তরাল' আরও এক মুদ্রা তৈরি হবে এবং তাতে ডলারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কমে যাবে। তবে আমেরিকা বা ব্রিটেন খুব বাধা দিতে পারছে না কারণ পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহের বদলে ইউরোপের লোকরা চায় শান্তি। সাধারণ যুবক-যুবতীদের চাপটা খুবই প্রবল। 'ইউরো' আসলে পরে হয়তো পৃথিবীতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।

ডলার বনাম ইউরো

২০০২ সালে ১ জানুয়ারি থেকে পৃথিবীব্যাপী এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ইউরোপে নতুন এক মুদ্রা চালু হল। নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউরো' (Euro)। আর এই পরিবর্তন পৃথিবীব্যাপী এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ভারতেও তার প্রভাব পড়বে। অথচ আমরা এই ইউরো সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিস্পৃহ। আমাদের কাগজগুলি পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে যতখানি আলোচনা করছে ইউরো সম্বন্ধে তার সিকিভাগও না। হয় আমরা এর প্রভাব সম্বন্ধে বুঝছি না, কিংবা পাকিস্তানের ঘটনাবলী আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, ইউরোর আবির্ভাবের পর আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাদাগিরি কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। পৃথিবী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর কেন্দ্রীভূত থাকল না। ডলারের বা আমেরিকার মুদ্রার সমান্তরাল মুদ্রা চালু হলে দেশে ও বিদেশে নানান রূপান্তর ঘটবে তা বলাই বাহুল্য।

আমেরিকার বর্তমান প্রভাব বিস্তারের অন্যতম কারণ তার দেশীয় মুদ্রা ডলার বর্তমানে পৃথিবীতে একমাত্র বাণিজ্য মুদ্রা। জাপানের সঙ্গে ভারতের যদি বাণিজ্য হয় তবে বিনিময় মুদ্রা জাপানের ইয়েনও নয়, ভারতীয় রুপিও নয়—একটাই মুদ্রা সর্বজনগ্রাহ্য তা হচ্ছে ডলার। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে তার অন্য নাম 'ডলার স্ট্যান্ডার্ড (Dollar Standard)।

কেন পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ডলার সর্বজনগ্রাহ্য মুদ্রা হয়ে দাঁড়াল তা বুঝতে গেলে এটা ধরে নিতে হবে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ক্রমশ তার জলুস হারিয়ে বিপর্যস্ত। ইউরোপে এখন বহু ছোট ছোট রাষ্ট্র। তারা একক ভাবে আমেরিকার অর্থনৈতিক সাফল্যকে রুখতে পারল না। প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ইউরোপের প্রত্যেক দেশকে ছাড়িয়ে গেল। ইউরোপ তার কলোনি হারিয়ে দিশেহারা ও যুদ্ধে পর্যুদস্ত।

এই অবস্থায় আমেরিকা পৃথিবীব্যাপী তার ডলারকে বিশ্বমুদ্রা হিসেবে চালু করল। যত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে তারাও আমেরিকার ডলারকে 'একমাত্র' বিশ্বমুদ্রা হিসেবে চালু করে আগেকার বিশ্বমুদ্রা যেমন স্বর্ণকে বিশ্ববাণিজ্য থেকে তুলে দিল। জামাইকা কনভেনশনের (১৯৭৮) পর স্বর্ণ আর বিশ্বমুদ্রা থাকল না। একটি বিশ্বমুদ্রাই পৃথিবীতে থাকল তার নাম আমেরিকান ডলার। যত ব্যবসা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, দান, অনুদান সবই ডলার মারফত হতে লাগল। আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই ব্যবস্থাকে আইনগত স্বীকৃতি দিল।

এই ডলারকে বিশ্বমুদ্রা হিসেবে চালু রাখলে আমেরিকার প্রভূত সুবিধা। শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য ঘাটতি বা যাকে বলা হয় ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ডেফিসিট তা বর্তমানে আমেরিকায়। আমেরিকার আমদানি, রপ্তানি থেকে অনেকটাই বেশি। অথচ আমেরিকা এই ঘাটতি সব সময় বজায় রাখতে পারবে। তার কারণ ডলার আমেরিকার নিজস্ব মুদ্রা। তার যোগান আমেরিকার হাতে। অতএব, পৃথিবীকে যদি ঘাটতির জন্য ধার শোধ করতে হয় তবে আমেরিকা তার নিজস্ব ডলার যত ইচ্ছা দিতে পারে। অর্থাৎ যত ইচ্ছা ঘাটতি করতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষ পারবে না। ভারতবর্ষে যদি বিশ্ববাণিজ্যে ঘাটতি থাকে তবে তাকে ডলারে ধার পরিশোধ করতে হবে, রুপিতে নয়। ডলারে ধার শোধ করতে গেলে ভারতকে ডলার উপার্জন করতে হবে। ডলার উপার্জন করতে গেলে হয় রপ্তানি বাড়াতে হবে অথবা অন্য দেশ বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতো সংস্থা থেকে ধার করতে হবে। ধার করলে শোধ দিতে হবে। আর শোধ দিতে গেলে ডলারেই দিতে হবে। ফলে আমেরিকা যখন তখন শর্ত চাপিয়ে তার প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারবে।

এর অর্থ হল ডলার একমাত্র বিশ্বমুদ্রা হওয়ার ফলে আমেরিকা যত ইচ্ছা ঘাটতি করতে পারে, যত ইচ্ছা সামরিক খাতে খরচ করতে পারে, যত ইচ্ছা শর্ত চাপাতে পারে। কিন্তু একই অবস্থায় ভারত তা পারবে না। বলাবাহুল্য, সামরিক খাতে আমেরিকা যত খরচ করতে পারবে অন্য কোনো দেশ তা পারবে না। ডলার একমাত্র বিশ্বমুদ্রা হওয়ার ফলে আমেরিকা এখন সর্বেসর্বা।

আমেরিকার এই প্রভুত্ব ইউরোপের পছন্দ হচ্ছিল না। ইতিহাসের পুরনো কথায় না গিয়ে বলা যাক যে ফ্রান্স আর জার্মানি এর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিল—বিশেষত ফ্রান্স।

ফ্রান্স ও জার্মানির নেতৃত্বে ইউরোপে এক আন্দোলন শুরু হল। প্রথম যুগে নাম ছিল কমন মার্কেট আন্দোলন। ষাটের দশকের প্রথম থেকে যাত্রা শুরু। প্রথমে ছয়টি দেশ এই কমন মার্কেটে যোগ দেয়। যেমন ফ্রান্স, জার্মানি (পঃ), ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ। তিনটি বড় দেশ আর

তিনটি ছোট দেশ। এই অবস্থায় কেউ কারোর ওপর প্রভুত্ব করতে পারবে না। হেড অফিস হল বেলজিয়ামে, একটি ছোট দেশে।

অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কমন মার্কেট শৈশব দশা থেকে যাত্রা শুরু করল। ব্রিটেন প্রথমে কমন মার্কেটে যোগ দেয়নি। অনেকের ধারণা আমেরিকাকে খুশি রাখতে ব্রিটেন প্রথম যুগে যোগ দিল না। দিতে বাধ্য হল সত্তর দশকে। কারণ ব্রিটেনের কলোনি আর নেই। কমনওয়েলথ ব্রিটেনকে পাত্তা দেয় না। অথচ কাছের ইউরোপের মার্কেটে ঢুকতে পারছে না। অনেক অপমান ইত্যাদি সহ্য করে ব্রিটেনও কমন মার্কেটে ঢুকল।

ইউরোপের কমন মার্কেটের একটাই উদ্দেশ্য তা হল 'এক ইউরোপ, এক ফ্ল্যাগ'—যার ইংরেজি নাম দেওয়া হচ্ছে 'Integration' কিন্তু পথ সহজ সরল নয়। কেউ তার 'সার্বভৌমত্ব' সহজে ছাড়তে রাজি নয়। অথচ সবাই বুঝছে এক ইউরোপ না হলে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। এক ইউরোপের দিকে অগ্রসর হবার জন্য যে পদ্ধতি নেওয়া হল তার নাম Gradualism-অর্থাৎ আস্তে আস্তে এক ইউরোপের দিকে এগুতে হবে। নানান নীতির পরিবর্তন হচ্ছে। বাণিজ্য প্রথার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পতে অনেক নতুন আইন হয়েছে। লক্ষ্য একটাই, 'এক ইউরোপ'। অনেক উত্থান ও পতনের মধ্যে ইউরোপের কমন মার্কেটে এখন ১৫টি পূর্ণ সদস্য। আরও কিছু দেশ সদস্য হবার জন্য দরখাস্ত করেছে। পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশই যেমন ইউক্রেন ও হাঙ্গেরি এর সদস্য হতে চায়।

এই 'এক ইউরোপের' দিকে এগুতে গেলে ঠিক করা হয়েছে যে বিভিন্ন দেশে যা আলাদা মুদ্রা আছে তা উঠিয়ে একটি মুদ্রা এবং একটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক চালু করতে হবে। এই ইউরো চালু হবার কথা ছিল প্রথমে ১৯৯৫ সালে তারপরে ১৯৯৮ সালে, ১৯৯৯ সালে হয়নি। কারণ অনেক দেশই তার কারেন্সি বা মুদ্রা উঠিয়ে দিতে চাইছিল না।

অবশেষে ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি ইউরো চালু হল। ইউরোপের ১৫টি সদস্য দেশের মধ্যে আপাতত ১২টি দেশ ইউরো মুদ্রা মেনে নিল। অর্থাৎ জার্মানির মার্ক আস্তে আস্তে উঠে যাবে। ফ্রান্সের ফ্রাঁও উঠে যাবে। ইতালির লিরা আর থাকবে না। ১২টি দেশ তাদের মুদ্রা ক্রমশ উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ইউরো মুদ্রা মেনে নিল। অর্থাৎ ইউরোপের বাণিজ্যে এক মুদ্রা থেকে অন্য মুদ্রায় যাবার জন্য Conversion Cost আর লাগবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সহজে করা যাবে, ভ্রমণ ইত্যাদি সহজতর হবে।

১৫টি দেশের মধ্যে যে ৩টি দেশ আপাতত ইউরো মেনে নেয়নি, তার মধ্যে অন্যতম ব্রিটেন। ইউরো চালু করতে গেলে কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে হবে। যেমন অন্যতম শর্ত হল যে বাজেটে ঘাটতি ৩ শতাংশের বেশি করা যাবে না। কেউ যদি বেশি ঘাটতি করে তবে তাকে 'ফাইন' দিতে হবে। আর 'ফাইন'টা

কিঞ্চিৎ চড়া। ব্রিটেন এই শর্ত মানতে রাজি নয়। ইউরো চালু করলে মুদ্রাস্ফীতির হার একটি নির্দিষ্ট হারের মধ্যে রাখতে হবে। জাতীয় সুদ কত হবে তা ইউরোপের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ঠিক করবে—কোনো দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক তা ঠিক করবে না। ব্রিটেন এইসব শর্ত মানতে রাজি নয়। আপাতত ব্রিটেনে পাউন্ড স্টার্লিং থেকে যাচ্ছে, ওই দেশে ইউরো আসছে না। যদি ইউরোপের অন্য দেশগুলি মনে করে ব্রিটেনকে ইউরো মানতেই হবে তাহলে ব্রিটেনের সমূহ ক্ষতি। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ব্রিটেনের দূতরা ইউরো গ্রহণ করার তদবির করছে।

যা হোক ১২টি দেশ আপাতত ইউরো চালু করল। আর সঙ্গে সঙ্গে এই মুদ্রা ডলারের সঙ্গে আরও একটি 'বিশ্বমুদ্রা' হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ আমেরিকান ডলারে আর বাণিজ্যে বিনিময় করা বাধ্যবাধকতা নয়। বিকল্পও আছে ইউরো। পৃথিবীর বাণিজ্য এখন শুধু ডলারে নয়, ইউরোতেও হতে পারে। তার মানে ডলারের প্রভুত্ব কিছুটা কমল। আরও কমবে যদি জাপান, চীন ইত্যাদি দেশগুলি বাণিজ্যের একাংশ অন্তত ইউরোতে করে। যত ইউরো বাড়বে তত ডলারের প্রভাব কমবে। অর্থাৎ আমেরিকার বর্তমান প্রভুত্ব কিঞ্চিৎ বাধা পাবে। ভারতবর্ষও আর ডলারে সব বাণিজ্য মুদ্রা রাখতে রাজি নয়—এখন ইউরো চায়। বস্তুত ভারতের রুপি ইউরো রেট বেশ ভালো—অথচ রুপি ডলার রেট ততটা ভালো নয়।

এখন ফ্রান্স বলতে আরম্ভ করেছে যে, সমস্ত বাণিজ্যে ডলারই একমাত্র মুদ্রা তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমেরিকা এখন ইউরোতে ধার শোধ করুক। যদি আমেরিকার 'ধার' ইউরোতে শোধ করতে হয় তবে আমেরিকাকে তা অর্জন করতে হবে। তার ডলার ছাপানো মেশিনে কাজ আর হবে না। অর্থাৎ বিশ্বের অন্য দেশে যা সমস্যা আমেরিকারও একই সমস্যা হতে বাধ্য। ইউরোর আবির্ভাব মানে 'ডলারের পশ্চাদপসারণ'। যত বেশি দেশ বেশি ইউরো চাইবে তত ডলারের চাহিদা কমবে। অর্থাৎ ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটতে পারে।

অর্থাৎ ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা পৃথিবীতে নতুন করে মুদ্রার জন্ম দেখলাম। এই মুদ্রা যত বলশালী হবে ততই আমেরিকার অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা কমবে। অনেকে মনে করছে আমেরিকার দাদাগিরির শেষটা শুরু হয়ে গেল।

এক ইউরোপের ভাবনা : এখনও দূর অস্ত

বর্তমানে আমরা সাতটি দেশ মিলে সার্ক তৈরি করেছি। ভাবা হয়েছিল সাতটি দেশ মিলে যদি আমরা উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করতে পারি, তবে ক্রমশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একত্রীকরণ করা হবে—ফলে সাফটা নামক নতুন এক সংস্থা। এই সাফটা দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। যদি ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে তবে ক্রমশ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা একত্রীকরণের দিকে এগোব। কারণ অর্থনীতির এমনই প্রবল চাপ যে বর্তমান টেকনোলজির যুগে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বাজার প্রায়শ অচল। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রযুক্তির যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তাতে বাজার—আরও বড় বাজার চাই। আর বাজারের চাহিদা থেকে রাজনৈতিক একত্রীকরণ সম্ভব হবে। অর্থাৎ যে কোনো আঞ্চলিক সংস্থার মূল উদ্দেশ্য বা শেষ উদ্দেশ্য রাজনৈতিক একত্রীকরণ বা এক রাষ্ট্র।

অবশ্য আমরা 'সার্ক' এবং 'সাফটা' বিষয়ে আগ্রহী, কারণ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে আমাদের সম্পর্ক বর্তমানে খুবই খারাপ। আশা করা যায় প্রথমে অর্থনৈতিক একত্রীকরণ হলে পরে রাজনৈতিক সখ্যতা আসতে বাধ্য। কারণ মূলত অর্থনৈতিক। পৃথিবীব্যাপী তাই আজ নতুন নতুন আঞ্চলিক সংস্থা। পূর্ব এশিয়ায় (এশিয়ান), লাতিন আমেরিকায় (নাফ্‌টা), আরবরা মাঝখানে একটা আঞ্চলিক সংস্থা করবার চেষ্টা করেছিল তবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বস্তুত ইউরোপের কমন মার্কেট ছাড়া কোনোটাই সিঁড়ির এক ধাপও এগোতে পারেনি।

১৯৬০ সালের পয়লা জানুয়ারি নানা কারণে ঐতিহাসিক। পৃথিবীর ৫০০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় ফ্রান্স ও জার্মানি চিরশত্রু। আবার জার্মানদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের দুটো মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপ থেকে সব রকম যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং তা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধ বিশেষত ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ ইউরোপে চিরকাল লেগেই ছিল। এই অবস্থায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল জার্মানিতে গিয়ে জার্মান চ্যান্সেলার আডেন আওয়ারের সঙ্গে এক চুক্তি করল। এই চুক্তিটি বিখ্যাত ট্রিটি অফ রোম। আর এই চুক্তির বিষয়বস্তু হল জার্মান, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ মিলে তাদের 'সার্বভৌমত্ব' কিছুটা বিসর্জন দিয়ে এক কমন মার্কেট তৈরি করবে। কমন মার্কেট মানে এক অভিন্ন বাজার।

অভিন্ন বাজার কথাটার তাৎপর্য বোঝা দরকার। এর মানে এই যে যারা কমন মার্কেটে যোগদান করবে তারা নিজেদের বাণিজ্যের উপর শুল্ক ক্রমাগত কমিয়ে শূন্য করে দেবে। অর্থাৎ জার্মানি থেকে কোনো দ্রব্য যদি ফ্রান্সে 'রপ্তানি' করা হয় তবে তার জন্য কোনো শুল্ক লাগবে না। (যেমন পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদি আমরা দ্রব্য বিহারে বা মহারাষ্ট্রে পাঠাই তার জন্য কোনো শুল্ক লাগে না)। অর্থাৎ কমন মার্কেটে কোনো দ্রব্য এক দেশ থেকে অন্য দেশ পাঠালে তা বিনা বাধায় কমন মার্কেটের অন্যান্য দেশে যেতে পারে। ফলে প্রতিযোগিতা বাড়বে, আর যত প্রতিযোগিতা বাড়বে তত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে। কমন মার্কেট বা অভিন্ন বাজার কথাটার মানে নিজেদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য।

অভিন্ন বাজারের দ্বিতীয় একটা মানে আছে। এর মানে যারা কমন মার্কেটে যোগ দেবে তারা তৃতীয় বা বিদেশে বাণিজ্য দ্রব্যের উপর 'একই' শুল্ক বসাবে। এর মানে জার্মানি বা ফ্রান্স, আমেরিকা বা চীন বা ভারত থেকে যদি কোনো জিনিস আমদানি করে তবে শুল্কের হার একই হবে। একই শুল্ক থাকার ফলে প্রতিযোগিতায় সমতা আসবে—অসম প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করা যাবে। মনে করা যাক্ যদি ফ্রান্স বিদেশ থেকে শুল্ক কমিয়ে কাঁচামাল কম দামে কেনে, আর জার্মানি শুল্ক বাড়িয়ে রাখে তবে প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স জার্মানিকে হারাবে। অতএব অভিন্ন বাজার মানে অভিন্ন শুল্ক। সব দেশের গড় শুল্ক নিয়ে তৃতীয় বা বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্ধারণ হবে।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন সাফল্যের ইতিহাস। বাজার সম্প্রসারিত হবার ফলে জার্মানি বা ফ্রান্সের শিল্প ক্রমাগত বাড়ে। ফলে শিল্পে জার্মানি বা ফ্রান্স বা অন্যরা এগিয়ে গেল। আমেরিকাও প্রথম যুগে এই অভিন্ন ইউরোপ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ছিল। তাদের ধারণা বিরাট রাশিয়াকে আটকাতে গেলে ইউরোপের একীকরণ দরকার। পৃথিবীতে তিনটি বৃহৎ আঞ্চলিক গোষ্ঠী হবে এবং তাদের দ্বারাই পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হবে। আমেরিকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি, রাশিয়ার প্রায় ৩০ কোটি আর একীকরণ ইউরোপের লোকসংখ্যাও প্রায় ৩০ কোটি হবে। অতএব পৃথিবীতে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক 'সমতা' আসবে।

এই অভিন্ন বাজারে যোগদান করতে কিছু দেশের প্রবল আপত্তি ছিল। যেমন ব্রিটেন বহুদিন পর্যন্ত এই কমন মার্কেটে যোগ দেয়নি। অবশেষে সত্তর

দশকে এক গণভোটের মাধ্যমে ব্রিটেন কমন মার্কেটে যোগদান করে এবং ব্রিটেনের সঙ্গে আরও ছ'টি দেশ। আবার ১৯৯৫ সালে ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া আর সুইডেন যোগ দেওয়াতে ইউরোপের কমন মার্কেটে বর্তমানে ১৫টি দেশ। যত বেশি দেশ যোগ দিচ্ছে তত বেশি সমস্যা আরম্ভ হয়েছে।

ব্রিটেনের আপত্তির কারণ বহুবিধ ছিল। আর এও মনে রাখা দরকার, যে গণভোট ব্রিটেনে নেওয়া হয়েছিল তাতে খুবই সামান্য সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্য অবশেষে রাজি হয়। বিভিন্ন দেশে যে গণভোট নেওয়া হয় তাতেও খুব অল্প সংখ্যক লোকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। অর্থাৎ অনেকেই যোগদানের বিপক্ষে। ব্রিটেন এবং অন্য বহু দেশের আপত্তির কারণ কৃষিজাত দ্রব্যে কি মুক্ত বাণিজ্য আসবে? ব্রিটেন প্রায় দু'শ বছর ধরে তার খাদ্যদ্রব্য অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং কানাডা থেকে খুব স্বল্প দরে কেনে। যদি ব্রিটেন কমন মার্কেটে যোগ দেয়, তবে শুল্ক একীকরণ হওয়ার ফলে ফ্রান্স থেকে অনেক বেশি দরে কৃষিদ্রব্য কিনতে হবে। অর্থাৎ ব্রিটেনের কৃষি বাজারের বিরাট এক পরিবর্তন হবে। ব্রিটেনকে কৃষিদ্রব্য এবং খাদ্যদ্রব্য এখন থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে কিনতে হবে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে। এছাড়া 'মুক্ত বাণিজ্য' যদি কৃষিদ্রব্যে চালু হয় তবে ব্রিটেনের কৃষির উপর নির্ভরশীল কৃষকরা বাণিজ্যযুদ্ধে হেরে যাবে। ব্রিটেনের কৃষি মোটামুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ব্রিটেন চায় মুক্ত বাণিজ্য শিল্পদ্রব্যে হোক কিন্তু যেন কৃষিতে না হয়।

ফ্রান্স অবশ্যই আপত্ত জানাল। শুধু শিল্পে একীকরণ হবে কৃষিতে হবে না, এমন অভিন্ন বাজারে ফ্রান্স, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি কৃষিতে উদ্বৃত্ত দেশের ভয়ানক আপত্তি। তারা চায় মুক্ত বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে। অর্থাৎ কৃষি এবং শিল্পে।

এই ঝামেলা ঠিকভাবে কোনোদিনই সমাধান করা যায়নি। বলা হয় ইউরোপের একীকরণ যেভাবে এগুচ্ছে তাতে কোনোদিনই একীকরণ বা এক ইউরোপ সম্ভব হবে না। কৃষি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতবাদ। কোনো কোনো রাষ্ট্র এখনও কৃষিতে একীকরণ রাখার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইউরোপে নানা বিরোধ চলতে থাকে।

এই অবস্থায় ওষুধ বাতলালেন শ্রীযুক্ত মাসট্রিক্ট মহাশয়। তার সৌজন্যে যে চুক্তি ও প্রস্তাব হয় তার নাম মাসট্রিক্ট ট্রিটি। তার প্রধান বক্তব্য, ইউরোপের একীকরণ যে জটে আটকে গেছে তা থেকে মুক্তি পেতে গেলে অন্যভাবে চিন্তা করা দরকার। কৃষি ও শিল্পে একীকরণ পুরোটা কিছুতেই করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন দেশের নানা মতবাদ ও বিভিন্ন স্বার্থ। এই অবস্থায় একীকরণ সম্ভব যদি ইউরোপে বিভিন্ন মুদ্রার পরিবর্তে একই ইউরোপের মুদ্রা চালু করা যায়। যদি একই মুদ্রা চালু থাকে তবে আর্থিক নীতি খুব একটা ভিন্ন হতে পারে না।

অর্থাৎ বিহারের আলাদা মুদ্রা নেই, পঃ বঙ্গের আলাদা মুদ্রা নেই, অতএব একই ভারতীয় মুদ্রার জন্য আমাদের 'মনেটারি ও ফিস্‌কাল্' নীতিতে খুব একটা প্রভেদ থাকতে পারবে না।

মাসট্রিক্ট চুক্তির পর ইউরোপের মরা গাঙ্গে বান আসবে বলে সবাই মনে করল। এই চুক্তিটির আবার বিভিন্ন মানে। ইংল্যান্ডের মুদ্রা পাউন্ড-স্টার্লিং, জার্মানির মার্ক, ফ্রান্সের ফ্রাঁ, ইতালির লিরা ইত্যাদি ১৫টি দেশের মুদ্রার অস্তিত্ব থাকবে না—তার জায়গায় আসবে নতুন এক মুদ্রা। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশই একই ধরনের বাজেট ঘাটতি করবে, একই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি রাখবে এবং একই ট্যাক্স নীতি রাখবে। অর্থাৎ একই মুদ্রার সঙ্গে একই আর্থিক নীতি নিতে হবে। বিরাট উচ্ছ্বাস প্রথম দিকে ছিল—ভাবা হল ১৯৯৫ সালেই 'এক ইউরোপ' সত্যি সত্যি হয়ে যাবে।

দেখা গেল তা হল না। আপাতত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। জার্মানি যতটা উদগ্রীব ইতালি ততটা নয়। তাছাড়া প্রত্যেক দেশে 'এক' অর্থনীতিতে অনেকের জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। ইউরোপে এখন প্রচণ্ড আলোড়ন। সত্যি সত্যি কি 'একই মুদ্রা' ইউরোপে আসবে? তার সুদূরপ্রসারী অর্থ কি?

তর্কটা কখন সামান্য বিষয়ে কখনও আবার মৌলিক বিষয়ে। সামান্য যে কখন অসামান্য হয় তাও বোঝা দুষ্কর। সামান্য বিষয়ে তর্কের স্বরূপটা বোঝা দরকার। এই নয়া ইউরোপীয়ান মুদ্রার নাম কি হবে? এই নয়া মুদ্রার নোটগুলিতে কিসের ছবি থাকবে?

কি ডিজাইনের নোট হবে? ডাচরা চায় তাদের পার্লামেন্টের ছবি বা রাইখস্টাগ নোটের ওপর থাকুক—কারণ প্রায় ৫০০ বছর ধরে এই ছবিতে তারা অভ্যস্ত। ফরাসিরা চায় আইফেল টাওয়ার তাদের দেশের জাতীয়তাবাদের প্রতীক। জার্মানরা অবশ্যই সেটা চায় না—তারা চায় তাদের বিখ্যাত লোকের কোনো ছবি। আবার ইংরেজরা নোটে চায় রানীর মুখ। অর্থাৎ নোট কি ধরনের হবে তা নিয়ে যে তর্ক তা ঠিক 'নতুন ইউরোপে'র ইমেজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

নতুন মুদ্রার নাম কি হবে? কমন মার্কেটের কর্তারা নাম রাখবার চেষ্টা করলেন ই সি ইউ বা ইয়োরোপীয়ান কারেন্সি ইউনিট। জার্মানদের প্রবল আপত্তি। কারণ জার্মান ভাষায় Cin Ecu শব্দটা শোনায় Cin Kuh-এর মতো—অর্থাৎ একটি গরু। জার্মানরা যে নাম দিতে চায় তা হচ্ছে 'Franken' বা ফ্রাঙ্কেন। ফরাসিরা এটা মেনে নিতে চায় কারণ এর উচ্চারণ অনেকটাই তাদের বর্তমান ব্যবহৃত মুদ্রা ফ্রাঁর মতো। ইংরেজরা এই নাম চায় না কারণ ফ্রাঙ্কেন তাদের কাছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো দৈত্য। অর্থাৎ যে কোনো নাম হলেই আপত্তি।

হঠাৎ রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে কিছু সিনেমার অভিনেত্রী এই নোটের নাম ও নকশা নিয়ে নানান সেমিনার মিটিং করলেন। সিনেমার অভিনেত্রী বলে কথা, বহু লোক এই মিটিংয়ে যোগ দিল। তাঁদের মতে, এই নোটে বিখ্যাত রোম নেতা সিজারের প্রতিমূর্তি থাকুক। আরও বিকল্প তাঁরা দিলেন যেমন মাইকেল এঞ্জেলার আঁকা ডেভিড বা পিয়ানো। সিনেমা অভিনেত্রী মাদাম বুরদোঁর মতে, ইউরোপের কমন কালচার হচ্ছে শিল, ভাস্কর্য আর গান। এই কথাটা মনে রাখবার জন্য কোনো বিখ্যাত লেখক শিল্পী বা কবির ছবি নোটে থাকুক। রাজনীতিবিদরা এটা আবার বরদাস্ত করতে পারে না। কারণ প্রকারান্তরে সিনেমার অভিনেত্রী মাদাম বুরদোঁ বলতে চাচ্ছেন রাজনীতিবিদ্‌রা শুধু ঝগড়াই করে, ওদের বাদ দিয়ে নোটের নকশা তৈরি হোক আর মুদ্রার নাম থাকুক 'ইউরোপা'। অর্থাৎ নোটের নাম ও নকশা নিয়ে এখন ইউরোপে তুমুল তর্ক বিতর্ক।

একই মুদ্রা চালু করতে ইংরেজদের এখন প্রচণ্ড আপত্তি। তাদের ধারণা, এই মুদ্রা জার্মানরাই নিয়ন্ত্রণ করবে কারণ জার্মানদের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এখন সবচেয়ে বেশি। ইতালিয়ানরাও মাসট্রিক্টের এখন বিপক্ষে—কারণ চুক্তি মতো বাজেটের ঘাটতি অনেকটাই কমাতে হবে তাতে তাদের দেশে বেকারি বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ১৯৬০ সালে ভাবা গিয়েছিল সত্যি সত্যি ইউরোপ বুঝি 'একত্র' হয়ে বৃহত্তর ইউরোপ হয়ে দাঁড়াবে। অন্তত এখন তো আর হচ্ছে না। আর ইউরোপ একত্র করার বদলে বোধহয় কিছুটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। কবে একই মুদ্রা চালু করা যাবে এখন আর তারিখটা বলা হচ্ছে না—আগে ঠিক করা হয়েছিল ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এর থেকে ভারতের অবশ্য শিক্ষা নিতে হবে। শিক্ষাটা হচ্ছে মুখে 'ঐক্য' বললেই কাজে তা অনেক সময় হয় না—তাই সার্ক থেকে সাফটায় যাওয়াটা আর যাই হোক সহজ নয়। আর বিশ্ব জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি কথাটা গলা উঁচু করে বললেও আমরা এখনও ট্রাইবেল এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিশেষ ঊর্ধ্বে উঠতে পারিনি। ঈগলের মতো উড়তে গিয়ে উটপাখি হয়ে বসে থাকি।

২০০২ সালে 'এক ইউরোপ' গড়ার চেষ্টা—সফলতা ও বিফলতা

ভারতের সঙ্গে যখন সার্ক দেশগুলির অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে তখন পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। ইউরোপ ক্রমশ নথিভুক্ত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদ এখন আর ইউরোপে গ্রাহ্য নয়। একটার পর একটা দেশ তাদের স্বকীয় স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ইউরোপ গড়বার বা এক ইউরোপ গড়তে চাচ্ছে। অর্থাৎ 'রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব' এখন যেন পুরনো কথা। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস একবিংশ শতাব্দীতে অচল।

ইউরোপ যেন বুঝেছে ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর সম্ভব নয়। তাই সবাই এখন একত্র হবার পথে হাঁটছে। অর্থাৎ ইউরোপীয় কমন মার্কেটে যোগ দিচ্ছে। ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে এখন একটি উদ্দেশ্য—কি করে 'এক ইউরোপ' গড়া যায়। ২০০২ সালের মধ্যেই গড়ার কথা ছিল।

চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬০ সাল থেকে। তখন দুই যুযুধান পক্ষ ফ্রান্স ও জার্মানি একত্র হয়ে 'এক ইউরোপ' গড়বার প্রতিজ্ঞা করে। আরম্ভ হয় 'কমন মার্কেটে'র চেষ্টা। তখন মাত্র ৬টি দেশ ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে যোগ দেয়। আর এই ছয়টি দেশ হল পঃ জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস আর লুক্সেমবার্গ। ব্রিটেন তখনও যোগ দেয়নি। যোগ দেয় ৭০ দশকে। তারপরে ক্রমশ কমন মার্কেটের প্রসার ঘটে। আরও কয়েকটি দেশ ২০০২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যোগ দেয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল ১৫টি। ২০০২ সালে আরও কয়েকটি দেশ যোগ দেয়। এখন সদস্য সংখ্যা ২৮টি। আজ যারা সদস্য হতে চায় তারা হল তুরস্ক, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, লিথুনিয়া, ল্যাটাভিয়া, সাইপ্রাস, মাল্টা, পোল্যান্ড, ইস্টোনিয়া, গ্রীস, হাঙ্গেরি, চেক রিপাবলিক, ইতালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, জার্মানি, স্লোভানিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন,

আয়ারল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ।

অবশ্য ২৮টি বলছি তবে সবাই এখনও পূর্ণ সদস্য হয়নি। ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে তারা আদৌ শেষ পর্যন্ত যাবে কিনা তাই নিয়ে দেশের মধ্যে নানান দ্বন্দ্ব। আপাতত ২৫টি সদস্য যারা আসতে খুব উৎসাহী। তিনটি দেশ নিয়ে এখনও গোলমাল। যা হোক আসল কথা এই যে, রাশিয়া ছাড়া বা রাশিয়া ভেঙে আরও যে কতকগুলি দেশ আছে তারা ছাড়া প্রায় সবাই এখন কমন মার্কেটে যোগ দিতে চায়। রাশিয়া এবং সুইজারল্যান্ড যোগ দিতে চায় না। অতএব কয়েকটি দেশ বাদ দিয়ে এখন ইউরোপ 'একত্র' হচ্ছে।

'একত্র' হবার মানে কি? মানে হচ্ছে এক পার্লামেন্ট তৈরি করা, যার হেড অফিস হবে বেলজিয়ামে। এক মুদ্রার প্রচলন করা, যার নাম 'ইউরো'। এক ফ্ল্যাগ বহন করা, যার নাম 'ইউরোপিয়ান ফ্ল্যাগ'। অর্থাৎ বর্তমান যেসব মুদ্রা প্রচলন আছে, যেমন ফ্রাঁ, মার্ক, পেসো, পাউন্ড, স্টারলিং ইত্যাদি উঠিয়ে দেওয়া। ইউরোপের এক দেশ অন্য দেশ যাওয়া সহজতর করা অর্থাৎ ভিসা তুলে দেওয়া। একই বাণিজ্য নীতি চালু করা এবং একই বিদেশী নীতি চালু করা। কাজগুলি অবশ্য সহজ নয়। যেমন ব্রিটেন যতখানি আমেরিকার বশংবদ, ফ্রান্স তা নয়। পোল্যান্ড যতখানি রাশিয়ার কাছাকাছি স্পেন বা পর্তুগাল তা নয়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, ইউরোপ কিছুদিন আগে পর্যন্ত দু'ভাগে অন্তত বিভক্ত ছিল। একটি ছিল পশ্চিম ইউরোপ বা পশ্চিমী দুনিয়া। যার নেতৃত্বে ছিল ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেন। আর অন্যটি পূর্ব ইউরোপ যারা সোভিয়েত রাশিয়ার কাছাকাছি। ইউরোপে যা পরিবর্তন হচ্ছে তা হচ্ছে 'একদা কমিউনিস্ট দেশগুলি' অর্থাৎ পোলান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া জাতীয় দেশগুলি এখন 'ইউরোপ' নামে 'ক্যাপিটালিস্ট ব্লকের' সদস্য হতে চায়। তাদের সদস্য করা উচিত কিনা তাই নিয়ে সহস্র প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসা। তবে বর্তমান রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও হাঙ্গেরি, পোলান্ড, রুমানিয়া, চেক রিপাবলিক এখন কমন মার্কেটে ঢুকতে চায় বা ঢুকে পড়েছে।

অর্থাৎ ইউরোপে যা ছিল ছ'টি দেশে সীমাবদ্ধ এখন অন্তত ২৫ থেকে ২৮টি দেশে তা ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপ এখন 'বৃহৎ' হচ্ছে। জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় মুদ্রা, জাতীয় রাষ্ট্রনীতি প্রায় উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ইউরোপের পরিবর্তন হচ্ছে। ইউরোপের পরিবর্তন মানে পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তন। এখন আমেরিকার হাতেই সব ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ডলার পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হচ্ছে ডলারের প্রতিযোগী এখন হবে 'ইউরো' অর্থাৎ আমেরিকার আর্থিক ক্ষমতা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হবে। আবার এও বলা হচ্ছে পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বিকেন্দ্রীকরণ হবে। একদিকে আমেরিকা

আর অন্যদিকে ইউরোপ। এছাড়া থাকবে রাশিয়া ও চীন। অর্থাৎ চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। ভারতের ভাগ্যও। ভারত এই অবস্থায় ঠিক কি নীতি নেবে তা অনিশ্চিত।

ভারত কি রাশিয়ার দিকে আরও ঝুঁকবে, না ভারত-চীন ও রাশিয়া মিলে ইউরোপ ও আমেরিকার মোকাবিলা করবে? রাশিয়া অবশ্য তাই চায়, চীন অতটা চায় না। চীন মনে করছে এশিয়ায় তার যেন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। ইউরোপের দেশগুলি 'একত্র' যদি সত্যি হয় তবে পৃথিবীব্যাপী এর প্রতিফলন হতে বাধ্য। একবিংশ শতাব্দী হবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তবে ইউরোপ এখনও 'একত্র' হতে পারেনি। চেষ্টা হচ্ছে। বাধা বিস্তর। যেমন ইউরোপের শাসনতন্ত্র বা কনস্টিটিউশন (Constitution) ঠিক কি ধরনের হবে? সেই নিয়ে ১৯৬০ সাল থেকে বিতর্ক আজকেও তা অব্যাহত আছে। ব্রিটেন যে ব্যবস্থা চাচ্ছে, জার্মানি তা চায় না। বর্তমানে ইউরোপে পার্লামেন্টের সদস্য ছোট-বড় সকল দেশেরই সমান। প্রত্যেক দেশেরই ভেটো (Veto) প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। সেইগুলি একত্রীকরণ করার পথে অন্তরায়।

যখন ২৫ থেকে ২৮টি সদস্য 'এক ইউরোপ' গড়ার চেষ্টা চলছে তখন কিন্তু কোনো শাসন পদ্ধতি বা কনস্টিটিউশন তেমন একটা তৈরি হয়নি। ইউরোপের 'ফেডারেল' পদ্ধতি কেমন হবে তাই নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে। আগেই বলা হয়েছে 'প্রায় ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা সব দেশেরই আছে। যেমন জার্মানি তার নিজস্ব মুদ্রা মার্ক উঠিয়ে দিয়ে 'ইউরো' গ্রহণ করেছে কিন্তু ব্রিটেন এখনও 'ইউরো' গ্রহণ করেনি। তাদের নিজস্ব মুদ্রা পাউন্ড-স্টারলিং এখনও আছে। ইউরোপের বৈদেশিক নীতি বিভিন্ন দেশে আলাদা। জার্মানিতে নির্বাচন হয়ে গেল। কে কত আমেরিকা-বিরোধী তাই নিয়ে নির্বাচন। ব্রিটেন অবশ্য আমেরিকার কথায় ওঠে এবং বসে। আয়ারল্যান্ড (Ireland) ছোট একটি দেশ। তবে নানান বিষয়ে ইউরোপের পার্লামেন্টের কথা মানছে না। ইউরোপের সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলিকে তারা নিজের দেশে রেফারেণ্ডাম করে নাকচ করে দিচ্ছে বা দিয়েছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ইউরোপিয়ান দেশগুলি ইউরোপের একত্রীকরণকে ঠাট্টা করে বলছে 'বড় লোকের ক্লাব'। গরিব দেশের কথা শুনতেই চায় না। ব্রিটেন বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৫তেই রাখতে চায়। নতুন সদস্য গ্রহণ করতে চায় না। আবার ফ্রান্স নতুন সদস্য গ্রহণের পক্ষপাতী। একত্রীকরণ মানে কি যে যার ইচ্ছামতো চলতে পারে?

এই অবস্থায় এই ডিসেম্বর ২০০২ সালে নতুন করে ইউরোপের ফেডারেল ব্যবস্থার জন্য কনস্টিটিউশন (Constitution) তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এই শাসন পদ্ধতির কোড নাম দেওয়া হয়েছে পেনিলোপী (Penelope)। পেনিলোপী বর্তমানে ড্রাফ্‌ট। আর এর রচয়িতা বর্তমানে ইউরোপিয়ান

ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট রোমানো প্রডি (Romano Prodi)।

তাঁর ড্রাফ্‌ট শাসন প্রণালী নিয়ে ইউরোপে তোলপাড়। কারণ অনেকগুলি।

১) তিনি ফেডারেল পদ্ধতিতে সংখ্যাধিক্য বা মেজোরিটির ওপর জোর দিচ্ছেন। যদি মেজোরিটি ভোটে কোনো সিদ্ধান্ত হয় তখন অন্য কোনো দেশ তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কেউ যদি মেজোরিটি ভোটকে অগ্রাহ্য করে তবে তাকে ইউনিয়ন থেকে বের করে দিতে হবে। বস্তুত এই তীর নিক্ষেপ ব্রিটেনের দিকে। ব্রিটেন মেজোরিটি ভোট না মেনে দেশে 'ইউরো'র বদলে তার নিজস্ব মুদ্রা পাউন্ড-স্টারলিং বজায় রেখেছে। ব্রিটেন চায় 'ভেটো' (Veto) আর অন্য দেশগুলি চায় মেজোরিটি ভোট (Mejority Vote)। বলা বাহুল্য এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

২) সমস্ত ইউরোপকে একই বৈদেশিক ও বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করতে হবে। কোনো দেশ আলাদা করে তার বৈদেশিক নীতি ঠিক করতে পারবে না।

৩) সমস্ত দেশগুলিতে ট্যাক্স রেট এক থাকতে হবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ট্যাক্স থাকতে পারবে না। এই বিষয়ে আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও ব্রিটেনের প্রবল আপত্তি।

৪) প্রত্যেক দেশের পুলিশ থাকবে তবে এর 'উপরে' থাকবে ইউরোপিয়ান পুলিশ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই ইউরোপিয়ান পুলিশ যে-কোনো দেশে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

৫) মিলিটারি নিয়ন্ত্রণ একত্রীকরণ করতে হবে। কোনো দেশের আলাদা মিলিটারি থাকতে পারবে না।

যদি কোনো দেশ এইসব শর্ত না মানে তবে তাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য একত্রীকরণের পথে বাধা বিস্তর। ৪০ বছর ধরে চেষ্টা চলছে। অনেক দেশ অপেক্ষা আর করতে চায় না। তারা চায় Majority Vote-এ সব সিদ্ধান্ত।

ইউরোপ এক হতে যাচ্ছে ঠিকই। তবে পথ সোজা নয়। নানান কন্টক। আসলে ইউরোপের অন্য দেশগুলি ব্রিটেনকে বাদ দিয়ে 'এক ইউরোপ' গড়তে চায়। এটা অবশ্য আমেরিকা চায় না। ব্রিটেন তাদের ট্রোজানের ঘোড়া অথবা Trojan Horse।

চেষ্টা চলছে তবে ইউরোপ ঠিক 'এক' হতে পারছে না। এটি ভারতের পক্ষে ভালো খবর না মন্দ খবর তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের দূরত্ব বাড়ছে

নানান কারণে আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। গত শরৎকালে ওয়ার্ল্ড সেন্টারে জেহাদি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ আর আমেরিকা কাছাকাছি চলে এসেছিল। পরস্পরের সন্দেহ, বিদ্বেষ, বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি ইত্যাদি কমে গিয়েছিল। গত ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে জার্মান চ্যান্সেলার জেরহার্ড শ্রোডার আমেরিকার সঙ্গে 'সীমাহীন বন্ধুত্ব' প্রকাশ করেছিল। ফ্রান্সের বামপন্থী পত্রিকা লে মনদ্ (Lc Monde) খুব উচ্ছ্বাস করে বলেছিল—'আমরা এখন সবাই আমেরিকান'। আর ব্রিটেনের কথা বাদ দেওয়াই যাক—আমেরিকার বশংবদ। আমেরিকা যাই করে আনন্দে আত্মহারা। গত ১১ সেপ্টেম্বর তাই ছিল।

মাত্র এক বছরে অবস্থার পরিবর্তন দ্রুত হয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর শ্রোডার জানোভারে এক বক্তৃতায় ৫ আগস্ট আমেরিকার বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করেন। ভাষাটা এমনই যে লোকে বলবে অশ্লীল গালাগাল। গালাগালের অংশটুকু বাদ দিয়ে ৫ আগস্ট তিনি বিশ্বকে বিশেষত ইউরোপকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন—'আমেরিকা এখন অন্য কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না। নিজেরা একটা নীতি ঠিক করে বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয়। আশা করে তারা যা বলবে সবাইকে তাই মানতে হবে। না করলেই আক্রমণের ভয় দেখায়। বর্তমানে ইরাককে আক্রমণের কোনো কারণ নেই। তবুও নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য ইরাককে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।' শ্রোডার বলেছেন, ইরাককে আমরিকা আক্রমণ করলে জার্মানি তাকে কোনোরকম সাহায্য করবে ন্যা। ফ্রান্স আরও বেশি দূর এগিয়ে গিয়েছে। ব্রিটেনকে কটাক্ষ করে লে মনদ্ লিখেছে—'আমেরিকা কি মনে করে যে পৃথিবীশুদ্ধ তার পোষা কুকুর। ইউরোপের কোনো কোনো দেশ পোষা কুকুরের মতো ব্যবহার করতে পারে তবে আমেরিকা কখনই ইউরোপকে কুকুর বানাতে পারবে না। যত আমেরিকা অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করতে যাবে তত বেশি আমেরিকার সঙ্গে

ইউরোপের ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে। যে সব লোকেরা বুশ প্রশাসনকে ঘিরে বসে আছে তারা তাদের নাকের বাইরে বেশি দূর দেখতে চায় না। গায়ের জোরে পৃথিবী চালানো যায় না। আমেরিকা বর্তমানে নীতিহীনতাকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা কেনই বা ওঠে। এই বিষয়ে ফ্রান্স বা ইউরোপ কোনো সাহায্য আমেরিকাকে করবে না।'

আর সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে 'পোষা কুকুরে'র অর্থাৎ ব্রিটেনের। প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ার বুশের রূপে-গুণে আত্মহারা। ইউরোপের কাগজপত্রগুলি টনি ব্লেয়ারকে দেখাচ্ছে আমেরিকার 'মাইনা করা ভৃত্য' হিসেবে। অসংখ্য কার্টুন এই বিষয়ে। তবে ব্লেয়ার যা বলবে তাই হবে তাও সত্য নয়। ইরাককে আক্রমণ করা নিয়ে নানান আপত্তি দেশের মধ্যে। ব্রিটেনের নীরব ইনটেলেকচুয়ালরা জানতে চায় আমেরিকা কি কারণে ইরাককে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। কান্টারবারির আর্চ বিশপ জোরালো ভাষায় আমেরিকার যুদ্ধ প্রস্তুতিকে গালাগাল দিয়েছেন। আর এই যুদ্ধে ব্লেয়ার কেন সাহায্য করছে আর্চ বিশপ জানতে চেয়েছেন। আর্চ বিশপের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ব্রিটেনের প্রাক্তন সামরিক জেনারেলরা। পেছনের সারিতে বসে থাকা এম পি-দের প্রচণ্ড আপত্তি। একদল লেবার পার্টির সদস্য ব্লেয়ারের পদত্যাগ দাবি করছে। ব্রিটেনের একটি টিভি চ্যানেল ভোট নিয়ে দেখেছে যে ব্রিটেনের অধিকাংশ লোকই ব্লেয়ারের নীতির বিরুদ্ধে।

অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা আমেরিকা আর ইউরোপকে একই ভাবে প্রভাবিত করছে না। আমেরিকা ইরাককে আক্রমণ করতে চায়। ইউরোপীয়ান দেশগুলি চায় না।

শুধু ইরাক-নীতিতে আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের বিবাদ তাও সত্য নয়। নানান বিষয়ে এখন আমেরিকা ও ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। পার্থক্য প্যালেস্তাইন নিয়ে। ইউরোপ বলতে চায় যে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র তৈরি না করে ইরাক আক্রমণ করতে গেলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। তাছাড়া আমেরিকা তিনটি রাষ্ট্রে পরিবর্তন চাইছে। প্রথমটি ইরাক। দ্বিতীয়টি ইরান। আর বর্তমানে তৃতীয় রাষ্ট্র সৌদি আরব। আমেরিকা এই তিনটি রাষ্ট্রে ক্ষমতার শীর্ষে নিজস্ব লোক বসাতে চায়। ইউরোপের ধারণা জোর করে রাষ্ট্রনায়ক পরিবর্তন করতে চাওয়া এক ধরনের 'গুণ্ডামি'। জার্মানরা বলতে শুরু করেছে ইরাকের সাদ্দাম থেকেও বড় বিপদ আমেরিকার গুণ্ডামি।

আমেরিকার সঙ্গে বিবাদ ইউরোপের নতুন নয়। তবে ইউরোপ বলতে চাচ্ছে যে আমেরিকাই একমাত্র 'সব শক্তির উৎস' হতে চায়। ইউরোপকে দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই বলেই ব্যবহার করছে। কারণ আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট দুটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছে, তার প্রধান বক্তব্য ইউরোপ

ভয়ানকভাবে 'ইহুদি বিদ্বেষী' তাই ইজরায়েল নিয়ে ইউরোপের কথা শোনার অর্থ নেই। আর দ্বিতীয়ত, আমেরিকা কখনই যেন ইউরোপীয়ানদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আছে তা স্বীকার না করে। হিটলার, মুসোলিনি বা স্টালিন ইউরোপেই আবির্ভূত হয়েছিল শুধু Appcasement নীতির জন্য। ইউরোপ বর্তমানে দুর্বল অতএব ইউরোপের কথা শোনার মানেই হয় না আমেরিকার।

অনেক লেখক বলতে চাইছেন পৃথিবী সম্পর্কে ইউরোপ আর আমেরিকার 'মূল্যবোধের' পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ কলোনি হারিয়ে দিশেহারা। পৃথিবীতে এখন নিজস্ব কোনো দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে পৃথিবীতে ইউরোপ শান্তিতে বাস করতে চায়। আইনের শাসন চায়। আর উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের সহযোগিতা চায়। আর আমেরিকা বৃহৎ। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের 'সুপারপাওয়ার' ভাবতে ভাবতে 'একমাত্র পাওয়ার' হিসেবে ভাবছে। একমাত্র পাওয়ার হতে গেলে সামরিক দিক থেকে বলবান হতে হবে। আর আমেরিকা ভাবতে আরম্ভ করেছে অন্য সব দেশের সার্বভৌমত্ব আপেক্ষিক—যতটা আমেরিকা দেয়। আর পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও উদারনীতি সবটাই নির্ভরশীল আমেরিকার স্থায়িত্বের ওপর। আমেরিকার স্থায়িত্বই পৃথিবীতে এখন বড় কথা। অতএব সব সমাধান আমেরিকা এখন যুদ্ধ মারফত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমেরিকার স্থায়িত্ব মানেই পৃথিবীর শান্তি—এই নীতির নাম অনেক তবে মাঝে মাঝে এটাকে 'কাগান ডকট্রিন (Kagan Doctrine) বলা হচ্ছে। এই নীতির মূল কথা—ইউরোপ এতই দুর্বল যে স্থায়িত্বর জন্য আমেরিকার ইউরোপের দরকার নেই। কিন্তু উল্টোটা সত্যি নয়। 'ইউরোপ এতই দুর্বল যে ইউরোপের স্থায়িত্বর জন্য আমেরিকার প্রয়োজন।' সামরিক দিক থেকে আমেরিকার ইউরোপের কোনো সাহায্যের দরকার নেই। আমেরিকার কাছে ইউরোপের আর কোনো 'প্রাসঙ্গিকতা' নেই। আমেরিকা আশা করে ক্ষমতার পেন্ডুলাম বর্তমানে এশিয়ার দিকে যাচ্ছে। তাই ইউরোপ যদি বাঁচতে চায় তবে আমেরিকার আনুকূল্যেই বাঁচতে হবে আর আমেরিকার এশীয় নীতিকে সাহায্য করে যেতে হবে। সে সাহায্য প্যালেস্তাইনেই হোক, ইরাকে হোক বা অন্যত্র। এটিকে বলা হচ্ছে হাস ডকট্রিন (Hass Doctrine)। হাস ডকট্রিনের মূল কথা, ইউরোপকে বাঁচতে গেলে 'প্রায় আমেরিকার কাছে সমর্পণ' করেই বাঁচতে হবে।

এই নীতিতে ইউরোপ বর্তমানে ক্ষুব্ধ। আর ক্ষুব্ধ যখন আমেরিকা পৃথিবীর সব নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে W.T.O.-র নীতিকে পরোয়া না করে লৌহ এবং অনেক শিল্পের উপর আমদানি শুল্ক বসাল। লৌহ শিল্পের উপর আমদানি শুল্ক আমেরিকা একতরফা ভাবেই বসাল। আর সবচেয়ে ক্ষতি হল ইউরোপের। ইউরোপ খুব চিৎকার করে প্রতিশোধ নেবার

চেষ্টা করল কিন্তু বিশেষ কিছু করতে পারল না। যত চিৎকার করল তত কাজের কাজ হল না।

ইউরোপ চিৎকার করছে যে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলে তেলের দাম বেড়ে যাবে ফলে ইউরোপের শিল্প মার খাবে। আমেরিকার উত্তর তেলের দাম কমানোর জন্যই ইরাক, ইরান আর সৌদি আরবে ক্ষমতার 'দখল' দরকার। ইউরোপ বলছে যে আমেরিকার নীতির কোনো 'নৈতিকতা' নেই— আমেরিকার উত্তর যে আমেরিকার 'স্থায়িত্বের' জন্য সব নীতিই 'নৈতিক'।

ইউরোপ ভেবেছিল যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন বৃহৎ হলে আমেরিকার আধিপত্য খর্ব করা যাবে। কিন্তু 'ইউনিয়ন' ঠিক তেমনভাবে হল না। ব্রিটেন আর অন্য অনেক দেশ 'ইউরো' মুদ্রা গ্রহণ করল না। ইউরোপের মধ্যেই প্রবল বিবাদ ও বিচ্ছেদ।

আমেরিকা বর্তমানে মনে করছে আমেরিকার 'স্থায়িত্ব' মানে পৃথিবীর 'স্থায়িত্ব'। ইউরোপ শুনছে কিন্তু গিলতে পারছে না। ইউরোপ সামগ্রিকভাবে আমেরিকার সমকক্ষ নয়, এককভাবে তো নয়ই। এই সরল সত্য ইউরোপ বুঝেও বুঝছে না। তাই আপাতত আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। অনেকের ধারণা 'দূরত্ব' যত বাড়বে তত অনুন্নত দেশের সুবিধা। 'Divide and Rule' ইউরোপই চালু করেছিল। এখন অনুন্নত দেশগুলি এই তত্ত্বের প্রয়োগ যদি ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে করতে পারে তবে পৃথিবীর চেহারাটা পাল্টিয়ে যাবে।

আমেরিকা ও ইউরোপের বাণিজ্য যুদ্ধ

রাজনীতিবিদরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না। প্রেসিডেন্ট বুশ এর ব্যতিক্রম নন। সবারই জানা যে বুশ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন খুব অল্প ভোটের মার্জিনে। অবশ্য অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে আদৌ তিনি জিতেছিলেন কিনা। কিংবা সবটাই কারসাজি।

যা হোক নির্বাচনের আগে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লৌহ শিল্পের কর্মীদের। যদি তিনি জেতেন তবে লৌহ শিল্পে তিনি উদারনীতি গ্রহণ করবেন না। লৌহ শিল্পে মুক্ত বাণিজ্য হবে না এবং লৌহ শিল্পে 'প্রোটেকশন' বা রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ বিদেশী লৌহ তিনি আমেরিকায় ঢুকতে দেবেন না। তার জন্য যা যা করা দরকার তিনি তাই করবেন।

আমেরিকার লৌহ শিল্প মুক্ত বাণিজ্যের যুগে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। জাপান ও ইউরোপের লৌহ সস্তা। অতএব আমেরিকার শিল্পপতিরা লৌহ জাপান এবং ইউরোপ থেকে আমদানি আরম্ভ করল। যত বিদেশী আমদানি বাড়ে তত লৌহ শিল্পের শ্রমিকদের দুর্দশা। লৌহ শিল্প বন্ধ হবার উপক্রম। লৌহ শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত মেশিন শিল্প। তাও ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল। আমেরিকার রমরমা অনেকটাই এই দুই শিল্পের উৎকর্ষতায়। এই দুই শিল্প যদি ধ্বংস হয় তবে আমেরিকার আধিপত্য কমে যেতে বাধ্য। বুশও লৌহ ও মেশিন শিল্পের শ্রমিকদের বিরাগভাজন হতে চান না।

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার কথাই ধরা যাক। এই রাজ্যটি গত ২০ বছর ধরে ডেমোক্রাটদের ভোটে জিতিয়ে এসেছে। আর এই রাজ্যে বেশ কয়েকটি ভারী লৌহ শিল্প ও মেশিন শিল্প। ভোটের আগে বুশ এই স্টিল বা লৌহ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যদি তিনি প্রেসিডেন্ট হন তবে বিদেশী লৌহ আমদানি বন্ধ করবেন। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া যেটি ডেমোক্রাটদের রাজ্য বলে খ্যাত, তারা রিপাবলিকান বুশকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে দিল। এই ধরনের আরও কয়েকটি রাজ্য যেগুলি ডেমোক্রাটদের জিতিয়ে এসেছিল

তারাও বুশকে ভোটে জিতিয়ে দিল। খুব অল্প ভোটে অবশেষে বুশ জয়ী হলেন। প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি যে লৌহ শিল্পের কর্মীদের দাবি মানতে ইচ্ছুক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশেষে লৌহ শিল্পে ধর্মঘট। আর বুশও ঘোষণা করলেন যে স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোটেকশন নীতি গ্রহণ করবেন। বিদেশী আমদানি সব বন্ধ করার জন্য এক লাফে ৪০% (চল্লিশ) আমদানি শুল্ক বসিয়ে দিলেন। টেরিফ রেট এতটাই বেড়ে গেল যে ইউরোপ ও জাপান থেকে আমদানি কমে গেল। শুধু ইউরোপ ও জাপান নয়, পৃথিবীর সব দেশই এই আমদানি শুল্কের কল্যাণে আমেরিকায় রপ্তানি করতে পারছে না। সব দেশ আমেরিকার এই নীতিতে আপত্তি তুলছে। কিন্তু আমেরিকা মুখে 'মুক্ত বাণিজ্যে'র কথা বললেও নিজের দেশে প্রেসিডেন্ট তাঁর শিল্পকে প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করতে চান। অর্থাৎ লৌহ শিল্পকে আমেরিকা প্রোটেকশন দিল।

এই নীতি W.T.O.-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন ইউরোপ করতে আরম্ভ করল। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন বলল যে, আমেরিকা একতরফা ভাবে প্রোটেকশন নীতি গ্রহণ করতে পারে না। আমেরিকা উত্তর দিল তার দেশের জনসাধারণের 'জীবনযাত্রার মান' ঠিক রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট প্রোটেকশন নীতি গ্রহণ করেছেন। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন উত্তর দিল, 'জীবনযাত্রার মান' ঠিক রাখা W.T.O.-র উদ্দেশ্য নয়। মুক্ত বাণিজ্যই উদ্দেশ্য। অতএব ৪০ শতাংশ টেরিফ আরোপ করা বেআইনি। আমেরিকা এখন মনে করে নিজেকে সুপার পাওয়ার। অতএব উত্তর দিল যে, আমেরিকা তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য যে কোনো নীতি গ্রহণ করতে পারে। আমেরিকা যা করবে ইউরোপকে তা গ্রহণ করতে হবে। প্রচ্ছন্নভাবে আমেরিকা ইউরোপকে বুঝিয়ে দিল যে আমেরিকা সদয় হলে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন টিকবে, না হলে টিকবে না। ইউরোপ সর্বক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইউরোপ হঠাৎ খেপে গেল। তারা একযোগে আমেরিকার কাছে ২.৪ বিলিয়ন ডলার কমপেনসেশন চাইল। ২.৪ বিলিয়ন ডলার নাকি ইউরোপের ক্ষতি এই লৌহ শিল্পে আমেরিকার শুল্ক বসার জন্য। জাপানও 'ক্ষতিপূরণ' চাইল। আমেরিকা এই ক্ষতিপূরণ দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। ইউরোপ তখন বলল যে আমেরিকার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য ইউরোপ কেন ক্ষতি স্বীকার করবে। আমেরিকার আবার উত্তর যে একটি মাত্র সুপার পাওয়ার বর্তমানে আছে তা আমেরিকা। আর আমেরিকার কল্যাণেই পৃথিবীর কল্যাণ। ইউরোপ টিঁকে আছে আমেরিকার বদান্যতার ওপর। অতএব এই ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

ইউরোপ আমেরিকার এই কথা শুনল না। তারাও শঠে শাঠ্যং নীতি হিসেবে আমেরিকা থেকে আগত খাদ্যদ্রব্য, ফল আর অনেক জিনিসের উপর

আমদানি শুল্ক বসিয়ে দিল বা তার চেষ্টা করছে। আমেরিকাও তার প্রতিশোধ স্বরূপ ইউরোপের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবার হুমকি দিল।

অর্থাৎ আমরা যাকে বলি 'বাণিজ্য যুদ্ধ' তা পুরোপুরি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ঘটনাটা এখনও ঘটছে। তাই শেষে কি হল, কে হারল বা কে জিতল তা সম্পূর্ণ বলা যাচ্ছে না।

আমেরিকার লৌহ শিল্পের উপর আমদানি শুল্ক বসানো, ইউরোপের প্রতিশোধ আবার আমেরিকার প্রতিশোধ ইত্যাদিতে একটা সমস্যা পৃথিবীতে আলোকিত হচ্ছে যে আমেরিকা সুপার পাওয়ার অতএব তার যা ইচ্ছা তা করার অধিকার আছে. কথাটির মর্মার্থ কি? সুপার পাওয়ার কথাটির মানে কি? আমেরিকা চাকরি বাঁচানোর জন্য তার শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাবার জন্য 'শুল্ক' কমিয়ে 'মুক্ত বাণিজ্য' প্রায় শেষ করে দিতে পারে, W.T.O.-কে অমান্য করতে পারে কিন্তু অন্য দেশ তা পারবে না। ভারতবর্ষ তা পারবে না। এটাই কি সুপার পাওয়ারের সংজ্ঞা?

আমেরিকা অবশ্যই সুপার পাওয়ার এবং অন্যরা বিশ্বাস না করলেও প্রতিদিন আমেরিকান সরকার তার অধিবাসীদের এই তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করছে। যেমন আমেরিকার মিলিটারি বাবদ যা খরচ তা ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান, ইতালি এবং চীনের যুগ্ম খরচ থেকে প্রায় দ্বিগুণ। আমেরিকা পৃথিবীর ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং তার মিলিত উৎপাদন জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ও চীনের যুগ্ম উৎপাদন থেকে বেশি। চীনের বর্তমান উন্নতির হার ৬ শতাংশ আর আমেরিকার ২ শতাংশ। তথাপি আমেরিকার বর্তমান যা জীবনযাত্রার মান তাতে পৌঁছাতে চীনের আরও অন্তত পঞ্চাশ বছর লাগবে।

তবুও প্রশ্ন উঠেছে, আমেরিকা মিলিটারিতে সুপার পাওয়ার হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনাম থেকে আরম্ভ করে আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ জেতেনি। অর্থাৎ মিলিটারি খরচ বাড়ালেই যুদ্ধে জেতা যায় এটা কেউ বিশ্বাস করে না। তবে সুপার পাওয়ার কথাটির মানে কি?

সুপার পাওয়ার কথাটির আলোচনা এখন তিনটি স্তরে হচ্ছে। প্রথম স্তর অবশ্যই মিলিটারি। এখানে আমেরিকা সব দেশ থেকে এগিয়ে আছে। আমেরিকা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় মুহূর্তে তার মিসাইলযুক্ত বোমা পাঠাতে পারে। অন্য দেশগুলি ঠিক তা পারে না।

দ্বিতীয় স্তরের আলোচনা হচ্ছে অর্থনীতি নিয়ে। এখানে পৃথিবী কি সম্পূর্ণ আমেরিকার মুখাপেক্ষী? পৃথিবী কি ইউনিপোলার? এখানেই বিতর্ক। বলা হচ্ছে কোনো দেশই অর্থনীতিতে 'একা চলো নীতি' গ্রহণ করতে পারবে না। আমেরিকাকে অন্তত পেট্রোল নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান আপাতত বিশ্ববাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। চীনও

দ্রুত এগিয়ে আসছে। হতে পারে রাশিয়া-ভারত-চীন বিরাট এক বাজার পৃথিবীতে তৈরি করবে। আর এই বাজারে প্রবেশাধিকার নিয়ে আমেরিকা অনেক কাকুতি-মিনতি করতে পারে। অর্থাৎ অর্থনীতি সম্পূর্ণ ইউনিপোলার নয়, মালটিপোলার বা বহুকেন্দ্রিক।

তৃতীয় স্তরের আলোচনা ব্যাঙ্কিং থেকে আরম্ভ করে কালচার পর্যন্ত। আমেরিকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন সব ব্যাঙ্ক আছে যাদের ইলেকট্রনিক টাকা ট্রান্সফার এক একটি বিরাট দেশের বাজেটের থেকে বেশি। আর পৃথিবীর এইসব ব্যাঙ্ক যে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে তা কেউ বিশ্বাস করে না। কালচারও আজকাল বহুকেন্দ্রিক। আমেরিকা পৃথিবীর কালচার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করে না।

অর্থাৎ আমেরিকার কথাই শেষ কথা এটা সত্য না হতেও পারে। যেমন আমেরিকার আপত্তি সত্ত্বেও ল্যান্ডমাইন ট্রিটি ১৯৯০ সালে গ্রহণ করা হয়। কিয়োটো কনভেনশন আমেরিকা গ্রহণ না করায় পৃথিবীব্যাপী সমালোচনা। বায়ো-ডাইভারসিটি কনভেনশনে আমেরিকা দস্তখত না করলেও আরও পঞ্চাশটি দেশ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আমেরিকা যা বলবে তাই হবে তা কিন্তু হচ্ছে না।

মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলে লৌহ শিল্পে আমদানি শুল্ক বসানো পৃথিবী মাথা নিচু করে গ্রহণ করবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং বাণিজ্য যুদ্ধ আমেরিকা ও ইউরোপে জমে উঠেছে। টেরিফ-কাউন্টার-টেরিফ, কাউন্টার-কাউন্টার-টেরিফ ইত্যাদিতে বাণিজ্য মহল সরগরম। সবারই ধারণা আমেরিকা সুপার পাওয়ার হওয়া সত্ত্বেও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

নয়া ক্যাপিটালিজম্-এর আলোকে অনুন্নত দেশের সার্বভৌমত্ব

দিল্লির মসনদ নিয়ে যখন যুযুধান ও বিবদমান নানান পক্ষের মধ্যে মারামারি তখন আনক্টাডের (UNCTAD) ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট বেরিয়েছে। এই রিপোর্ট নিয়ে উন্নত ও অনুন্নত দেশে এক আত্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়েছে। এই আত্মজিজ্ঞাসার দু'টি স্বরূপ। একটির আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি অনুন্নত দেশ কতখানি স্বাধীন ও সার্বভৌম। আর দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় হচ্ছে নব্বুই দশকে যে ধরনের ক্যাপিটালিজমের আরম্ভ হয়েছে তা কদিন বা কত বছর টিকতে পারে। ক্যাপিটালিজম কি অবিনশ্বর!

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের শুনতে হচ্ছে যে পৃথিবীতে যে আর্থ-সমাজ ব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছে তাতে কারোর পক্ষে সার্বভৌম থাকা প্রায় অসম্ভব। তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থা। আর বহুজাতিক সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী এখন দেশের আইন পরিবর্তন করা হচ্ছে। দেশের সার্বভৌম আজ বিপন্ন।

আনক্টাডের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৪০,০০০ বহুজাতিক সংস্থা। আর পৃথিবীব্যাপী এদের বিনিয়োগ গত কয়েক বছরে প্রায় ৫০০০ বিলিয়ন ডলার। আর এই বিনিয়োগের মুনাফার স্বার্থে তারা বিভিন্ন দেশকে বাধ্য করছে আইনের পরিবর্তন করার জন্য। আইন প্রায় প্রত্যেক দেশেই এমনভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে যাতে তাদের স্বার্থ বা মিলিত বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা যেন কোনো অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

৫০০০ বিলিয়ন ডলার বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করে তারা এখন আমদানি-রপ্তানি বিষয়ে নিজেদের সুবিধামতো আইন পাশ করছে। আর অনুন্নত দেশগুলি এতই দুর্বল যে বহুজাতিক সংস্থার অর্থের চাপে ও বিনিয়োগের প্রলোভনে তারা দেশের আইন পরিবর্তন করেই যাচ্ছে।

অনুন্নত দেশগুলি শুধু দুর্বল তাই নয়, তারা অসংঘটিত। দশটি প্রথম সারির বহুজাতিক সংস্থার বাৎসরিক মুনাফা প্রায় ৮০টি অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের থেকে বেশি। রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমশ এই বহুজাতিক সংস্থার হাতেই চলে যাচ্ছে। এরাই দেশকে বিদেশী মুদ্রা দিচ্ছে। অতএব এদের কথামতোই অনুন্নত দেশগুলি চলছে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা 'স্বাধীনতার' পঞ্চাশ বৎসর পালন করতে যাচ্ছি। অথচ এখন পরিষ্কার, বিদেশীদের চাপে আমরা অর্থনীতি একটার পর একটা পাল্টাচ্ছি। কিছু নমুনামূলক উদাহরণ দেওয়া যাক। তাতে আমাদের সার্বভৌম কথাটির মানেটা অস্পষ্ট।

১) ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট বিদেশীদের যাতে বজায় থাকে তার জন্য আমরা দেশীয় পেটেন্ট (Patent) আইনের পরিবর্তন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বিদেশীদের কাছে পরিবর্তনের জন্য সময় চেয়েছি। আর বিদেশীরা দয়াপরবশ হয়ে সেই সময় দিয়েছে। কথা ছিল এই পার্লামেন্টে এই পরিবর্তন করা হবে। ডামাডোলের বাজারে তা করা হয়নি।

২) বিদেশীরা যাতে জাতীয় শিল্পকে কুক্ষিগত না করতে পারে তার জন্য আমরা আইন করেছিলাম যে বিদেশী সংস্থার ইক্যুইটি শেয়ার কখনও যেন ৪৯ শতাংশের বেশি না হয়। সবার অলক্ষ্যে বিদেশীদের চাপে আমরা এই আইনের নানা পরিবর্তন করেছি। এখন বিদেশী সংস্থা ৭০ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ার কিনতে পারে। অর্থাৎ জাতীয় শিল্পগুলি এখন বিদেশীদের হাতে চলে গেলে আশ্চর্যের কিছু নেই। যেমন ব্রাজিলে হচ্ছে বা হয়েছে।

৩) আমরা বলেছিলাম ব্যাঙ্ক ও ইন্স্যুরেন্সে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। জাতীয়করণ করার পর এই আশ্বাসই দেওয়া হয়েছিল। এখন সরকারি নানা ব্যাঙ্ক বেসরকারি করার প্রচেষ্টা চলছে এবং তা বিদেশীদের চাপের জন্য। এমন দিন হয়তো আসবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার বিদেশীদের হাতেই থাকবে। অর্থাৎ ডিপোজিটের নিয়ন্ত্রণ বিদেশীদের হাতে চলে যাবে। তা ছাড়া আরও ২০টির বেশি বিদেশী ব্যাঙ্ক ভারতে আসতে চায়। আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার জন্য অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। শুধু ক্যাবিনেট এখনও অনুমতি দেয়নি। তবে চাপ আসলেই দিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

৪) কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং চীন যা করেনি, আমরা গত কয়েক বছর ধরে তা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে পরিষেবা ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল, টেলিফোন, রাস্তা ইত্যাদিতে আমরা বিদেশী বিনিয়োগ চাচ্ছি। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা ক্রমাগত সরকারি বিনিয়োগ কমিয়ে যাচ্ছি। অথচ বিদেশী সংস্থাগুলো গত কয়েক বছর বিস্তর কথা বলা সত্ত্বেও এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও উৎপাদন করেনি। তারা কয়েক বছরের মধ্যে করতে বলছে। ফলে চতুর্দিকে বিদ্যুতের ঘাটতি। সরকারি বিনিয়োগ ক্রমাগত

কমানো হচ্ছে অথচ বিদেশীরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে না। তারা উৎপাদন করলেও বন্টন ব্যবস্থায় যাবে না। ফলে চতুর্দিকে এক অরাজকতা। ফলে শিল্প ও কৃষির উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে বিশ্বের অর্থনীতিতে এখন বহুজাতিক সংস্থার কাছে নত হয়ে একটার পর একটা দেশ তাদের আইনের পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের 'প্রতিযোগিতা' কথাটির অর্থ অনুন্নত দেশে তারা বিনা বাধায় ঢুকবে কিন্তু নিজেদের দেশে তারা অনুন্নত দেশগুলিকে ঢুকতে দেবে না। আর এর জন্য সিঙ্গাপুরে গত W.T.O-এর মিটিং-এ তারা অনুন্নত দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে MAI (বা মালটিলেটারেল এগ্রিমেন্ট অন ইনভেস্টমেন্ট) চুক্তি যাতে গ্রহণ করে। এর অর্থ দুইটি। (এক) বিশ্ব বহুজাতিক সংস্থার উপর কোনো কোড অব কন্ডাক্ট কোনো দেশ এককভাবে প্রয়োগ করতে পারবে না। (দুই) বিশ্বে সব দেশেই এক আইন থাকবে যাতে বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিনা বাধায় বিনিয়োগ করে মুনাফা নিয়ে যেতে পারে। 'সব দেশ' কথাটি এখানে আপেক্ষিক—এর মানে অনুন্নত দেশ।

এই ধরনের ক্যাপিটালিজমের অর্থ একটাই। এদের লক্ষ্য বাজার দখল করা এবং এই বাজার দখল করা প্রতিযোগিতায় তারা সর্বত্রই বেকারি সৃষ্টি করে যাবে।

পৃথিবীব্যাপী বেকারি এখন আকাশচুম্বী। উদারীকরণ করার পর চাকরি সৃষ্টি দূরের কথা ক্রমাগত বেকারি সৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে, তার কারণ 'বেকারি দূরীকরণ' আজ অনুন্নত দেশের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য একটাই—দেশে বিদেশীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়া সৃষ্টি করা। এই 'নয়া ক্যাপিটালিজমে' দেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই পরিবর্তন হয়ে গেছে। যারা 'বামপন্থী' তারাও ছলে-বলে-কৌশলে এই 'নয়া ক্যাপিটালিজমে'র গুণগান গাইছে। এটা ফ্রান্সে যেমন সত্য আবার সত্য পশ্চিমবঙ্গে। 'বামপন্থী' ও 'ডানপন্থী'দের বিভেদ ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে। 'বেকারিতত্ত্ব' নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না কেউই। ভারতবর্ষে নাকি এমন অবস্থা আসছে সব নতুন B.A., B.Sc., M.A. এবং M.Sc-রা কিছুদিনের মধ্যে আর কোনো চাকরিই পাবে না। চাকরি এখন কোথাও নেই। বরং তীব্র বেকারি সর্বত্র।

বেকারি যে কত তীব্র তা বোঝাবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে আর বিদেশী কাগজে তা ফলাও করে বেরিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রেলের একজন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী কিছুদিনের মধ্যে অবসর গ্রহণ করবেন। তার ছেলে চাকরির চেষ্টা করে হন্যে হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি শুনেছিল বাবার যদি মৃত্যু হয় তবে রেল দপ্তর অনেক সময় দয়া দেখিয়ে ছেলেকে চাকরি দেয়। ছেলেটি গুণ্ডা ভাড়া করল। গুণ্ডাদের সবশুদ্ধ ১০ হাজার টাকা দিয়ে বাবাকে হত্যা করল। কিন্তু পুলিশ হত্যাকারী গুণ্ডাদের

ধরল। তারা ছেলেটির কথা বলে দিল আর ছেলেটিও স্বীকার করল যে চাকরির জন্য বাবাকে সে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করেছে। এটা ট্র্যাজেডি, না ভয়ঙ্কর ঘটনা। যে যে ভাবে দেখে।

আসলে এই 'নয়া ক্যাপিটালিজম্' চাকরি সৃষ্টি করতে পারছে না। তাই এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন দু'জন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী। এঁদের একজনের নাম মহম্মদ আসিফ আর অন্যজন ইমান্যুয়েল ভেলারস্টাইন।

এঁদের মত হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ। আর বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্যাপিটালিজম এসেছে আন্তর্জাতিকতার হাত ধরে। এই 'আন্তর্জাতিকতা' অনেকটাই মেকি। আসলে Globalisation of Sovereignty করা হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু জাতি ও দেশের স্বার্থে। এই বিশ্বজনীনতা আসলে একটি ছল।

এখন বিশ্বজনীনতার অর্থ মহাকৌশলী বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে প্রশ্রয়। যত ওদের জোর বাড়বে, তত বেশি বেকারি সৃষ্টি হবে। বেকারির সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তাও ক্রমশ কমবে।

এই অবস্থায় দুর্বল দেশগুলিতে এক নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদ উদ্ভব হবে। এই জাতীয়তাবাদ কিছুটা রক্ষণশীল মৌলবাদী হতে বাধ্য। মৌলবাদী হবে এই জন্যই যে, যত লোকের অভাব বাড়বে তত বেশি উগ্র হতে বাধ্য। এখন একটা দ্বন্দ্ব হবে। সেটা হবে তথাকথিত বিশ্বজনীন আদর্শের সঙ্গে মৌলবাদী রক্ষণশীল পেছনে হাঁটার আদর্শের সঙ্গে। দেশে দেশে এখন ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বাড়বে। অর্থাৎ লোকেরা যত সাম্প্রদায়িক হবে তত বেশি 'নয়া ক্যাপিটালিজমে'র দ্বন্দ্ব প্রকট হবে।

এর ফল কি হবে? এই দুই দার্শনিকের মতো চতুর্দিকে নানা সহিংস আন্দোলন আরম্ভ হবে। এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হবে। আর এই দ্বন্দ্বর জন্যই বিংশ শতাব্দীর নয়া ক্যাপিটালিজম্ ধ্বংস হবেই। কি আসবে তাঁরা জানেন না। মানুষ তাদের প্রয়োজনেই ইতিহাস সৃষ্টি করবে। আগের থেকে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

ওয়াশিংটন কনসেনসাস ও বেসরকারিকরণ

পৃথিবীব্যাপী পত্রপত্রিকায় এখন অনেক তর্কবিতর্ক বিশেষত ভারতের বেসরকারিকরণ নীতি নিয়ে বিশ্বের নানান জায়গায় আলোচনা ও আলোড়ন। আলোচনার সূত্রপাত উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করছে তাই নিয়ে।

ভারতবর্ষ যেই তেল কোম্পানি এইচ পি সি এল ও বি পি সি এল বেসরকারিকরণ পিছিয়ে দিল অমনি আমেরিকার ও পাশ্চাত্য দেশের একটি সংস্থা নাম স্টানডার অ্যান্ড পুওর (Standard and Poor) ভারতবর্ষকে চিহ্নিত করল Junk রাষ্ট্র হিসেবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ এখন অস্পৃশ্য দেশ এবং অন্য দেশ যেন ভারতকে ঋণ না দেয় এবং ভারতবর্ষে বিনিয়োগ না করে। S & P সংস্থাটি খুবই ক্ষমতাশালী। তারা বিশ্বের দেশগুলিকে 'রেটিং' করে। 'রেটিং' মানে কোন্ দেশে বিনিয়োগ করা উচিত এবং কোন্ দেশে উচিত নয়। S & P নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীব্যাপী নানান নীতি নির্ধারণ হয়। ভারতবর্ষ কোন্ সংস্থা সরকারিকরণ করবে বা বেসরকারিকরণ করবে তা ভারতবর্ষের নিজস্ব স্বাধীনতা। তার উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু S & P-র ধাক্কায় ভারতবর্ষ ঘোষণা করে তারা দুটি তেল কোম্পানিকে বেসরকারিকরণ করবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের উপর নানা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে এখন নানান আলোচনা।

বলা হচ্ছে ওয়াশিংটন কনসেনসাস যেভাবে ভারতবর্ষ ও অন্য অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে ব্যবহার করছে তা নিতান্তই একপেশে পক্ষপাতদুষ্ট। তারা নিজেরা অনেক আইন অমান্য করছে কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলি তাদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাগুলি জোর করে অনুন্নত দেশের উপর চাপিয়ে স্বাধীনতা হরণ করছে। 'অনুন্নত দেশের স্বাধীনতা থাকার দরকার নেই'—এই তত্ত্বই এখন ওয়াশিংটন কনসেনসাস দিচ্ছে। ওয়াশিংটন কনসেনসাস মানে আই এম এফ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক

এবং আমেরিকার ট্রেজারি (Treasury) ডিপার্টমেন্ট মিলে ঠিক করছে ভারতবর্ষের কি করা উচিত বা অনুচিত। আই এম এফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক দুটি বিশ্বসংস্থা এখন আমেরিকার ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের কথায় চলছে। এই তিনটি মিলে মূলত আমেরিকার ইচ্ছাই সর্ব দেশে চালাবার চেষ্টা করছে। আর ওয়াশিংটন কনসেনসাস মানে বিশ্বের সংস্থাগুলিও তাদের স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা হারিয়ে আমেরিকার ক্রীড়নকে পরিণত। বলা হয় বেসরকারিকরণ করার পক্ষে তিনটি প্রধান যুক্তি। ১) সরকারি সংস্থা সব সময়ে ক্ষতিতে চলে অতএব সরকারকে ভর্তুকি দিতে হয়, ২) সরকার-ই দুর্নীতিগ্রস্ত অতএব সরকারি পরিচালনায় সব সংস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত—বেসরকারিকরণ হলে সংস্থাগুলি দুর্নীতিমুক্ত হবে আর, ৩) বেসরকারিকরণ সংস্থায় অনেক যোগ্য পরিচালন ব্যবস্থা অতএব দেশের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে বেসরকারিকরণ করলে।

এই তিনটি যুক্তিকে এখন পৃথিবীব্যাপী খণ্ডন করার চেষ্টা হচ্ছে আর উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ভারতবর্ষ ও রাশিয়া থেকে। বিশ্বে এই সময়ে ভারতবর্ষ অদ্ভুত এক কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

সব সরকারি সংস্থাই ক্ষতিতে চলে এমন যুক্তি ঠিক নয়। কারণ এইচ পি সি এল এবং বি পি সি এল এবং নালকো (Nalco) কোম্পানিগুলি মুনাফায় চলে ও সরকারকে বছর বছর অর্থ যোগান দেয়। দু'টি তেল কোম্পানি সরকারকে যে টাকা দিয়েছে তা সরকারি বিনিয়োগ থেকে কয়েকগুণ বেশি। নালকোর কথায় আসা যাক। নালকো পৃথিবীর সবচেয়ে কম খরচে চলা অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি। নালকো কোনো কোনো বছরে ৫০ শতাংশ বেশি মুনাফা অর্জন করে সরকারকে দিয়েছে। এর মানে বছরে অন্তত এক হাজার কোটি টাকা বা তার বেশি সরকারকে দেয়। নালকোর সবচেয়ে বেশি বক্সাইট রিজার্ভ (Banxite Reserve) আছে। যা বক্সাইট রিজার্ভ আছে তাতে ভারতবর্ষের অ্যালুমিনিয়াম চাহিদা প্রায় একশ বছর বেশি মেটানো যাবে। এর নিজস্ব বিদ্যুৎ তৈরি করার প্ল্যান্ট আছে যা ৯৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। পৃথিবীতে অন্যান্য দেশে বিশেষত পাশ্চাত্য দেশে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি খরচ ১৪০ ডলার প্রত্যেক মেট্রিক টনে। আর নালকোর খরচ মাত্র ১০০ ডলার প্রতি মেট্রিক টনে। অর্থাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেই ক্ষতিতে চলবে এমন ধারণা ভুল। সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেই বেশি খরচ এমন ধারণাও ভুল।

যদি সরকার দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে সরকারি সংস্থা বিক্রিও হবে দুর্নীতির মাধ্যমে। বস্তুত বহু পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতিবিদরা এই বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার নামকরণ করেছে Privatisation নয় Bribcrisation অর্থাৎ বিশ্বায়ন এখন অনেকটাই 'ঘুষায়ন'। উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে নালকোর বাজার দাম যেখানে ৯৬০০ কোটি টাকার উপরে সেখানে নালকোকে বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে মাত্র ২৫০০ কোটি টাকায়। আর ২৫০০ কোটি টাকা নালকো থেকে

পাওয়া যেতে পারে মাত্র তিন বছরের মধ্যে মুনাফার মাধ্যমে। বোম্বের একটি হোটেল সরকার বিক্রি করেছে খুবই অল্প দামে। তারা আবার তৃতীয় পক্ষকে বিক্রি করেছে আরও দ্বিগুণ দামে। প্রথম সরকারের কাছ থেকে কম দামে কেনা হয় 'ঘুষায়ন' মারফত। এ নিয়ে আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট কোনো হস্তক্ষেপ করতে নারাজ—কারণ বিক্রি হয়েছে 'আইন মোতাবেক'—দাম ঠিক করা জুডিসিয়ারি আওতায় পড়ছে না। তেল কোম্পানির বিক্রি এবং নালকোর বিক্রির মারফত বাজারে অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে মাত্র কয়েকটি মনোপলি হাউসের কাছে। চতুর্দিকে আজ মনোপলি সৃষ্টির চেষ্টা এবং মুক্ত প্রতিযোগিতা যেটা বিশ্বায়নের অঙ্গ তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। দেখা যাচ্ছে প্রতিযোগিতার বদলে বিশাল মনোপলি ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নালকো আর হিন্ডালকো (Hindalco) একত্রীভূত হবার চেষ্টা করছে। ফলে তারাই ভারতে ৮০ শতাংশ বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা তারা সহ্য করবে না। ভারতবর্ষে এখন 'মনোপলি'র বিরুদ্ধে কোনো জনমত গড়ে ওঠেনি—কারণ বিরাট বিরাট মনোপলি হাউসগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলগুলি কবজা করে রেখেছে।

সরকারি সংস্থাই একমাত্র দুর্নীতিপরায়ণ আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্নীতিপরায়ণ নয় এমন তথ্য আজ আর কেউ মানতে চায় না। আমেরিকার কোম্পানিগুলি তাদের অডিট রিপোর্ট লুকোচুরি করে লাভ দেখাচ্ছে। যত লাভ হচ্ছে তত বাজারে শেয়ার বিক্রি করছে। তারপরে হঠাৎ যখন ফাঁকিবাজি ধরা পড়ে যায় তখন বিরাট বিরাট কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদের ঠকিয়ে টাকা নিয়ে ভেগে পড়ছে। ভারতবর্ষে শেয়ার বাজারে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আবার সরকারি ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হচ্ছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি নানা ধরনের মিথ্যা খেলার আশ্রয় নিচ্ছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও দুর্নীতিপরায়ণ তার উদাহরণ উত্তরবঙ্গ থেকেই দেওয়া যায়। একটার পর একটা চা-বাগান নানা ছুতোয় লক আউট ঘোষণা করা হচ্ছে। কখনও বলা হয় বাজারে দাম কম, কখনও বলা হয় শ্রমিক অসন্তোষ, কখনও বলা হয় সরকারি ট্যাক্স। আসল কারণ এই বিশ্বায়নের যুগে কিছু মালিক ভেবে নিয়েছে 'যা ইচ্ছা তা করবার অধিকার' তাদের দেওয়া হয়েছে এবং সরকার কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেবে না। কারণ বিশ্বায়ন মাত্রেই সরকাবি ক্ষমতার হ্রাস। তাই সরকার যখন TMCO অর্ডারটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে বা শ্রমিক স্বার্থে কিছু করার চেষ্টা করে তখন 'মিডলম্যান' জাতীয় চা-ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট ডেকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখে।

বেসরকারিকরণ করার উপর আমেরিকা চাপ দিচ্ছে। আর এটাই

ওয়াশিংটন কনসেনসাস (Washington Consensus)। তারা বলতে চায় ভারতবর্ষ সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকেই বেসরকারি করে দিক এবং দ্রুত। একটু দেরি হলেই আই এম এফের খাঁড়া নেমে আসে। তারা চায় পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যের প্রসার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটি একতরফা। আমেরিকা রাশিয়া থেকে আমদানি বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। রাশিয়ানরা এখন বলছে আমেরিকার নীতি হচ্ছে 'Trade is good but import is bad'—অর্থাৎ তারা অন্য দেশে রপ্তানি পাঠাবে কিন্তু ভারতবর্ষ বা রাশিয়া থেকে আমদানি করবে না। তারা চায় ভারতীয় কৃষকদের উপর ভরতুকি উঠে যাক কিন্তু ২০০২ সালে প্রেসিডেন্ট বুশ Farm Bill-এর মারফত আমেরিকান কৃষিতে ভরতুকি বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলে অথচ বাইরের আমদানি আমেরিকায় ঢুকতে দিতে নারাজ।

এই দুইমুখো ওয়াশিংটন কনসেনসাসের বিরুদ্ধে এখন অনেক অর্থনীতিবিদ সোচ্চার। আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্যের ওপর লেকচার অনেকে আর সহ্য করতে পারছে না। ফলে খোদ আমেরিকায় এখন ওয়াশিংটন কনসেনসাসের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত।

ভারতবর্ষ বেসরকারিকরণ নীতি নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পঃ বঙ্গের বামপন্থী সরকার একই নীতি গ্রহণ করেছে। তাতে দেশের সামগ্রিক অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গত বাজেটে অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় পঃ বঙ্গে ৮ লক্ষ বেকারের চাকরির সৃষ্টি করবেন বলেছেন। সেই বছর পার হয়ে গেল। অসীম দাশগুপ্ত ঠিক কত লোকের চাকরি দিতে পেরেছেন তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। হয়তো উল্টোটাই সত্যি, ৮ লক্ষ লোককে চাকরি না দিয়ে কয়েক লক্ষ বেকার সৃষ্টি করেছেন। প্রতিশ্রুতি চলছেই। আর এটাই ওয়াশিংটন কনসেনসাস চায়। বেসরকারিকরণ সরকারকে টাকা দিচ্ছে তবে জনসাধারণের জন্য চাকরি সৃষ্টি করছে না।

বিদেশী কোম্পানিগুলোকে কি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব?

পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বোধহয় কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের প্রচলিত ধারণা এতদিন ছিল যে আমেরিকা সর্বক্ষেত্রে বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্যতে অন্য সব দেশ থেকে এগিয়ে আছে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা এখন এশিয়ায় কিছুটা চলে যাচ্ছে। পুরো অবশ্যই আসেনি তবে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ফরচুন (Fortune) বলে এক পত্রিকা পৃথিবীতে ৫০০টি সর্ববৃহৎ কোম্পানির নাম প্রকাশ করে। ১৯৯৩-৯৪ সালেও দেখা গেছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কোম্পানি ছিল জেনারেল মোটরস্ আর I.B.M. একটা কথা ব্যবসা মহলে প্রচলিত ছিল—"জেনারেল মোটরস্ আজ যা চিন্তা করে কাল পৃথিবীর অন্য কোম্পানি সেই ভাবে চিন্তা করে"। এক বছরে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমেরিকার "জেনারেল মোটরস"-এর স্থান লিগ তালিকায় পঞ্চম। জাপানি চারটি কোম্পানি তার থেকে [illegible]। জাপানের অন্তত চারটি কোম্পানি আমেরিকার সর্ববৃহৎ কোম্পানিকে পেছনে ফেলে চলে গেছে। প্রথম দশটি বৃহত্তম কোম্পানির নাম দেওয়া যাক। আমেরিকার I.B.M অনেক পেছনে।

সারণী-১

পৃথিবীর বৃহত্তম দশটি কোম্পানি (১৯৯৪-১৯৯৫)

	কোম্পানি	দেশ	টার্নওভার (Turn-over)
প্রথম	মিত্সুবিশি	জাপান	১৭৫.৮ বিলিয়ন ডলার
দ্বিতীয়	মিত্ সুই	জাপান	১৭১.৮ বিলিয়ন ডলার
তৃতীয়	ইতোচু	জাপান	১৬৭.৫ বিলিয়ন ডলার
চতুর্থ	সুমিতামো	জাপান	১৬২.৫ বিলিয়ন ডলার

পঞ্চম	জেনারেল মোটরস	আমেরিকা	১৫৫.০ বিলিয়ন ডলার
ষষ্ঠ	মারুবানী	জাপান	১৫০.২ বিলিয়ন ডলার
সপ্তম	ফোর্ড মোটরস	আমেরিকা	১২৮.৪ বিলিয়ন ডলার
অষ্টম	এক্সন	আমেরিকা	১০১.৫ বিলিয়ন ডলার
নবম	নিসো আইয়ে	জাপান	১০০.৯ বিলিয়ন ডলার
দশম	রয়েল ডাচ্ মেল	নেদারল্যান্ড	৯৪.৯ বিলিয়ন ডলার

উপরের সারণী থেকে এটা পরিষ্কার যে প্রথম দশটি কোম্পানির মধ্যে আমেরিকার আছে তিনটি কোম্পানি আর জাপানের আছে ছ'টি। অর্থাৎ জাপান এখন আমেরিকাকে হারিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকাই এগিয়ে গিয়েছে। আরও কথা মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর বৃহত্তম কোম্পানির মধ্যে মাত্র একটি ইউরোপের তাও সেটা নেদারল্যান্ডের। অর্থাৎ পৃথিবীকে বহুদিন ধরে যারা শাসন করেছিল সেই ব্রিটিশ বা ফ্রান্সের কোনো কোম্পানি প্রথম দশটি কোম্পানির মধ্যে স্থান পায়নি।

অবশ্য পৃথিবীতে প্রথম ৫০০টি বৃহত্তম বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে ইউরোপের কিছু কোম্পানি আছে। প্রথম ৫০০টি বহুজাতিক বৃহত্তম কোম্পানির মধ্যে ১৫১টি আমেরিকার, জাপানের ১৪৯টি, জার্মানির ৪৪টি, ফ্রান্সের ৪০টি আর ব্রিটেনের ৩৩টি, আর বাকি অন্য দেশের ৮৩টি। তার মানে এই যে বৃহত্তম বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মধ্যে আমেরিকা ও জাপান প্রায় সমান সমান।

আবার জাপানি কোম্পানিগুলির turn over বেশি বলেই যে মুনাফা সবচেয়ে বেশি তাও নয়। যেমন মিত্সুবিশির turn over ১৭৫.৮ বিলিয়ন ডলার হওয়া সত্ত্বেও লাভ করেছে মাত্র ১৭৬ মিলিয়ন ডলার। আর সেই সময় ইউরোপের রয়েল ডাচ্ মেল কোম্পানি লাভ করেছে ৬.২ বিলিয়ন ডলার, ফোর্ড মোটরস ৫.৩ বিলিয়ন ডলার আর এক্সন ৫.১ বিলিয়ন ডলার। তার থেকে একটা প্রশ্ন উঠেছে যে জাপানিরা ব্যবসাটা ঠিক ইউরোপ বা আমেরিকার কায়দায় করতে চায় না। তারা turn over বেশি চায়, কিন্তু লাভের পরিমাণ কম (profit Margin) রাখতে চায়। অর্থাৎ আমেরিকা বা ইউরোপের কোম্পানিগুলি মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়, আর জাপানিরা চায় turn over-কে সর্বাধিক। জাপানিরা এখন যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় তাতে অর্থনীতির অনেক সূত্রই পাল্টিয়ে যাবে। জাপানিরা দাম কম রেখে ব্যবসাকে বাড়াতে চায়, বিদেশে রপ্তানি বেশি করতে চায়। আর আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানরা ব্যবসা বা বাণিজ্য ততখানিই বাড়াবে যাতে তাদের মুনাফা সর্বাধিক হতে পারে। হয়তো জাপানিরা কম দর রাখতে চায় এবং পেরেছে বলে রপ্তানি ক্ষেত্রে এতখানি সাফল্য লাভ করেছে। আমেরিকার বাণিজ্য

ঘাটতি পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি আর জাপানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এখন সবচেয়ে বেশি। কয়েকটি প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। জাপানি কোম্পানিগুলি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (R&D)-এ অনেক বেশি খরচ করছে। অর্থাৎ তারা মুনাফার এক বিরাট অংশই R&D-তে ব্যবহৃত করছে বলে নানান নতুন জিনিস তারা আবিষ্কার করছে, আমেরিকা তা করতে পারছে না।

এই বিরাট বিরাট কোম্পানিগুলির তুলনায় অনুন্নত দেশগুলি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? বলতে লজ্জা হয় যে এই দশটি কোম্পানির মিলিত মুনাফা অন্তত ৮০টি অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের যোগফল থেকে অনেক বেশি। অনেক সময় একটি কোম্পানির turn over বহু অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের থেকে বেশি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

সারণী-২

দেশের নাম	জাতীয় আয় (GDP) —১৯৯৩		
বাংলাদেশ	২০.২৪	বিলিয়ন	ডলার
শ্রীলঙ্কা	৬.৩৪	”	”
ভারতবর্ষ	২৩৫.২	”	”
নেপাল	২.৮	”	”
জাপান	২৮১৫.৫	”	”
আমেরিকা	৫১৫৬.৫	”	”
জার্মানি	১১৮৯.১	”	”

অর্থাৎ বৃহৎ কোম্পানি যাদের আমরা বহুজাতিক সংস্থা বলি তাদের আকার, turn over এবং মুনাফা অনেক অনুন্নত দেশ থেকে বেশি। একটি কোম্পানির মুনাফা কয়েকটি দেশের জাতীয় আয়ের থেকে অনেক বেশি। ভারতের কথাই ধরা যাক্ না কেন প্রথম ছয়টি জাপানি কোম্পানির মিলিত turn over ভারতের জাতীয় আয়ের থেকে বেশি। অনেকটাই বেশি।

সমস্যাটা হল এই যে আজকে যে বহুজাতিক সংস্থাগুলি পৃথিবীর অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ করছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনুন্নত দেশের আছে কি? এই কোম্পানিগুলি এতই বৃহৎ এবং এতই শক্তিশালী যে এদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনুন্নত দেশে বেশি নেই, থাকতে পারে না।

অথচ এই বিরাট কোম্পানি ছাড়া আমাদের গতি কি আছে? প্রথমত, যাকে আমরা টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যা বলি তা আমরা নিজেরা যদি উন্নত করতে চাই তবে আমরা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারব না। কারণ টেকনোলজির দিক থেকে এই সব বৃহৎ কোম্পানি এক একটি যা খরচ করে তা ভারতের মতো দেশে শিক্ষার সামগ্রিক পরিষেবাতেও আমরা খরচ করতে পারি না।

অর্থাৎ টেকনোলজি যদি আমরা চাই তবে পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হবে। বৃহৎ কোম্পানিগুলি দেশে আসলে পরে প্রায় বিনি পয়সায় আমরা বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ব করতে পারব। মনে রাখা দরকার চীনও এই.টেকনোলজি পেতে এতই আগ্রহী যে তারা বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে দেশে প্রায় নিমন্ত্রণ করেই আনছে। অনেক অনুন্নত দেশই এখন টেকনোলজির জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয়ত, এই সব বৃহৎ কোম্পানিগুলি ভারত বা অন্যান্য দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। কারণ জিনিস বিক্রি করতে গেলে রপ্তানি কিছুটা কঠিন, সহজ উপায় সেই দেশে গিয়ে বিনিয়োগ করা। অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানিগুলি কিছুটা 'দেশী' হয়ে যাবে। আর অনুন্নত দেশও জানে যে বিদেশী রপ্তানি করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় অথচ আমাদের বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন। এই বিদেশী মুদ্রা সহজেই পাওয়া যাবে যদি এই বিরাট কোম্পানিগুলিকে আমরা দেশে বিনিয়োগ করতে সাহায্য করি।

অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানিগুলি আসলে আমরা মনে করি এক ঢিলে দুই পাখি ধরা যাবে। (এক) আমরা টেকনোলজি পাব যাতে আমরা অনুন্নত। (দুই) আমরা বিদেশী মুদ্রা পাব। আর বিদেশী মুদ্রা আমাদের বাড়ন্ত।

তবে সমস্যা থেকে যাচ্ছে। বিদেশী মুদ্রা যদি পেতে চাই তবে বিদেশীদের কোম্পানিগুলি মুনাফাও দেশে নিয়ে যাবে। আর তারা এত ক্ষমতাশালী যে 'মুনাফা' আমাদের দেশ থেকে বিদেশে নিয়ে গেলে আমরা বেশি বাধা নিষেধও আরোপ করতে পারব না। যদি নিয়ন্ত্রণ করতে যাই তবে বিদেশী কোম্পানিগুলি বিনিয়োগ করবে না। আমরাও টেকনোলজির দৌড় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাব।

অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানিদের আমরা 'খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না' তা হবে না। তারা অতি বৃহৎ এবং ক্ষমতাও প্রচুর। তাদের মুনাফা আমাদের সামগ্রিক জাতীয় আয়ের থেকে বেশি। এদের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপর্যয় ও ভারতের নির্বাচনে অর্থনীতি নিয়ে শূন্যতা

অনেকেরই ধারণা এবার ভারতের নির্বাচনে অর্থনীতি বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে না। এবারকার নির্বাচনে ইস্যু হচ্ছে 'স্থায়িত্ব' কাকে বলে, 'এক-দল ক্ষমতায় থাকলে ভালো, না বহুদল।' কোন্ দল কার সঙ্গে আঁতাত করবে। আঁতাত ক্ষণস্থায়ী, না চিরস্থায়ী। এই সব নিয়েই মাতামাতি বেশি হচ্ছে। অর্থনীতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও হচ্ছে না। যেটুকু হচ্ছে তা অন্তত রাজনীতির ভাষায় যেমন জাতীয় আয় বছরে ৮ শতাংশ বাড়াতেই হবে। কেউ বা বলছে আরও বেশি। তবে সব দলই এবার বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন সম্বন্ধে সতর্ক। সব পার্টিই মনে করে বিশ্বায়ন দরকার তবে সীমা কতখানি এবং কোথায় লক্ষ্মণরেখা তা নিয়ে মতভেদ। আর মতভেদটা কখনও লোকদেখানো, কখনও প্রান্তিক, কখনও বা কথার ফুলঝুরি।

অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা বিশেষ হচ্ছে না তার কারণ আমাদের প্রতিবেশী পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশের অসাধারণ বিপর্যয়। 'কোরিয়ান মডেল' যা নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি আমাদের বাণী এতদিন ধরে দিয়েছিল তা বোঝা গেল একটি জতুগৃহ। বিশ্বায়ন সম্বন্ধে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সব পার্টির মধ্যে নির্বাচনের আগে নানান দ্বিধা এবং প্রশ্ন। তাই পার্টিগুলি দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাচ্ছে না। বলা হচ্ছে এশিয়ার টাইগার দেশগুলির সঙ্কটের ছায়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের নির্বাচনে এসে যাচ্ছে। ফলে 'অর্থনীতি' নিয়ে কোনো পার্টিই বিশেষ মুখ খুলছে না। সময় হলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে চায়। আগের থেকে কেউ যাকে বলে কমিট্‌মেন্ট বা প্রতিশ্রুতি দিতে চায় না।

সবাই জানতে চায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সঙ্কট হঠাৎ কি করে এল। আর যখন এল তখন সংক্রামক ব্যাধির মতো কেনই বা ছড়িয়ে পড়ল। তবে এখন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে মডেল তৈরি হয়েছিল তার নতুন নামকরণ করা হয়েছে CRONY CAPITALISM—আর এর পুরোপুরি বাংলা তর্জমা করা কঠিন। এর বাংলা তর্জমা কাছাকাছি যা করা যায় তা হচ্ছে 'জুয়াচুরি ক্যাপিটালিজম', বা 'অসাধু-বন্ধুত্বের ক্যাপিটালিজম', বা 'সাঙ্গাত ক্যাপিটালিজম' বা 'সাঙ্গ-পাঙ্গ ক্যাপিটালিজম' বা 'নন্দী-ভৃঙ্গী ক্যাপিটালিজম' বা 'পরস্পরের পিঠ চুলকানির ক্যাপিটালিজম'। Crony Capitalism—বস্তুটি কি ধরনের তা ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ থেকে আরম্ভ করা যাক। বোঝানোটা অনেক সহজসাধ্য হবে।

ইন্দোনেশিয়া পাশ্চাত্য দেশের অত্যন্ত পেয়ারের। পাশ্চাত্য দেশগুলি ইন্দোনেশিয়াকে অনুন্নত দেশের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রসঙেঘর স্থায়ী প্রতিনিধি করতে চায়। রাজনীতিতে দেখা গেছে ইন্দোনেশিয়া আমেরিকার বশংবদ। তাই আমেরিকাও ইন্দোনেশিয়ায় প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে।

এই বিনিয়োগের সিংহভাগই পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট সুহার্তো আর তাঁর ছয় সন্তান। বৈবাহিক সূত্রে এই ছয় সন্তানের সব আত্মীয়-স্বজন-পরিজন ও কিছু সুহার্তোর নিজস্ব মোসাহেব বিনিয়োগ করে প্রভূত বিত্তশালী। বলা হয় এই আত্মীয়-স্বজন-মোসাহেবরা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে। তাদের যুগ্ম সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আর ইন্দোনেশিয়ার বার্ষিক জাতীয় আয় প্রায় ৮০ বিলিয়ন।

সুহার্তো দেশের ডিকটেটর প্রায় ৩২ বছর। নির্বাচন করা হয় তবে সেটা প্রহসন। সমস্ত শিল্প ও ব্যাঙ্কের মালিক সুহার্তোর নিজস্ব লোকেরা। কোনো কন্ট্রাক্ট পেতে গেলে সুহার্তোর আত্মীয় স্বজনকেই ধরতে হবে। যত পেট্রোল খনি, সফ্‌ট ওয়ার, বড় বড় হোটেল, বড় বড় শিল্পের মালিক এই আত্মীয়-স্বজনরা। বিদেশীরা বিনিয়োগ করলে ইক্যুইটি শেয়ারের একাংশ সুহার্তোর আত্মীয়কেই দিতে হবে। অন্য লোকরা বিনিয়োগ করলে বিপদে পড়বে। কারণ ব্যাঙ্ক ইন্স্যুরেন্স সবারই মালিক সুহার্তোর ছেলেরা-নাতি-পুতিরা। তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় শিল্পে ঋণ পাওয়া যায় অথবা পাওয়া যায় না।

বেশ চলছিল। ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুল পরিমাণে। তবে সেটা অনেকটাই Intra firm অর্থাৎ আমেরিকার মাতা কোম্পানি ইন্দোনেশিয়ার পুত্র কোম্পানি থেকে আমদানি করত।

ভালোর একটা শেষ আছে। কাল হল সুহার্তোর এক ছেলে বিরাট এক অঙ্ক বিনিয়োগ করে আমেরিকার জেনারেল মোটরসের সঙ্গে কোলাবোরেশনে একটি মোটর গাড়ি শিল্প তৈরি করতে গেল। এবং অন্য ছেলেরা হিউস, সিমেন্স, লুসেন্ট ইত্যাদি বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শিল্প করতে গেল। আমেরিকানরা বুঝল যা মোটর গাড়ি হয়েছে তা কেনা যায় না। আগে

যারা বিনিয়োগ করেছিল তারা ডলার উঠিয়ে নিতে চাইল। প্রথমে মোটরগাড়ি শিল্পে ক্র্যাস, তার পরে তাদের যারা ঋণ দিয়েছিল, সেই ব্যাঙ্ক ক্র্যাস, তার পরে জাতীয় বিপর্যয়। পূর্ণ কনভারটিবিলিটি থাকার ফলে সবাই ডলার চায়, ইন্দোনেশিয়ার রূপাইয়া চায় না। ফলে ক্র্যাস ও মুদ্রার অবমূল্যায়ন।

কোরিয়ার উন্নতিতে আমেরিকার ডলারের বিশাল এক অবদান আছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দঃ কোরিয়ার উন্নতি বোঝা উচিত। আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বন্ধু রাষ্ট্র চায়। যাদের বাছা হল তার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম। দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী ডলার বিনিয়োগ করা হল। সবচেয়ে বেশি ইউরো ঋণ দঃ কোরিয়াতে গেল। ব্যাঙ্কগুলির অসামান্য ভূমিকা। প্রায় প্রত্যেক শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের ঋণ অপরিহার্য। ফলে দেখা গেল শিল্পের সঙ্গে ব্যাঙ্কের এক অদ্ভুত মিলন। ব্যাঙ্কগুলি প্রচুর বিনিয়োগ শিল্পে করল। দঃ কোরিয়ার তথাকথিত গণতন্ত্র আসলে ডিকটেটরশিপ। শ্রমিক ইউনিয়ন অধিকাংশই সরকারি। এই অবস্থায় যারা শিল্পপতি হল তারা হয় রাজনীতির নেতাদের সঙ্গে যুক্ত অথবা ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত। আমেরিকা তার দেশে দঃ কোরিয়ার রপ্তানি প্রায় বিনা দ্বিধায় আসতে দিয়েছিল। প্রচুর শিল্প গড়ে উঠল কিন্তু শিল্পপতির সংখ্যা সীমিত। অলিগোপলিও যে মাঝে মাঝে উন্নতি আনতে পারে দঃ কোরিয়া তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হঠাৎ দঃ কোরিয়ার রপ্তানি কমে গেল। যে শিল্পগুলি রপ্তানি নির্ভর তারা বন্ধ হয়ে গেল। বিদেশীরা যারা এই রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগ করছিল তারা ডলার বিনিয়োগ প্রথমে বন্ধ করল, পরে তারা ডলার উঠিয়ে নিয়ে গেল। শিল্পগুলি ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করতে পারছে না। ফলে ব্যাঙ্কিঠ বিপর্যয়। একটার পর একটা ব্যাঙ্ক বন্ধ। আর যেহেতু যারা শিল্পপতিরা তারা আবার ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ফলে শিল্পে তীব্র মন্দা, মুদ্রার বিপর্যয় ওনের ঐতিহাসিক অবমূল্যায়ন। যত অবমূল্যায়ন তত ডলার দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু বিদেশী ঋণ শোধ করা দরকার। কিন্তু শোধ করার কোনো উপায় নেই। আর দঃ কোরিয়া যে নিজের পায়ে দাঁড়াবে এমন ঋণ দেওয়াতে আমেরিকার সিনেটের আপত্তি। ফলে আবার বিপর্যয়।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, যে উন্নতির মডেল আমাদের রাজনীতিবিদরা আমাদের দিয়েছিলেন (বাম বা দক্ষিণ নির্বিশেষে) তা অর্থনীতির ভাষায় DEPENDENCY MODEL—বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগের উপর প্রধান ভরসা। ভরসা রাখা যে যাচ্ছে না তার কারণ IMF বা আমেরিকা এই সব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'আবার উন্নতি' তেমন চাইছে না। আমেরিকার সিনেটররা (দক্ষিণ ও বাম) তারা কেউ মিত্র দেশ দঃ কোরিয়াকে সাহায্য করতে চাচ্ছে না। যেমন একজন সিনেটর লীচ বলছেন, যে দঃ পূর্ব এশিয়াকে সাহায্য করতে চায় 'তারা আমেরিকার শিল্পের শত্রু'। দুই সিনেটর ডেভিড় বনিয়ার এবং লচ্

ফেয়ারক্লথ আরও অসভ্য ভাষা ব্যবহার করে বলছেন যে আমেরিকার তো সাহায্য করা উচিত নয়। আর আই এম এফ যেন উদ্ধার কার্যে এগিয়ে না আসে। দঃ কোরিয়ার উন্নতির জন্য আমেরিকার শিল্পে বেকারি বৃদ্ধি।

মোট কথা বিশ্বায়ন করলে বিপদ আছে। আর বিপদ হলেই যে উদ্ধারকর্তা পাওয়া যাবে এমন কোনো ভরসা নেই। মেক্সিকোতে অন্তত উদ্ধার করবার জন্য ইউরো ব্যাঙ্ক ও আমেরিকা এগিয়ে এসেছিল। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দঃ কোরিয়াতে উদ্ধারের বদলে বরং শিল্পগুলিকে খর্ব করতেই পাশ্চাত্য দেশগুলি চায়।

তাই বর্তমানে ভারতে অর্থনীতিতে বিরাট এক শূন্যতা। প্ল্যানিং যে সাফল্য লাভ করেনি তার প্রধান কারণ আমাদের নেতাদের লোভ ও আমলাদের লালসা। আমলারা তাদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য বাড়াতে গিয়ে দেশের উন্নত্তিতে প্রাধান্য দেয়নি, দিয়েছিল নিজেদের স্বার্থকে। এর উল্টো পথে হাঁটতে গিয়ে বিশ্বায়ন, বিদেশী বিনিয়োগ, বিদেশী মূলধন, ডাংকেল ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি। বিশ্বায়নে যে দাসত্ব আসতে পারে তা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। অথচ আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ঢাকঢোল বাজিয়ে উদ্‌যাপন করছি।

এই অবস্থায় রাজনীতিবিদরা সস্তায় বাজিমাত করতে ভরসা পাচ্ছেন না। তাই বর্তমান নির্বাচনে অর্থনীতির নীতি নিয়ে সব চুপচাপ। খুব ভাসা ভাসা কথা বলা হচ্ছে। সব পার্টিই প্রায় এক ভাষাই ব্যবহার করছে—যার মানে সব রকমই হয়। নেতাদের ধরি মাছ না ছুঁই পানি হতেই হয়। এই আর্টকে নিখুঁত বা কত উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য গলার প্রতিযোগিতা। নির্বাচন যদি শেষ হয় তবে হয়তো নীতির শূন্যতার ও অন্ধকারে হাঁটার টানেল শেষ হবে। অন্ধকারের শেষেই বোঝা যাবে নীতির দিন আসবে কিনা। আবার নাও আসতে পারে। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে পথ চলাই আমাদের বহুদিনের অভ্যাস। আবার বেকারদের চাকরি হবে কিনা তা নিয়ে কোনো রাজনৈতিক পার্টির নীতি কি তা কেউ জানে না তবুও নির্বাচন হবে। প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার খরচ। আর বেকাররা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। অন্তত তাদের বিষয়ে কোনো পার্টির কোনো নীতি নেই।

ডলারের নৃত্য আর আমেরিকার পতনের সূচনা

এই শতাব্দীতে আমরা অনেক কিছুই দেখলাম। দুটো বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের উত্থান ও পতন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যাওয়া, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের আরম্ভ ও আপাত শেষ। এখন বলা হচ্ছে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় আমেরিকা যুক্তরাজ্যই প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি—তাদের সমান আর কেউই নেই। সোভিয়েত রাশিয়া নেই অথবা পৃথিবীতে এখন আমেরিকা যা বলবে তাই হবে, আমেরিকাই বর্তমানে পৃথিবীর চালক ও বাহক।

কথাটার অর্থ বোধহয় এই যে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকাই এখন সর্বেসর্বা এবং তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা অনুযায়ী পৃথিবী চলবে। কথাটার মধ্যে সত্যতা নিশ্চয়ই আছে, তবে হয়তো এও সত্য এই শতাব্দীতে আমরা আমেরিকার অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত পতনের ইঙ্গিত পাচ্ছি। যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত সেইহেতু বলা যায় পৃথিবীর যে দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে তাতে রাজনৈতিক পতনও আমেরিকায় আরম্ভ হয়ে গেছে। অর্থাৎ অনেক উত্থান ও পতনের মতো হয়তো আমরা এই শতাব্দীতেই আমেরিকার অবক্ষয়ও লক্ষ্য করছি।

আমেরিকার বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের নিশ্চয়ই একাধিক কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম এই যে আমেরিকার মুদ্রা ডলার পৃথিবীতে সর্বজনগ্রাহ্য। বর্তমানে পৃথিবীতে যা ব্যবসা ও বাণিজ্য হয় তার বিরাট অংশই হয় এই আমেরিকার মুদ্রায়। আমেরিকার মুদ্রা ডলারকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণ থেকেও বেশি মূল্যবান বলা হত। ডলার বিশ্বে ১৯৭৭ সালের মধ্যে স্বর্ণকে মুদ্রা হিসাবে প্রায় স্থানচ্যুত করে ফেলেছিল। ডলারই হয়ে দাঁড়ায় প্রায় 'একমাত্র' বিশ্বমুদ্রা এবং অনেকেই বলেন আমরা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আছি তার নামকরণ করা যাক ডলার স্টান্ডার্ড (Dollar Standard)। আমেরিকার রমরমা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ডলার হয় শক্তিশালী। এতই শক্তিশালী যে কেউ কোনোদিন ভাবেনি যে ডলারের অবমূল্যায়ন

(Devaluation) হবে। কালের চক্রে ডলারকে বিগত দশকে বেশ কয়েকবার অবমূল্যায়ন করা হল। তবুও ডলারই নির্ভরযোগ্য একমাত্র বিশ্বমুদ্রা এই ধারণা ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত অনেকের মনে ছিল। কিন্তু বর্তমানে কতকগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় ডলারের যে 'নৃত্য' হচ্ছে তাতে আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ নিম্নাভিমুখী। ডলারের উপর লোকের বিশ্বাস আর নেই। গত কয়েক মাসে জাপানি মুদ্রা ইয়েনের তুলনায় ডলারের দাম দ্রুত কমতে আরম্ভ করেছে। আমেরিকা বহু চেষ্টা করেও এই পতন রোধ করতে পারছে না। আরও বলা হচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে ডলারের দাম এতই কমে গেছে যে আমেরিকা স্বীকার করুক বা না করুক বিশ্বের বাজারে ডলারের দাম প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে বা Devaluation হয়ে গেছে। অর্থাৎ পাঁচ বছরে আগেকার ১০০ ডলার এখন ৫০ ডলারের কাছাকাছি। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার বিদেশী মুদ্রা (ধরা যাক) ডলারে রেখেছিল, বিদেশে ডলারের দাম (ধরা যাক) ৫০ শতাংশ কমে গেল। অর্থ এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমাদের বিদেশী মুদ্রার (অর্থাৎ ডলারের) ক্রয় ক্ষমতা ৫০ শতাংশ কমে গেল। অর্থাৎ আমরা কোনো দোষ করিনি। সহজ বুদ্ধিতে আমরা আমাদের বিদেশী মুদ্রা ডলারে রেখেছিলাম। আমেরিকায় বা পৃথিবীতে ডলারের অবমূল্যায়ন হল। সঙ্গে সঙ্গে বিনা দোষে আমাদের বিদেশী মুদ্রাও কমে গেল। যত ডলারের অবমূল্যায়ন হবে তত বিনা দোষে আমরা বিদেশী মুদ্রা হারাব। আমরা তখন ডলার ছেড়ে 'অন্য' কিছু করব। যত ডলার ছাড়ব তত ডলারের যোগান বাড়বে। যত যোগান বাড়বে তত ডলারের দাম কমবে। বস্তুত জাপানে বা পৃথিবীতে ডলারের যে ক্রমাগত অবমূল্যায়ন (Devaluation) হচ্ছে তার প্রধান কারণ বাজারে সবাই ডলার বিক্রি করে দিতে চায়, আমেরিকা অনেক চেষ্টা করেও অবস্থা সামাল দিতে পারছে না। ডলারের বর্তমান পতন অনেকের মতে ইঙ্গিত করে আমেরিকার দ্রুত পতন।

আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার, গত পাঁচ বছরে ডলারের অবমূল্যায়ন দ্রুত হারে হয়েছে। ডলারের Devaluation-এর সঙ্গে আশা করা হয়েছিল যে, আমেরিকার বিদেশী রপ্তানি বাড়বে আর আমদানি কমবে। তা কিন্তু হয়নি। গত কয়েক বছরে আমেরিকার বিশ্ববাণিজ্যে যা ঘাটতি (Deficits) তা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। ঘাটতি না কমার বদলে ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্য ঘাটতি কমাবার সম্বন্ধে আমেরিকার অনেক চেষ্টা ফলবতী হয়নি। আমেরিকার ঘাটতির বহর ক্রমশ বাড়ছে।

অবশ্য এই বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কিছু প্রভেদ আছে। ধরা যাক ভারতবর্ষে বিদেশী বাণিজ্যে ঘাটতি হল। ঘাটতি পূরণের জন্য আমাদের বিদেশী মুদ্রা যা সর্বজনগ্রাহ্য, তা জোগাড় করতে হবে। অর্থাৎ অন্য দেশ ঋণ না দিলে ভারতের মতো দেশগুলি ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমেরিকা এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কারণ আমেরিকার বিদেশী বাণিজ্যে ঘাটতি হল, তার দেশীয় মুদ্রায় (ডলারে) তা নিতে পারবে। ডলার সর্বজনগ্রাহ্য মুদ্রা। আমেরিকার ডলারের Printing Press থেকে ডলার ছাপিয়ে তা বিদেশীদের দিয়ে দেবে। ফলে আমেরিকার ঘাটতি পূরণ করা অনেক সহজ। তার দেশীয় মুদ্রাই আন্তর্জাতিক মুদ্রা এবং পৃথিবীর লোকেরা ডলারই পেতে চায়। ভারতের মতো দেশে ঘাটতি পূর্ণ করতে গেলে বিদেশী ঋণ দরকার, আমরিকার ঘাটতি হলে ডলারের ছাপাখানা চালু রাখলেই চলবে। আমেরিকা তার দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী ঘাটতি পূর্ণ করে। তথাকথিত ঋণ বা IMF-র কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমেরিকার এটাই মজা।

কিন্তু মজারও সীমা আছে। আমেরিকা থেকে যত ডলার বাইরে যাবে এবং প্রয়োজনের তুলনায় যোগান বৃদ্ধি পাবে তত ডলারের দাম পৃথিবীতে কম হতে থাকবে। যত ডলারের দাম কম হবে তত ডলার লোকেরা বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি বিক্রি করবে। ফলে ডলারের আবার পতন হবে। বস্তুত ডলারের বর্তমান পতন ইঙ্গিত করে আমেরিকা তার সাধ্য ও সামর্থ্য থেকে অনেক বেশি খরচ করছে। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না।

আমেরিকার এই অবস্থা কেন হল? ডলারের পতনের কারণ কি কি? এর কারণ বিবিধ এবং মিশ্র। যদিও সহজ কথায় তার উত্তর পাওয়া কঠিন তবে সাধারণভাবে কতকগুলি কারণ বলা যাক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্যের শেষ আমাদের অজান্তেই যেন ঘটে গেছে। জাপান ও জার্মানির শিল্পে পুনর্জন্ম আমেরিকাকে বেশ এক ধাক্কা দেয়। জার্মানি ও জাপান শিল্পে ও শিল্প প্রতিযোগিতায় যতখানি সফল হতে পেরেছে তা আমেরিকা পারেনি। এছাড়া আছে দঃ কোরিয়া এবং অন্যান্য এশিয়ান বাঘদের কাছে নানা শিল্প প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ক্রমাগত পরাজয়। এমনকি আমেরিকার উন্নতির যে প্রধান কারণ মোটরগাড়ি শিল্প তা জাপান ও জার্মানির প্রতিযোগিতায় নাভিশ্বাস তুলেছে। বস্ত্রশিল্পে অনেক দেশই আমেরিকাকে পেছনে ফেলে গেছে। আমেরিকা নানান নীতি গ্রহণ করে অবস্থার সামাল দিতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দেখা গেল তা সফল হয়নি। আমেরিকার শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি (Productivity) বহুগুণ কম অন্য অনেক দেশের তুলনায়। অর্থাৎ আমেরিকায় যা ঘটে গেছে আমাদের পরিভাষায় তার নাম De-Industrialisation, এই ডলারের অবমূল্যায়ন শিল্পের অবমূল্যায়নের এক পরিণতি।

এছাড়া আছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। দৈনিক খরচ যা গেছে তা আমেরিকার সাধ্যের বাইরে ছিল। সত্তর দশকে এল Oil crisis বা পেট্রোলের অকস্মাৎ মূল্যবৃদ্ধি। এক লাফে আমেরিকায় পেট্রোলের দাম তিন গুণ-চার গুণ বেড়ে গেল। পৃথিবীতে পেট্রোল যা খরচ হয় তার (সত্তর) ৭০ শতাংশ খরচ করে

আমেরিকানরা গাড়ি চালিয়ে। পেট্রোলের আমদানি খরচ ক্রমাগত বেড়ে গেল। পৃথিবীব্যাপী আমেরিকানরা নানান ধরনের সামরিক চুক্তি করে সবাইকে তাঁবেদার রাজ্য করে রেখেছিল— NATO, SEATO, CENTO, ANJUS ইত্যাদি। এই খরচ আমেরিকা কিছুদিন চালিয়ে এখন পারছে না। NATO ছাড়া সবই বোধহয় বন্ধ। মোট কথা আমেরিকার বাজেটে এবং বাণিজ্যে এখন বিপুল ঘাটতি—বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি।

এই অবস্থায় আমেরিকার ডলার আর লোকেরা নিতে চাচ্ছে না। ডলার বিক্রি করতে চাচ্ছে। ফলে ডলার ১৯৯৫ সালে এখন মুমূর্ষু। বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকা আর পেরে উঠছে না। উদারনীতি আমেরিকার পক্ষে ভালো না খারাপ খোদ আমেরিকায় এখন তা আলোচনার বিষয়। শিল্পপতিদের একাংশ 'উদারনীতি' চায় না।

তাছাড়া বিভিন্ন দেশ আবার অর্থনীতি বিষয়ে আমেরিকাকে উপদেশ দিচ্ছে। বাজেট ঘাটতি কমাও, বাণিজ্য ঘাটতি কমাও এবং সুদের হার বাড়াও। আমেরিকা প্রায় কোনোটাই করতে পারছে না। করতে গেলে যে হারে জীবনদণ্ডের মান কমবে এবং বেকারি বৃদ্ধি পাবে তা রাজনৈতিকভাবে হবে আত্মহত্যা।

সুদের হার বাড়লে শিল্পের গতি হবে রুদ্ধ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ হবে কম। সুতরাং আমেরিকা সুদের হার খুব বেশি বাড়াতে চায় না। অর্থাৎ বর্তমানে আমেরিকার অর্থনীতি এখন বেহাল। ডলারের অবমূল্যায়ন রোধ করার সহজ উপায়ও নেই।

তার মানে আজকের দিনে আমেরিকার Hegemony বা আধিপত্য বিগত দিনের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আগে ডলার ছিল বলিষ্ঠ। সেই সুবর্ণ যুগ আর নেই। আমেরিকার অর্থনৈতিকভাবে যত পতন হবে, রাজনৈতিকভাবে তার পতনও অবশ্যম্ভাবী।

আমরা এই শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন দেখলাম, সোভিয়েত ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখলাম হয়তো বা আমেরিকার পতনও আমরা দেখছি।

মৃত্যু নিয়ে ব্যবসা ঃ আমেরিকারই 'স্ট্র্যাটেজি'

পৃথিবীব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যে অনুন্নত দেশগুলিতে অসংখ্য অসুবিধা হতে বাধ্য। তবে উন্নত দেশে মুক্ত বাণিজ্যের কল্যাণে যে নানান রকম পরিবর্তন আসলে তা আমরা অনেক সময়ে মনে রাখি না। উন্নত দেশে সমস্যা অনেক সময়েই প্রবল। এখন আমেরিকা উল্টো চিন্তা শুরু করেছে। যারা ডাঙ্কেল ড্রাফ্‌টের প্রবক্তা তাদের দেশেই নানান আলোচনা। এখনও আমেরিকার কংগ্রেস ডাঙ্কেল ড্রাফ্‌ট পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করেনি। তার কারণও আছে।

আমেরিকার শিল্পলবি এখন বলতে আরম্ভ করেছে যে মুক্ত বাণিজ্য থাকলে অনেক শিল্পই বন্ধ হতে বাধ্য। যেমন মোটরকার বা বস্ত্র। আমেরিকার শ্রমিক খরচ তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। আর যে পপুলার ধারণা ছিল যে আমেরিকার উৎপাদিত শক্তি অনেক বেশি তাও সত্যি নয়। তাছাড়া আমেরিকায় এখন তুলনামূলক ভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার খুব বেশি। আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি যত কোটি হবে তত বিদেশ থেকে আমদানি বাড়বে আর বিদেশে রপ্তানি কমবে। সুতরাং আমেরিকাকে প্রতিযোগিতামূলক হতে গেলে মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশ কমাতে হবেই।

এর ফলে আমেরিকার কংগ্রেস রিপাবলিক আর ডেমোক্রেটিক পার্টির ঝগড়া। আমেরিকা পরদেশকে ও বিদেশী অনুন্নত দেশকে বাজেট নিয়ে নানান উপদেশ আক্‌ছার দিয়ে যায়। কিন্তু বলা হয় আমেরিকার বাজেট ঘাটতি পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি। আর বাজেট ঘাটতি আছে বলেই আমেরিকার নানান কল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু রিপাবলিকানরা এই বাজেট ঘাটতি কমাতে চায় আর ডেমোক্রাটরা চায় না। এই ঝগড়ার ফলে একদিনে আট লক্ষ সরকারি কর্মচারী ছাঁটাই। রিপাবলিকানরা চায় সমস্ত কল্যাণমূলক কাজ বন্ধ হোক। আর ডেমোক্রাটরা জানে নির্বাচনের বছরে এই সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দেবে। সুতরাং বাজেট ঘাটতি তারা কমাতে চায় না। একদিনে আট লক্ষ কর্মচারী ছাঁটাই করা আমাদের মতো দেশে কল্পনার

বাইবে। তবে আমেরিকাতে তাই হল।

আসলে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমেরিকা এখন ক্রমশ পিছু হটছে। শিল্পে আমেরিকা জাপান জার্মানি বা অন্যান্য অনেক দেশ থেকে কম হারে বাড়ছে। এই মন্দাভাব থেকে রক্ষা পেতে গেলে বাণিজ্যে আমেরিকার দরকার উদ্বৃত্ত। কিন্তু সহজে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যে যে আসবে তা আমেরিকান সরকার মনে করে না। কারণ আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি হার এতই বেশি, আর উৎপাদন এতই কমের দিকে যে আমেরিকাকে 'নতুন' রপ্তানি দ্রব্যের কথা চিন্তা করতে হবে। আর এর থেকে উৎপত্তি অস্ত্রের রপ্তানি। অস্ত্র উৎপাদন আর রপ্তানি না করতে পারলে আমেরিকা রাজনীতির শীর্ষস্থানে থাকতে পারবে না। অতএব আমেরিকা অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে শীর্ষে।

আমেরিকার অস্ত্র পৃথিবীতে চতুর্দিকে বাজার খুঁজে বের করতে চাইছে। বাজার না বাড়াতে পারলে আমেরিকার অস্ত্র বিক্রি হবে না। কিন্তু আমেরিকা সহজ বাজার খুঁজে পেল—সেটা হচ্ছে অনুন্নত দেশ আর বিশেষত মধ্য আরব দুনিয়া। মধ্য এশিয়া থেকে তেল বা পেট্রোল আমেরিকা কেনে আর তার বদলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা অস্ত্র বিক্রি করে। এই ব্যবস্থাই প্রায় ২০ বছর ধরে চলে আসছে। আমেরিকার অস্ত্র রপ্তানি আমেরিকার বাণিজ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম এবং একক দ্রব্য।

আমেরিকা পৃথিবীতে অস্ত্র বিক্রি করে গড়ে বছরে ১০ থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার আয় করে। কোনো কোনো বছরে তার অস্ত্র বিক্রি প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের উপর চলে যায়। সবচেয়ে বেশি বিশ্ব বাণিজ্যে অস্ত্র কেনে কারা? নিচের সারণী থেকে এটা বোঝা যাবে।

অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা

১৯৯৪-১৯৯৫

প্রথম	সৌদি আরব	৯.৫ বিলিয়ন ডলার
দ্বিতীয়	চীন	২.৫ বিলিয়ন ডলার
তৃতীয়	ইজরাইল	২.৪ বিলিয়ন ডলার
চতুর্থ	কাতার	১.৩ বিলিয়ন ডলার
পঞ্চম	পাকিস্তান	১.২ বিলিয়ন ডলার
ষষ্ঠ	মিশর	১.০ বিলিয়ন ডলার
সপ্তম	মালয়েশিয়া	১.০ বিলিয়ন ডলার

উপরের সারণী থেকে এটা পরিষ্কার যে, মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশ, চীন ও পাকিস্তান অস্ত্রের বিরাট বাজার। তাছাড়া আমেরিকার সভ্যতা পেট্রোলের উপর নির্ভরশীল। আর যারা পেট্রোল দেবে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করে আমেরিকা তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে।

বলা হয় ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে আমেরিকা বিশ্বের বাজারে অস্ত্র বিক্রি করতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করেছিল। কারণ প্রায় এক দশক ধরে যুদ্ধে আমেরিকা ইরান ও ইরাককে প্রচুর অস্ত্র বিক্রি করেছিল। অর্থাৎ অনুন্নত দুই দেশের ঝগড়া হচ্ছে কিন্তু বিবদমান দুই পক্ষকেই সমানভাবে আমেরিকা অস্ত্র দিয়ে গিয়েছে।

আফগান যুদ্ধেও আমেরিকা প্রচুর অস্ত্র দিয়েছে এবং বিক্রি করেছে। বর্তমানে 'তালিবন' বলে যারা কাবুল দখল করতে চায় তারা পাকিস্তানে শিক্ষণপ্রাপ্ত কিন্তু আমেরিকার অস্ত্রে সজ্জিত। আফগানিস্তানে আমেরিকা ও পাকিস্তান দু'জনকেই চায় 'বন্ধু' সরকার। এই 'বন্ধু' সরকার বা 'তালিবন' যদি ক্ষমতা দখল করে তবে রাশিয়া ভেঙে যে পাঁচ-ছয়টি মুসলিম দেশ হয়েছে, যেখানে তেল পাওয়া যায় বা পাবার সম্ভাবনা আছে সেইখানেও আমেরিকা-পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ চালু করতে পারলে সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অর্থাৎ পাকিস্তানের আই এস আই আর আমেরিকার সি আই এ যে যুগ্মভাবে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছে তাতে পূর্ণ রূপ দেওয়া যায়।

আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহে আরও একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে আমেরিকার বৃহৎ অস্ত্র কোম্পানিগুলি শুধু যে রাষ্ট্র বা রাজ্যকে অস্ত্র সরবরাহ করছে তাই নয়, তারা বেসরকারি ব্যবসাদারদেরও অস্ত্র কিনতে সাহায্য করছে। অর্থাৎ ডলার দিলেই অস্ত্র পাওয়া যাবে। আরব দেশের খাশোগী বর্তমানে একজন বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী। খাশোগীর মতো অনেক বেসরকারি ব্যবসাদার আছে, যারা আমেরিকার কোম্পানিগুলো থেকে অস্ত্র কেনে আর বিভিন্ন সংস্থাকে বিক্রি করে। ফলে বিশ্বব্যাপী আজ যে নানা ধরনের টেরোরিস্ট এবং ফান্ডামেন্টালিস্ট আছে তাদের অস্ত্রের প্রধান সরবরাহকারী এই বেসরকারি সংস্থাগুলি বা বেসরকারি ব্যবসাদাররা। তারা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী অস্ত্র কিনে নানান ধরনের রাষ্ট্র-বিরোধী কাজকর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী টেরোরিজমের অন্যতম কারণ আমেরিকার কোম্পানিগুলির মুনাফাস্পৃহা। বলা হয় পৃথিবীব্যাপী সবরকম টেরোরিজমের কারণ সহজে অস্ত্র লভ্য। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ (যেমন আফগানিস্তানের 'তালিবন') বা পরোক্ষভাবে (যেমন কাশ্মীরে) আমেরিকার অস্ত্র বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী আজ অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে।

এই ধরনের অস্ত্র সরবরাহ করা কি উচিত? আমেরিকার বিদগ্ধমহল আজ আবার নতুন নতুন 'থিওরি' তৈরি করে এই অস্ত্র সরবরাহকে শুদ্ধিকরণ করতে চাচ্ছে। আর বলা হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন বর্তমানে এইসব পণ্ডিতদের কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছেন।

এই সম্বন্ধে দু'জন আমেরিকার পণ্ডিত ডঃ ফেলডম্যান ও ডঃ কেনেথ ওয়াটজ দু'খানি বই লিখেছেন। তাঁদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'more is

better'—অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলি যত বেশি অস্ত্র কিনবে তত বিশ্বশান্তি বজায় থাকবে। কারণ সবার হাতেই যদি মারণ ও সাংঘাতিক অস্ত্র থাকে তবে সবাই সবাইকে ভয় করবে। 'ভয় হবে বিশ্বব্যাপী'—আর তার ফলে বিশ্বশান্তি বজায় থাকবে। কেউ আর যুদ্ধ করতে সাহসী হবে না কারণ 'ভয়ের শৃঙ্খলা'।

তবে সব আমেরিকান পণ্ডিত যে এই মতের সমর্থক তাও নয়। যেমন প্রফেসর স্কট সাগান অন্য অনেক সমস্যার কথা বলেছেন। প্রথমত, আমেরিকা যে সব দেশে অস্ত্র সরবরাহ করছে তাদের অধিকাংশই ডিকটেটরশিপ বা একনায়কতন্ত্রের অধীনে। দ্বিতীয়ত, কোনো পাগল জেনারেল যদি অস্ত্র পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত বলশালী মনে করে অন্য রাজ্যকে আক্রমণ করে তবে তার ফল হবে মারাত্মক। তৃতীয়ত, অস্ত্র সরবরাহ মানে এক ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা। আর অনুন্নত দেশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা যদি আরম্ভ হয়, তবে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা অসম্ভব হবে এবং উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে যাবে।

হয়তো আমেরিকার এটাই স্ট্র্যাটেজি। আমেরিকা কখনই চায় না যে অনুন্নত দেশগুলি তাদের দেশের সমস্যা বিশেষত দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে সক্ষম হয়। যদি অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্প দ্রুত হারে বাড়ে তবে বিশ্ব-প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। আর তার ফলে উন্নত দেশগুলি বিশেষত আমেরিকার অস্বস্তি বাড়বে, কমবে না।

তবে আমেরিকার বোধহয় শান্তি নেই। কারণ এই বছর ফ্রান্স আমেরিকাকে অস্ত্র বাণিজ্যে ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকা অস্ত্র ব্যবসায় এখন অন্তত এই বছরে দ্বিতীয়। হয়তো উন্নত দেশগুলির মধ্যেই এখন অস্ত্র ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যাবে। সবাই নতুন নতুন অস্ত্র অনুন্নত দেশে বিক্রি করতে চায়।

এর ফলে অনুন্নত দেশে উন্নয়নে বাধা পড়বে, হয়তো এটাই আমেরিকাও চায় আর ফ্রান্সও।

পৃথিবীব্যাপী আয়ের বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে—তাতে দেশগুলি হচ্ছে বিদীর্ণ

সাধারণত সমাজবিজ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে একমত হন না। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে সব সমাজবিজ্ঞানীরা প্রায় এক সুরে কথা বলছেন। এখন বলা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্রই আয়ের বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। সাম্য প্রতিষ্ঠার বদলে পৃথিবীতে এখন বৈষম্য তীব্র হচ্ছে। ভারতবর্ষেও তাই হচ্ছে।

আয়ের বৈষম্য বলতে কয়েকরকম বৈষম্যর কথা বলা হচ্ছে। প্রথমত, উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশের তুলনা করে বলা হচ্ছে, উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশের আয়ের পার্থক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, একটি দেশের মধ্যেই বড়লোক এবং দরিদ্র লোকের আয়ের বৈষম্য বাড়ছে। আর তৃতীয় হচ্ছে, দরিদ্র দেশেই যাদের আছে তারা আরও পাচ্ছে আর যাদের নেই তারা ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ বা ইউনাইটেড নেশনস এই তিনটি বিষয়ে কয়েকটি সমীক্ষা করে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে। সামগ্রিকভাবে একটি থিওরি এই রিপোর্টগুলিকে একই সূত্রে বেঁধেছে—থিওরিটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে "Divergence Big Time" অর্থাৎ 'বিপথগামী সময়দীর্ঘ'। ঐক্যের বদলে অনৈক্য বাড়ছে। সাম্যের বদলে অসাম্য। মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রমশ বাড়ছে।

ইউনাইটেড নেশনস তার সদ্য প্রকাশিত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (Human Development Report)-এ জানাচ্ছে, ১৯৬০ সালে উন্নত দেশের গড় আয় অনুন্নত দেশের গড় আয় থেকে ত্রিশ গুণ বেশি ছিল। ১৯৯৭ সালে উন্নত দেশের গড় আয় অনুন্নত দেশের গড় আয় থেকে ৭৪ গুণ বেশি। প্রায় দু'শ বছর ধরে উন্নত আর অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে প্রভেদ বাড়ছে। তবুও আশা করা গেছিল যে অনুন্নত দেশে শিল্প, কৃষি ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে এই প্রভেদ ক্রমশ কমবে। উন্নত দেশ আর অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে আয়ের বিভেদ

ক্রমে পৃথিবীব্যাপী এক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। যা ভাবা যায় তা অনেক সময়ে হয় না। গত দু'দশকে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। আর এটা এক আশ্চর্য ঘটনা। বিংশ শতাব্দী হচ্ছে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক আশ্চর্য শতাব্দী। সাম্যের জন্য মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছে, বিপ্লব করেছে, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও উন্নত দেশ আর অনুন্নত দেশগুলি আয়ের ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী যাত্রা। আর এর নাম দেওয়া হয়েছে আয়ের বিপরীতমুখী বিচিত্র গতি। Divergent Theory-র সারাংশ এটাই।

এই থিওরির এখন অনেক প্রবক্তা। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন জাভিয়ের সালা-ই মার্টিন (Xavier Sala-i-Martin)। তিনি দেখাচ্ছেন পৃথিবীকে এখন দুইভাগে ভাগ করা যায়। তিনি নামকরণ করেছেন, 'চার-পঞ্চমাংশ আর এক-পঞ্চমাংশ'। পৃথিবীর চার-পঞ্চমাংশ লোক আজ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। আর উন্নতি যা হচ্ছে তা ওই এক-পঞ্চমাংশের মধ্যে।

এই এক-পঞ্চমাংশ এখন দ্রুত উন্নতি করছে। পৃথিবীতে মিলিওনিয়ার ও বিলিওনিয়ারের সংখ্যা বা ক্রোড়পতির সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। তাদের মধ্যে একদল 'আনন্দের সন্ধানে' আকাশে এবং স্পেসে বা বিশ্ব চরাচরে রাশিয়ান রকেট ভাড়া করে অন্তরীক্ষ দর্শনে বেড়াচ্ছেন। বেলুন চেপে অস্ট্রেলিয়া থেকে ল্যাটিন আমেরিকায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ সেইসব দেশেই আবার আয়ের অনৈক্য ক্রমশ বাড়ছে। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৭৯ সালে আমেরিকায় সবচেয়ে বড়লোক প্রথম এক-পঞ্চমাংশের সঙ্গে সবচেয়ে গরিব লোক সর্বনিম্ন এক-পঞ্চমাংশের তুলনা করি তবে দেখব আয়ের তফাত ৯ গুণ ছিল। অর্থাৎ বড়লোকদের আয় যদি ৯ হয় তবে গরিবদের আয় ১ বা ৯ঃ১ রেসিও। ১৯৯৭ সালে এই রেসিও আমেরিকায় বদলিয়ে গিয়েছে। বড়লোক আর গরিব লোকদের আয়ের বৈষম্য ১৫ঃ১ অর্থাৎ ১৫ গুণ বেশি অর্থাৎ আয়ের বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে।

এটি আমেরিকার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমস্ত পাশ্চাত্য দুনিয়াতে ঠিক একই অবস্থা। ব্রিটেনে গরিবদের আসল আয় বছরে ৩ শতাংশ হারে কমছে আর বড়লোকদের ৭ শতাংশ হারে বাড়ছে। জার্মানি এখন—'এক জার্মানি আর দুই দেশ'। পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানির আঞ্চলিক বৈষম্য এমনই প্রকট যে নানান রাজনৈতিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। একটি সমস্যা হল 'নয়া ফ্যাসিবাদ'। ফ্রান্সেও তাই। পৃথিবীতে দেশের মধ্যেই অনৈক্য বাড়ছে। অসাম্য বাড়ছে। দেশে দেশে প্রভেদ যেমন বাড়ছে, দেশের মধ্যেও প্রভেদ প্রকট হচ্ছে।

অথচ পৃথিবীতে সার্বিক কৃষি উন্নতি হচ্ছে। ধারণা করা যায় তাতে 'ক্ষুধার্ত' লোকের সংখ্যা কমবে। তা অবশ্য হচ্ছে না। বর্তমানে ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে ৮০ কোটি থেকে ১০০ কোটি। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিজ্ঞা ছিল এই 'ক্ষুধার্ত' বা হাংগ্রি (Hungry) লোকের সংখ্যা প্রত্যেক ছয় বছরে অর্ধেক করা

হবে। এখন বলা হচ্ছে 'ক্ষুধার্ত' লোকের সংখ্যা কমানো যাচ্ছে না। যা কমেছে তা নেহাতই প্রান্তিক। ২০৩০ সালে যদি 'ক্ষুধার্ত' সংখ্যা অর্ধেক হয় তবেই তা সাফল্য বলে ধরতে হবে।

সবচেয়ে 'ক্ষুধার্ত' ও 'গরিব লোকের' সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে সাহারার দক্ষিণে আফ্রিকায় বেশি। যদিও 'খেতে পায় না ভালো করে শিশুর সংখ্যা' বাংলাদেশেই আনুপাতিক হারে বেশি। ক্ষুধার্তের কারণ অবশ্যই আয়ের বৈষম্য। সাহারার দক্ষিণে আফ্রিকায় 'প্রত্যেক তিনটি লোকের মধ্যে একটি লোক ক্ষুধার্ত'।

বর্তমানে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা রাষ্ট্রপুঞ্জ যা করেছে তা হচ্ছে কত লোক এক ডলারের নিচে আয় করে। তাতে ভারতবর্ষে অন্তর্ত ৩৬ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে। আর আফ্রিকাব যা সংখ্যা তা সবারই লজ্জায় মনকে ব্যথিত করবে। কঙ্গোতে দারিদ্র্যসীমার নিচে প্রায় ৯০ শতাংশ, ইথিওপিয়াতে ৮৫ শতাংশ, জাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, মালি, সোমালিয়া ইত্যাদি দেশে প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ। অর্থাৎ বিরাট সংখ্যক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে। এই আফ্রিকাতে সাধারণভাবে বলা যায় আয়ের বৈষম্য প্রকট। প্রথম এক-পঞ্চমাংশ যদি ৭০ ডলার আয় করে শেষ পঞ্চমাংশ করে এক অর্থাৎ রেসিওটা কোনো কোনো রাষ্ট্রে ৭০ঃ১—শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি। আফ্রিকার অনেক দেশেই উন্নতি হচ্ছে তবে আয়ের বৈষম্যও বাড়ছে। সামগ্রিকভাবে আফ্রিকায় ২০ শতাংশ লোক ৮০ শতাংশ ধনের অধিকারী আর ৮০ শতাংশ লোক ২০ শতাংশ সম্পদের অধিকারী। আশ্চর্য এই যে ভারতবর্ষেও ঠিক এই অবস্থা। অর্থাৎ দেশের উন্নতি হচ্ছে তবে তার ফল পাচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক।

অর্থাৎ দু'রকম আয়ের বৈষম্যের কথা বলা হল। একটি উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের মধ্যে আয়ের বৈষম্য বাড়ছে। আর দ্বিতীয়টি হল একটি দেশের মধ্যেই আবার অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় সব দেশে আয়ের বৈষম্য বাড়লেও কয়েকটি দেশে আয়ের বৈষম্য কমছে। দুটি দেশের উল্লেখ রাষ্ট্রপুঞ্জ করেছে। একটি দক্ষিণ কোরিয়া আর অপরটি চীন। এই দুই দেশে বৈষম্য নিম্নগামী।

এইখানে চীন ও ভারতের একটি তুলনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তৃতীয় ধরনের বৈষম্য প্রধানত বৃত্তিমূলক আর প্রতিষ্ঠানগত। ভারতবর্ষে কোনো কোনো বৃত্তি আছে যেখানে গড় আয় অন্য যে-কোনো বৃত্তি থেকে বেশি এবং অনেকটাই বেশি। উদাহরণ দিলে বোঝানো যাবে।

যে কথা বারবার বলা হচ্ছে সেটা চিকিৎসকদের আয় বা গড় আয় অন্য অনেক বৃত্তি থেকে বেশি। তার অন্য মানে আমরা চিকিৎসা পড়া ব্যবস্থাকে 'Closed shop' অর্থাৎ বন্ধ করে কিছু লোককে মনোপলি সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত করেছি। চিকিৎসকদের আয় কিছুটা মনোপলি আয়। অর্থাৎ যেভাবে

লোকসংখ্যা বাড়ছে তার হিসাব অনুযায়ী কত চিকিৎসক দরকার সেটা করিনি। ভারতে হয়নি অথচ চীনদেশে হচ্ছে। চীনে লোকসংখ্যা বাড়ছে আর চিকিৎসকদের সংখ্যাও বাড়ান হচ্ছে। চীনদেশে এই বৃত্তিকে মনোপলি সুবিধা দিচ্ছে না। অথচ ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বাড়ছে চিকিৎসক সংখ্যা সেইহারে বাড়ানো হচ্ছে না। বলা হচ্ছে সিট নেই, বন্দোবস্ত নেই ইত্যাদি। অর্থাৎ মনোপলি বজায় রাখার চেষ্টা। শুধু চিকিৎসকরাই 'Closed shop'-এর অন্তর্গত তা নয়। বহু বৃত্তিতে ভারতে দরজা বন্ধ। ফলে আয়ের অসাম্য বাড়ার প্রবৃত্তি বাড়ছে।

আর ভারতে অন্য সমস্যা প্রতিষ্ঠানগত। মানে যারা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে তারা প্রেসার গ্রুপ তৈরি করে নিজেদের মাইনে বাড়িয়ে নিচ্ছে। সুযোগ-সুবিধা তৈরি হচ্ছে যারা প্রতিষ্ঠানগত কাজে কোনোরকমে ঢুকে পড়েছে। অর্থাৎ Formal Sector (বা ফর্মাল সেক্টরে) নিজেদের মাইনে ক্রমাগত বাড়িয়ে নিচ্ছে। ভারতবর্ষে হয়তো একই সংখ্যক লোক চাকরি করছে কিন্তু খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। কিন্তু অর্থ সব সময় সীমিত। যারা চাকরিতে আছে তারা মাইনে বাড়াচ্ছে আর তার ফলে অন্য অনেক লোক চাকরিতে ঢুকতে পারল না। যারা মাইনে বেশি বাড়াচ্ছে তাদের জন্য অসংখ্য লোককে বেকার থাকতে হল বা তারা জীবিকার তাগিদে Informal Sector-এ ভিড় করছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বলতে চাচ্ছে ভারতে বেকারি সমস্যার অন্যতম কারণ একদল লোক তাদের মাইনে ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ ভারতে 'বেকারি নীতি' ও 'আয় নীতি' সম্পূর্ণ অবহেলিত।

এখন সর্বত্রই মূল ধরে টানাটানি। প্রশ্ন একটা। 'উন্নতি' কাকে বলে? 'উন্নতি' মানেই কি অসাম্য বৃদ্ধি? বা 'উন্নতি' করতে গেলে অসংখ্য বেকার তৈরি করা প্রয়োজন। পৃথিবীতে যা হচ্ছে সংক্ষেপে হল একদিকে 'আয় বাড়ছে' আর অন্যদিকে প্রায় সর্বত্রই অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে— দেশটি হয়ে যাচ্ছে Divergent বা পরস্পরবিরোধী। প্রশ্নটা রাষ্ট্রপুঞ্জই করছে হয়তো উত্তর পেতে পেতে আরও বেকারি সৃষ্টি হবে।

ডাঙ্কেল খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন আসন্ন

খোদ পাশ্চাত্য দেশে এখন দাবি উঠেছে যে, বিশ্বায়নের দর্শনের পরিবর্তন আবশ্যক। ডাঙ্কেল ড্রাফ্‌টের হাত ধরে যে বিশ্বায়ন তার বয়েস আপাতত দশ বছরের কিছু কম বেশি। এরই মধ্যে দাবি, বিশ্বায়ন সম্বন্ধে পৃথিবীব্যাপী নতুন আলোচনা হোক। হঠাৎ এই দাবি উঠল কেন? কেনই বা আমেরিকা বা জার্মানি বা জাপানে এখন দাবি বড্ড হুড়োহুড়ি করে বিশ্বায়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—কোথাও প্রস্তুতি তেমন ছিল না। ফলে বিশ্বায়নের সঙ্গে এসেছে অভূতপূর্ব বেকারি এবং মন্দা। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বেকার আর কোনোদিনই হয়নি। এখন বলা হচ্ছে পৃথিবী বৈচিত্র্যে ভরা। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, কালচার পৃথিবীতে যখন আছে আর আছে বলে আমরা গর্বিত সেখানে 'এক অর্থনীতি' বা 'এক রাজ্য চালন পদ্ধতি' বা 'একটি দর্শন' থাকতে পারে না। পৃথিবীর বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। যা সত্য আমেরিকায় তা আফ্রিকার কঙ্গোতে নাও হতে পারে। যে নীতি জার্মানিতে চলবে সেই একই নীতি ইন্দোনেশিয়াতে নাও চলতে পারে। পৃথিবীব্যাপী বেকারি। পৃথিবীব্যাপী মন্দা। সবই হয়েছে বিশ্বায়ন দর্শনের গোড়ায় কোথাও গলদ ছিল। গলদটা ঠিক কি তাই নিয়ে অর্থনীতির অন্দর মহলে নানান তর্ক-বিতর্ক।

এই তর্ক-বিতর্কটা উঠেছে একটি প্রেক্ষাপটে। প্রেক্ষাপটটি জানা। গত কয়েক বছর 'মন্দা' বা Reussion-এর পর সবাই আশা করেছিল ২০০৩ জুন মাসের গোড়া থেকে আবার পৃথিবীর অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তা হল না। যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল একটিও সত্য বলে পরিগণিত হল না। বিশ্বব্যাপী মন্দা।

অথচ বিশ্বায়নের দর্শনের প্রথম তত্ত্বই ছিল যে পৃথিবীতে বিশ্বায়নের ফলে বেকারি দূর হবে এবং নতুন নতুন চাকরির সৃষ্টি হবে। তা ঠিক হল না।

জার্মানির কথাই ধরা যাক। ১৯৭৫ সালে জার্মানিতে কোনো বেকারি ছিল না। অর্থনীতি প্রত্যেক বছরে ১০ শতাংশ হারে বেড়েছিল। জার্মানি পৃথিবীর

'দ্বিতীয় বৃহত্তম' দেশ বলে খ্যাতি লাভ করেছিল—বৃহত্তম মানে জাতীয় আয়ের আয়তনে যাকে আমরা বলি GDP। আমেরিকার পরেই ছিল জার্মানি এবং জাপান। এখন সেই জার্মানিতে বেকারি ছাড়িয়ে গেছে কয়েক মিলিয়ন। ছাঁটাই ও শিল্প বন্ধ হওয়া নিত্য ঘটনা। জার্মানির রপ্তানির আর কোনো বৃদ্ধি হচ্ছে না বরং কমছে।

জার্মানিতে শ্রমিকদের যে সামাজিক নিরাপত্তা ছিল তা আর নেই—একটার পর একটা সরকার কেড়ে নিয়েছে। জার্মানি দ্রুত নিচের দিকে নামছে। কোনো দাওয়াই কাজ করছে না। বস্তুত শুধু জার্মানিতে নয়, সমস্ত ইউরোপে এখন মন্দা ও বেকারি। কিছু বছর আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে ইউরোপিয়ানরা একটি 'লিসবন ঘোষণা' করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল ইউরোপে যত একত্রীকরণ হবে তত জাতীয় আয় বাড়বে, শিল্প বাড়বে এবং বেকারি কমবে। কিন্তু ইউরোপে এখন প্রধান সমস্যা যে বিশ্বে মন্দা থাকায় জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে না। আর যত বিক্রি কম হচ্ছে তত শিল্প বন্ধ। যত শিল্প বন্ধ তত বেকারি। আর বেকারি নিবারণে সরকার নীরব দর্শক। বর্তমান বিশ্বায়ন দর্শনে সরকারের চাকরি সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা নেই। সরকার কিছু করতে গেলেই বিশ্বব্যাপী চিৎকার হবে যে 'বিশ্বায়নের নিয়ম' ভাঙা হচ্ছে। ইউরোপে এখন প্রশ্ন, যুদ্ধের পর ইউরোপে ঠিক এই দুর্দশা আগে কখনও হয়েছিল কিনা? বস্তুত হয়নি।

একটি সমীক্ষা ইউরোপে করা হয়েছে প্রায় ৪১টি দেশ নিয়ে। তার প্রধান উপসংহার হল গত ৩০ বছরে এই ধরনের বিশ্বব্যাপী মন্দা আর হয়নি। শুধু যে মন্দা তাও নয় এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'bubble and burst' অর্থাৎ হঠাৎ বাড়ে আর হঠাৎ কমে যায়। হঠাৎ বাড়ে এবং হঠাৎ কমার সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক আছে। চাকরি পেলে তার স্থায়িত্ব কি কেউ জানে না। ফলে সামাজিক ব্যাধি এবং ব্যভিচার বাড়ছে। অর্থনীতিতে যা ঘটছে তার নাম দেওয়া হচ্ছে 'Volatality'—হঠাৎ বিনিয়োগ বাড়ে। তারপর যেই চাহিদা কমে যায়, বিনিয়োগের ক্যাপিটালও দেশ থেকে পালায়। পালান ক্যাপিটাল আবার ফিরে আসে আবার চলে যায়। অর্থাৎ কেউ কোনো 'ভবিষ্যৎ নিয়ে পাকাপোক্ত কিছু বলতে পাচ্ছে না' 'Forecasting সম্ভব নয় বা করার চেষ্টা হলে তা ভুল বলেই প্রমাণ হবে। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতি দশ বছরে একবারও মন্দা হয়েছে কিনা সন্দেহ। একজন অর্থনীতিবিদ ভিক্টর জারনভিচ অন্তত তাই বলছেন। কিন্তু বিশ্বায়নের পর প্রতি পাঁচ বছরে দু'বছর-তিন বছর মন্দা, আর মন্দা এলে সহজে যায় না। যত বিশ্বায়ন বাড়ছে তত মন্দার সময়কালও বাড়ছে। ঠিক কি কারণে মন্দা হচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়। আবার কি করে দূর হবে তাও জানা যাচ্ছে না।

জার্মানির মতো জাপানেও মন্দা। ৬০-৭০ দশকে এবং ৮০-র দশকে

জাপানে উন্নতির হার ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। কোনো বছর ১০ শতাংশ হারে, কোনো বছর ১৫ শতাংশ হারে জাপানের জাতীয় আয় বেড়েছিল। ২০০২-২০০৩ সালে জাপানের বৃদ্ধির হার এক শতাংশও কিনা সন্দেহ। বলা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মন্দা বোধহয় জাপানে। জাপানে জাতীয় আয় এক শতাংশ হারেও গত দশ বছরে বাড়েনি। জাপান সব রকম চেষ্টা করেছিল দেশকে চাঙা করার জন্য। সব চেষ্টাই বিফল। জাপান কী কী চেষ্টা করেছিল তা সামান্য হলেও বলা যাক।

মন্দা আর বেকারি হলে আই এম এফ বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার একটি প্রেসক্রিপশন সবাইকে ধরায়। একটি ওষুধ তাদের জানা। সেই ওষুধটির নাম সুদের হার কমাও। জাপান কথামতো সুদের হার কমাতে আরম্ভ করল। কমাতে কমাতে জাপানে সুদের হার এখন শূন্য শতাংশে। কিন্তু যেই মন্দা সেই মন্দাই থেকে গেল। জাতীয় আয়ের কোনো উন্নতি হল না। শূন্য শতাংশ করাতেও দেশে বিনিয়োগ বাড়ছে না বরং দেখা গেল ব্যাঙ্কের আয় কমে যাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলি একটির পর একটি বন্ধ হবার যোগাড়। জাপান সরকার ব্যাঙ্কগুলি বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনতে আরম্ভ করল। এদিকে ব্যাঙ্কের শেয়ার যত কেনে তত বেশি বাজেট ঘাটতি। ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম বাজারে ক্রমাগত নিচের দিকে। যত নিচের দিকে তত ব্যাঙ্কিং সিস্টেম ভেঙে পড়ার যোগাড়। যত ব্যাঙ্কের দুর্দশা বাড়ে তত বেশি জাপান সরকার টাকা ঢালে শেয়ার কেনার জন্য।

এর ফলে জাপানে বাজেট ঘাটতি তার জাতীয় আয়ের শতাংশ হারে বাড়ছে। ১৯৯০ সালে জাপানে বাজেট ঘাটতি ছিল জাতীয় আয়ের এক থেকে দুই শতাংশ। এখন ২০০৩ সালে তা বাড়তে বাড়তে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে প্রায় ১৫ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ বিপুল ঘাটতি। আর এই ঘাটতি মেটাতে গিয়ে নানান সামাজিক খরচ কাটছাঁট করা হচ্ছে। পৃথিবীতে একটি ঘটনা বিরল। তা হচ্ছে উন্নতির সঙ্গে মানুষের আয়ু বাড়ে, যাকে আমরা বলি Life Expectancy—জাপানে কি গড় আয়ু কমে যাচ্ছে? অনেকে সন্দেহ করছে মন্দার প্রভাবে জাপানে তাই ঘটেছে। অন্তত বিশ্বায়নে রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে গড় আয়ু ক্রমশ কমছে। যত বেকারি তত বেশি জাতীয় Frustration ফলে অনেক দেশে বিশ্বায়নে গড় আয়ু কমছে। ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। ঘটলেও খুব কম। খোদ আমেরিকায় এখন নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হচ্ছে। আমেরিকায় রিসেসন। রিসেসন কমাতে গিয়ে বিনা কারণে ইরাক যুদ্ধ। যুদ্ধের পরেও আমেরিকায় অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শেয়ার বাজারে Bust দাম অধোগতি। বড় বড় কোম্পানিগুলি মিথ্যা অডিট করে মুনাফা দেখাতে চায়। তারা ভাবে যত মুনাফা বাড়বে তত বাজারে শেয়ার বিক্রি করা সোজা হবে—বিনিয়োগ বাড়বে। কিন্তু বড় বড় কোম্পানির মিথ্যা

অডিট যেই ধরা পড়ে কোম্পানি হয় দেউলিয়া। যেমন হয়েছে এনরন। এনরন ছাড়াও বহু কোম্পানি দেউলিয়া। আমেরিকার উন্নতির হার কমতে কমতে এখন ১.২৫ হারে। ফলে বেকারির আবির্ভাব। আমেরিকার অর্থনীতিতে এখন এক ধরনের হাহাকার। বলা হচ্ছে দশ বছর আগে আমেরিকাতে বেকারি প্রায় ছিল না। এখন ১১ শতাংশ হারে বেকারি বৃদ্ধি। তার মানে বহু শিল্প বন্ধ, বহু প্রচ্ছন্ন বেকার কিংবা পূর্ণ বেকার।

এই অবস্থায় আমেরিকার রাজনীতি ও অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই ওয়াল স্ট্রিটে বা বিশাল বিরাট হাঙ্গর ব্যবসায়ীরা চাচ্ছে আমেরিকার নীতির পরিবর্তন হোক। আমেরিকাতে সুদের হার ১ শতাংশের কিছু বেশি। অর্থাৎ সুদের হারের পরিবর্তন করলেই অর্থনীতি চাঙা হবে তেমন ভাবনা আর কেউ করে না। কত আর সুদ কমানো যাবে! ওয়াল স্ট্রিটই চাচ্ছে সমস্ত 'বিশ্বায়ন' ব্যাপারটা আবার আলোচিত হোক। খোদ রাষ্ট্রপুঞ্জ 'বিশ্বায়ন' ব্যাপারটি পরির্বতন চাচ্ছে। সমস্ত আফ্রিকা জ্বলছে, গৃহযুদ্ধ প্রায় প্রত্যেক দেশেই। চাপে পড়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক 'অন্য' কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে।

অর্থাৎ কিছুদিন বাদেই হয়তো আগামী সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে সবাই নতুন করে বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা করবে। বলা হচ্ছে 'কানকুন কনফারেন্সে' কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যাতে বিশ্বব্যাপী মন্দার মোকাবিলা করা যায়। প্রশ্ন উঠেছে বর্তমানে রিসেসন না ডিপ্রেশন।

পরিবর্তন যে আসছে সবাই সেটা বুঝছে। আর চীনও সেটা জানে। তাই আগামী কানকুন কনফারেন্সে অনুন্নত দেশগুলি যেন একত্রে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে চীন ও ভারত তাই কাছাকাছি আসছে। পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তন আসন্ন।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের প্রতিষ্ঠা হল

পৃথিবীতে ১৫ জুলাই ২০০২ সালে নতুন একটি সংস্থা তৈরি হল। তার নাম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট—যদিও শেষ পর্যন্ত নামকরণ ঠিক কি হবে তা নিয়ে এখনও মতান্তর আছে। এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের সদিচ্ছায় তৈরি হয়নি। বস্তুত, বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র এই ধরনের আন্তর্জাতিক কোর্ট না হয় তাতে বাধা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হল তার কারণ কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা যারা চিরকাল মানুষের অধিকারের জন্য সোচ্চার তাদের চাপেই শেষ পর্যন্ত হল। অর্থাৎ যাদের আমরা বলি সিভিল রাইট একটিভিস্ট (Civil Right Activists) তাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল এই কোর্ট। কোনো রাষ্ট্রের সদিচ্ছায় এই কোর্ট তৈরি হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্র বাধা দিয়েছিল এবং এখনও বাধা দিয়ে যাচ্ছে।

একটু ইতিহাস বলা যাক। পৃথিবীতে দেখা গেছে বহু 'জনপ্রিয়' নেতা এবং 'সদাশয় ডিকটেটর' মানুষের সব অধিকারকে নিজেদের দেশে বঞ্চিত করেছে। কথায় কথায় সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। বিনা বিচারে আটক রেখেছে। ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। ধর্মের নামে অন্য সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেছে।

'Ethnic Cleansing' এবং 'Religions Cleansing' এখন প্রায়ই ব্যবহার করা হচ্ছে। পৃথিবীতে অনেক দেশেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। পৃথিবীতে বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এদের কি কোনোদিনই বিচার হবে না? নেতারা নিজেদের দেশে হয়তো ক্ষমতাশালী তাই নিজেদের দেশে হয়তো তাদের বিচার হওয়া অসম্ভব। তবে আন্তর্জাতিক আদালতে কি তাদের বিচার হবে না? যে সব ক্রিমিনালরা দেশে দেশে রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং আতঙ্ক ও সন্ত্রাস যারা রাষ্ট্রের নীতি নিয়েছে তাদের বিচার কি হবে না? প্রশ্নটা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অসংখ্য লোকের। পৃথিবীতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক যে এখনও আছে তার প্রমাণ এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের প্রতিষ্ঠা।

৫০ বছর ধরে এই চেষ্টা চলছে। বস্তুত জার্মান ফ্যাসিস্টদের যখন নুরেমবার্গে বিচার হয় তখন কথা হয়েছিল এই ধরনের কোর্ট থাকা দরকার। জার্মানরা কত ইহুদিকে মেরেছিল? যাকে বলা হয় Ethnic cleansing? বলা হচ্ছে প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদি মারা হয়েছিল। এবং বিনা কারণে। তখন থেকেই চেষ্টা হচ্ছে এই ধরনের কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা। তবে সাফল্য সহজে আসেনি। ৫০ বছর ধরে চেষ্টা করেও বিশেষ অগ্রসর হওয়া যাচ্ছিল না। কারণ ইউরোপের অনেক দেশ এবং আমেরিকার প্রবল আপত্তি। যখনই রাষ্ট্রপুঞ্জে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথা হয় তখনই আমেরিকা 'ভেটো' (Veto) প্রয়োগের হুমকি দেখায়। ফলে অগ্রসর হওয়া যায়নি। পরিবর্তন হল কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। সবারই একটা ধারণা হল 'রাজনীতিবিদ নামক নরঘাতকদের' একটি বিচার ব্যবস্থা থাকলে এবং সুস্পষ্ট আইন থাকলে এই নেতাদের শাস্তি দেওয়া সহজ হবে।

প্রথম ঘটনা স্লোবোডান মিলোসেভিচকে (Slobodan milosevic) নিয়ে। তিনি ছিলেন সার্বিয়ার ডিকটেটর। নিজেকে ক্ষমতায় রাখবার জন্য অন্য ধর্মাবলম্বী ও অন্য ভাষাভাষীদের মারা তিনি প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে করে নিয়েছিলেন। গ্রামের পর গ্রাম তাঁর মিলিটারি অসংখ্য লোকদের অত্যাচার করে মেরে ফেলেছিল। 'Ethnic Cleansing'কে তিনি রাষ্ট্রের নীতির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে ডিকটেটরদের পতন হল। দেশের লোকরাই তাঁর বিচার চাইল। বর্তমানে হেগে (Hague)-এ তাঁর বিচার হচ্ছে। তাঁর পক্ষে উকিল তিনি নিজেই। তাঁর যুক্তি হল হেগের যে কোর্টে তাঁর বিচার হচ্ছে সেটির স্বীকৃতি কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা দেয়নি। আন্তর্জাতিক আইন বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ল (Law) বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। যে দেশ যুদ্ধে জেতে তারাই তাদের আইনে পরাজিতদের বিচার করে। আর তাঁর শেষ কথা বসনিয়াতে (Bosnia) তিনি যা করেছেন তা যুদ্ধের খাতিরে করেছেন অতএব বেশ করেছেন। হেগের ক্রিমিনাল কোর্টের কোনো আইনগত স্বীকৃতি নেই।

দ্বিতীয় ঘটনা হল, আফ্রিকার সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ তুটসির সঙ্গে হুটুদের। যে বিরাট এলাকায় এই গৃহযুদ্ধ ১০ বছরের বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল তার আয়তন সামগ্রিকভাবে ইউরোপ থেকে বেশি। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই গৃহযুদ্ধ রোয়ান্ডা (Rwanda) বরুন্ডি (Burundi) কঙ্গো অথবা জেয়ার (Zaire), সুদান, তানজানিয়া ও উগান্ডায়। যদিও সবচেয়ে বেশি হয়েছিল রোয়ান্ডা ও বরুন্ডিতে। ঠিক কত লোক মারা গেছিল হিসাব নেই। অনেকে মনে করে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার হুটু-তুটসি মারা যায় একটি বছরে। কারুর কারুর ধারণায় সবশুদ্ধ ৫ লাখ থেকে ৭ লাখ মারা গিয়েছে। হয়তো আরও বেশি। আর রিফিউজি হয়েছে অন্তত ২০ লাখ। অর্থাৎ কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে আরও বেশি লক্ষ দেশছাড়া। অথচ যারা এই নৃশংস Ethnic

Cleansing-এর জন্য দায়ী তাদের কোনো বিচার হল না। বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন নেই।

এই অবস্থায় কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক স্পষ্ট আন্তর্জাতিক আইন চায়। রাজনীতিবিদদের ধরে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার চায়। ১৯৯৮ সালে রোমে আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়। তাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের ১২০টি দেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট তৈরি করতে সম্মত হয়।

বলা বাহুল্য ১২০টি দেশের মধ্যে আমেরিকা ছিল না। আমেরিকার ভয় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার হলে হয়তো তাদের প্রেসিডেন্টের বিচার হবে একদিন। তবে আমেরিকার উপর চাপ অব্যাহত থাকে। আমেরিকা নিকারাগুয়া, ভেনেজুয়েলা থেকে ইরাক-ইরান ইত্যাদি দেশের প্রতি অকারণে বোমা মেরে সহস্র সহস্র লোকদের মেরেছে।

অবশেষে আপস মীমাংসার একটি সূত্র বের হল। সূত্রটি হচ্ছে জুলাই ২০০২ 'Cut of year' অর্থাৎ একটি বছর ঠিক করা হবে তার আগে যে সব ঘটনা এবং অত্যাচার ঘটে গেছে তার বিচার হবে না। দ্বিতীয় আপস হল যে সিকিউরিটি কাউন্সিল ইচ্ছা করলে বলতে পারে যে নেতাদের বিচার স্থগিত রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ সিকিউরিটি কাউন্সিলের 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার থেকে গেল। আমেরিকার তাতেও আপত্তি। আমেরিকার জিজ্ঞাস্য ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের বিচার কি কোর্ট করবে? যখন বলা হল, যদি সাদ্দাম আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে, তবে তার বিচারও হতে পারে।

আমেরিকার আরও আপত্তি। আমেরিকার সৈন্য পৃথিবীতে নানান জায়গায়। এইসব সৈন্যর একাংশ ইউনাইটেড নেশনস্-এর তত্ত্বাবধানে আছে যেমন বসনিয়া। আবার আমেরিকার সৈন্য নিজস্ব ফ্ল্যাগে আছে আফগানিস্তানে। সবাই জানে আফগানিস্তানে যত্রতত্র আমেরিকা আল কায়দার খোঁজে বোমা (Bomb) ফেলছে। কিছুদিন আগে বিয়েব এক ভোজসভায় বোমা মেরে কয়েকশ' লোককে মেরেছে। এটি কি আন্তর্জাতিক আইনের ভঙ্গ?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যদি আমেরিকার সৈন্যরা রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে 'শান্তি' বজায় রাখতে গিয়ে মানবিক অধিকার ভঙ্গ করে তবে তাদের ১২ মাস পর্যন্ত ক্ষমা করা যেতে পারে। চিরকাল এই 'ক্ষমা' চলবে না। অর্থাৎ চিরকালের জন্য 'দায়মুক্ত' হবে না। আইনের ভাষায় ইমিউনিটি Immunity) পাবে না। অর্থাৎ আমেরিকা চিরকালের জন্য ইমিউনিটি চাইছিল, আপাতত রাষ্ট্রপুঞ্জ তাতে রাজি হয়নি। এই নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে বিরাট এক তর্ক। আমেরিকার প্রতিনিধি নেগরোপনটে (Negropointe) তাঁর বক্তৃতায় বলেন—'আমেরিকার অধিকার আছে পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা। তার জন্য সমস্ত আমেরিকার নাগরিকদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। এছাড়া আমেরিকা এই কোর্টে যোগদান করবে না। কেউ যেন মনে না করে যে এই কোর্টের রায় আমেরিকার

উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমেরিকার এই বক্তব্য অন্য দেশগুলি মানল না। দেখা গেল চীন ও রাশিয়াও 'আইনের চক্ষে সবাই সমান' এই নীতিতে বিশ্বাসী। আমেরিকার নাগরিকদের সম্বন্ধে কোনো স্পেশাল ট্রিটমেন্ট (Special Treatment) দিতে রাজি নয়।

এখন পর্যন্ত ৭৬টি দেশ কোর্টের স্থাপনাকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের দেশে পার্লামেন্টে আইন পাশ করেছে। অর্থাৎ পার্লামেন্টে অনুমোদন করেছে। এর নাম হচ্ছে 'র‍্যাটিফাই' (Ratify) করেছে। এই ৭৬টি দেশের মধ্যে ইউরোপের সব দেশই আছে। আর আছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা। কানাডার প্রতিনিধি রাষ্ট্রপুঞ্জে বলেই ফেললেন 'আমেরিকা এই বিষয়ে যা করছে তার ভদ্র ভাষায় নাম হচ্ছে গুণ্ডামি'। কানাডার অ্যামবাসাডর পল হাইন বেকার যেই এই কথা বললেন তখনই আমেরিকা প্রায় 'ভেটো' দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধ সাধল আমেরিকার সিভিল রাইট অ্যাকটিভিস্টরা (Civil Right Activists)।

তাদের ধারণা আমেরিকা ভেটো দিলে পৃথিবীব্যাপী আমেরিকার নেতৃত্ব নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দিবে। আমেরিকা এখন পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট নিয়ে কোনো 'ভেটো' প্রয়োগ করেনি। অতএব ১৫ জুলাই ২০০২ সালে এই নতুন সংস্থা তৈরি হল। আমেরিকা আপাতত র‍্যাটিফাই করেনি।

তা সত্ত্বেও সুপার পাওয়ারের কথা কেউ শোনেনি। নতুন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। নতুন বিচার ব্যবস্থা। সব অত্যাচারীই যে ভীত ও সন্ত্রস্ত তা মনে করার কোনো কারণ নেই। হয়তো আমেরিকাই ধরে ধরে তাদের শত্রুদের বিচার করবে আর পৃথিবীর শান্তির জন্য সর্বত্র বোমা আর মিসাইল ফেলবে।

ব্যবস্থাটা একপেশে কিনা কিছুদিন বাদে জানা যাবে।

আই এম এফের বার্ষিক সভা ও ডলারায়ন

প্রত্যেক বছরে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে আই এম এফ বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বা বিশ্বব্যাঙ্কের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরেও হল তবে একটু দেরিতে। ওয়াশিংটনের এই সভায় পৃথিবীব্যাপী নানান মিটিং, মিছিল বিশেষত শ্রমিকদের। এই বছরেও তার ব্যতিক্রম হল না। হাজার হাজার লোকের আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নীতির বিরুদ্ধে নানান স্লোগান। কিন্তু এই বছরের বাৎসরিক সভায় নতুন একটি বিশেষত্ব আছে। এইবার আই এম এফের বিরুদ্ধে নালিশ এল মুখ্যত সদস্য দেশগুলি থেকে।

সমালোচনা এল অন্তত চারদিক থেকে। প্রথম সমালোচনা এল ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে। তাদের মতে, আই এম এফের নীতির ফলে আজ ল্যাটিন আমেরিকার এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আই এম এফ ঋণ দেয়। কিন্তু এমন সব শর্ত চাপায় যে তা পালন করতে গিয়ে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে মন্দা। দ্বিতীয় সমালোচনা এল ভারতের মতো দেশ থেকে। তাদের মতে, আই এম এফ মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলে তবে তা প্রযোজ্য করে অনুন্নত দেশের উপর—অথচ আমেরিকা তাদের রক্ষণশীল নীতি অক্ষত রেখেছে আর এই সব দেশের বিরুদ্ধে আই এম এফ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বা নিতে চাচ্ছে না। তৃতীয় সমালোচনা এল রাশিয়া এবং অন্যান্য একদা সোসালিস্ট দেশ থেকে। তাদের বক্তব্য, আই এম এফ অর্থ সাহায্য যা দেবে বলে তা দেয় না। বরং সাহায্য করা থেকে আগেকার ঋণ শোধের উপর জোর দেয়। আর ঠিক সময়ে ঠিকমতো সাহায্য করে না বলে রাশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের অর্থনীতিতে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। সোসালিজম রাখতে পারবে না অথচ ক্যাপিটালিজম আসেনি। আই এম এফের বদান্যতায় পূর্ব ইউরোপে এখন এক ধরনের 'মাফিয়া ক্যাপিটালিজম'। এই ধরনের 'মাফিয়া ক্যাপিটালিজমের' অপর নাম 'crony capitalism' বা কিছু অসৎ লোক সুযোগ

বুঝে রাষ্ট্রাধীন শিল্পকে অধিগ্রহণ করছে। আর তার পেছনে আছে আই এম এফ এবং আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট বা শেয়ার বাজারের কিছু দালাল গোষ্ঠী। চতুর্থ সমালোচনার ঝড় বইল ইউরোপের কিছু দেশ থেকে। আই এম এফ যে নীতি আমেরিকার নির্দেশে গ্রহণ করেছে তা মূলত সুদের হারের পরিবর্তন। অর্থাৎ রেট অফ ইন্টারেস্ট বা সুদের হার কমালেই শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এমন আশাই আই এম এফ করে। সুদের হার ক্রমশ কমানো হয়েছে এখনও হচ্ছে অথচ শিল্প বা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে না। শুধু সুদের হার কমালেই কি অর্থনীতিতে গতি আনা সম্ভব? আই এম এফ সব বিকল্প ব্যবস্থাই নাকচ করে দিয়েছে। ফলে সুদের হার কমছে অথচ অর্থনীতির কোনো পরিবর্তন আসছে না।

সুদের হার সর্বত্রই কমানো হয়েছে। জাপান বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে সুদের হার শূন্য। অর্থাৎ সুদ জাপান থেকে উঠে গেছে। শূন্য শতাংশের নিচে সুদের হার কমানো যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জাপানের অর্থনীতি তাতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেনি। ইউরোপেও সুদের হার ক্রমশ কমছে। কিন্তু তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। জাপানে শূন্য শতাংশ সুদের হার হওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলি প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। জাপানে ব্যাঙ্কগুলিকে চাঙা করার জন্য জাপান সরকার ব্যাঙ্ক থেকে শেয়ার কিনছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনার ফলে জাপানে সরকারি অর্থ অন্যত্র চালান হয়ে যাচ্ছে। যেখানে দরকার সেখানে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে না। জাপান ভাবছে বাজেটে ঘাটতি বাড়াবে। কিন্তু আই এম এফ এই বাজেট ঘাটতির বিপক্ষে। তাই জাপান, যেটাকে বলা হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এখনও পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুদ কমানোর উপায় নেই। তবে কি বাজেটে ঘাটতি বাড়ানো উচিত?

সুদের হার কমানোর ফলে পৃথিবীব্যাপী নানান সমস্যার মধ্যে অন্য একটি সমস্যা বাড়ছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বুদবুদ (Bubble) বাড়ছে। সমস্যাটা সংক্ষেপে বলা যায়। সুদের হার কম। তাই ফাটকাবাজারিরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করছে। শেয়ার বাজারে হঠাৎ শেয়ারের দাম বাড়ছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির সঙ্গে আসল অর্থনীতি (বা Real Economy-র) কোনো সম্পর্ক নেই। হঠাৎ যেমন বাড়ছে হঠাৎ তেমন কমছে। শেয়ার বাজারে এই ওঠা-নামায় সমগ্র পৃথিবীর শিল্প জগতে এক 'আকস্মিকতা'। বাজার ঠিক কি ধরনের ব্যবহার করবে তা আগের থেকেই কেউ বলতে পারছে না। বাজার সম্পর্কে ধারণা কারুর পরিষ্কার নয়। ফলে শিল্পে বিনিয়োগ প্রায় বন্ধ।

তবে একটা জিনিস পরিষ্কার। ইউরোপের শিল্প ইউরোপের অর্থনীতির উপর আর নির্ভর করছে না। আমেরিকা কি করবে তার উপর নির্ভর করছে বিশ্ব অর্থনীতি। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকার শেয়ার

বাজারের সঙ্গে ইউরোপের শেয়ার বাজারের Correlation বা সম্পর্ক ছিল ০.০ থেকে ০.৪ শতাংশ। অর্থাৎ সম্পর্ক ছিল তবে সামান্য। অধিকাংশ সময়েই সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। কিন্তু ২০০১ আর ২০০২ সালে Correlation প্রায় ০.৮ থেকে ০.৯ বা খুবই ঘনিষ্ঠ। আমেরিকায় যা হবে ইউরোপ তথা বিশ্ববাজারে তার প্রতিফলন ঘটছে। অর্থাৎ বিশ্বে পরস্পরের নির্ভরশীলতার বদলে যেটা বাড়ছে তার নাম দেওয়া হচ্ছে 'পরনির্ভরশীলতা'। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ আর কোথাও নেই আমেরিকা ছাড়া।

আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতা কেন বাড়ছে তার কারণ হিসেবে নতুন একটা কথা ব্যবহার আই এম এফ করছে। কথাটি 'Washington Consensus'-বা অন্যভাষায় 'সর্বসম্মতি' মানে ওয়াশিংটন যা বলবে তাকে মেনে নেওয়া। তবে ওয়াশিংটন থেকে যা বলা হবে তাই হবে আই এম এফের বিশ্বনীতি এটা মানতে অনেকের আপত্তি।

ওয়াশিংটন বিশ্বনীতি ঠিক করছে। তার ফলে অনুন্নত দেশগুলি তাদের বাণিজ্যের দুয়ার আমেরিকার কাছে খুলে দিয়েছে। কিন্তু 'প্রস্তুতি' ছাড়াই। প্রস্তুতি না থাকার ফলে আর্জেন্টিনার পতন আর ব্রাজিলের পতন আসন্ন। ব্রাজিলকে আই এম এফ বহু টালবাহানার উপর অর্থ সাহায্য করেছে। প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার ব্রাজিলে ঋণ দেওয়া হয়েছে। কারণটা অবশ্য ব্রাজিলে নির্বাচন। আমেরিকার বশংবদ প্রেসিডেন্টকে চাঙা করতেই এই ঋণ। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ব্রাজিলের নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে যা ফলাফল তাতে ফার্নান্ডো হেনরিক কারদামোকে বিপুল ভোটে হারাতে চলেছে লেবার পার্টির বা বামপন্থী লুইজ ইকসিও লুলা দ্য সিলভা বা সংক্ষেপে লুলা। লুলার জেতাতে আমেরিকা এখন ব্রাজিলকে নিয়ে ঠিক কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। হয়তো ভবিষ্যতে জানা যাবে। তবে আমেরিকান সরকার আপাতত লুলার উপর ভয়ানক খাপ্পা। গণতন্ত্রর নতুন ব্যাখ্যা এই করে আই এম এফ থেকে শোনা গেল Washington Consensus—অর্থাৎ কোনো গণতন্ত্রই স্বীকার্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াশিংটন তাকে স্বীকৃতি দেয়।

এইবার আর আমেরিকা গণতন্ত্র ইত্যাদির মতো 'ফালতু' পথে হাঁটছে না। তারা ল্যাটিন আমেরিকায় যা করতে যাচ্ছে তার নাম দেওয়া হচ্ছে 'Dollarisation'-বা ডলারায়ন।

বিশ্বায়ন কথাটির সঙ্গে লোকদের পরিচিতি হয়ে গিয়েছে। বিশদ ব্যাখ্যার দরকার নেই। তবে 'ডলারায়ন' কথাটি ২০০২ সাল থেকে চালু হল। আর সিদ্ধ হল এইবার আই এম এফের বার্ষিক সভায়।

ডলারায়ন কাকে বলে? এটা সবারই জানা যে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব 'মুদ্রা' আছে। ভারতে এই মুদ্রার নাম রুপি। রুপির উপর ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে। ফলে কত রুপি বাজারে ছাড়া হবে বা আর্থিক নীতি ঠিক কি হবে তা

ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঠিকঠাক করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবার ব্যাঙ্ক বা অন্য বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের রুপির উপর নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র।

আমেরিকা এই 'স্বাধীনতা' ল্যাটিন আমেরিকায় বিশেষ পছন্দ করছে না। অর্থাৎ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে তাদের নিজস্ব মুদ্রা উঠিয়ে দিয়ে আমেরিকার মুদ্রা ডলারকে সেই দেশে একমাত্র মুদ্রা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

এল সালভাডোর একটি স্বতন্ত্র দেশ। তার নিজস্ব মুদ্রা ছিল জানুয়ারি ২০০২ সাল পর্যন্ত। আমেরিকার চাপের কাছে নতিস্বীকার করে এল সালভাডোরের মুদ্রা উঠিয়ে দেওয়া হল। এখন থেকে তারা বেচা-কেনা, মাইনে, ব্যবসা সব আমেরিকার ডলারে করবে। এল সালভাডোরের মুদ্রার নাম ছিল 'কোলন'। 'কোলন' উঠিয়ে এখন আমেরিকার ডলার চালু করা হল।

এল সালভাডোর একমাত্র নয়। গুয়েতেমালার মুদ্রা কুইৎজেল এখন ওই দেশে স্বীকৃত নয়। ওখানেও আমেরিকার ডলার 'একমাত্র মুদ্রা' হিসাবে চালু করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আর্জেন্টিনা এবং ইকুওডোর। এখনও ডলার একমাত্র মুদ্রা হয়নি তবে প্রস্তুতি চলছে। পানামার উপর চাপ অব্যাহত।

অর্থাৎ নিজস্ব মুদ্রা থাকলে অর্থনীতির উপর যা নিয়ন্ত্রণ থাকত তা এইসব দেশে আমেরিকা আর করতে রাজি নয়। সমস্ত ল্যাটিন আমেরিকাকে আমেরিকার মুদ্রাই নিয়ন্ত্রণ করবে। আর এর ফল হচ্ছে 'ডলারায়ন'।

আশ্চর্য এই যে আই এম এফ এইবারের বার্ষিক সভায় এই 'ডলারায়নে' উৎফুল্ল। তবে এল সালভাডোরের জনসাধারণ খুশি নয়। ওখানে এখন সরকারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

'বিশ্বায়নে'র পর 'ডলারায়ন' আরম্ভ হল। ভারতবর্ষ এর থেকে কোনো শিক্ষা নেয় কিনা তা জানার অধিকার সবারই আছে। আমরা যে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছি তার ইঙ্গিত আপাতত নেই। মনে রাখা দরকার 'বিশ্বায়নে'র পরের পদক্ষেপ 'ডলারায়ন'।

আমেরিকার ইচ্ছানুযায়ী যে পৃথিবী চলবে না তা এখন পরিষ্কার

ডাঙ্কেল প্রস্তাব প্রায় এক বছর আগে গৃহীত হয়েছে। সেই সময় অনেক বাদানুবাদ ও মতান্তর ছিল যে ডাঙ্কেল প্রস্তাব ভারতের মতো দেশে কতখানি উন্নতি ও স্বার্থের পরিপন্থী। অনেকের ধারণা ছিল উন্নত দেশগুলি গ্যাট ও ডাঙ্কেল প্রস্তাব জোর করে চাপিয়ে দিয়ে পৃথিবীব্যাপী এক নয়া-কলোনিয়াল অর্থনীতি তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। এই নয়া কলোনিয়াল অর্থনীতি থেকেই আসবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের এক বছর বাদে এখন সময় এসেছে কতদূর ডাঙ্কের প্রস্তাব ভারতের মতো অর্থনীতিতে বিশেষত বিশ্ব বাণিজ্যে সহায়ক হয়েছে। কারণ, ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিশ্ব বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, মুক্ত বাণিজ্য ও মুক্ত প্রতিযোগিতা।

গত এক বছরে যা ঘটনা ঘটেছে তা সংক্ষেপে বলা যাক। পৃথিবীতে অধিকাংশ উন্নত দেশ তাদের বিশ্ব বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত বজায় রেখেছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্যে বিপুল পরিমাণে ঘাটতি করেছে। যেমন কানাডা গত বছরে বিশ্ব বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত করেছিল প্রায় ৫.৬ বিলিয়ন ডলার। জার্মানি প্রায় ১৫.২ বিলিয়ন ডলার। সেই জায়গায় আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৫৩.৪ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকা ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুযায়ী বাণিজ্যে যতখানি লাভ করবে ভেবেছিল তা পারেনি। জার্মানি যেন তেন প্রকারেণ উদ্বৃত্ত বজায় রাখার জন্য আর আমেরিকা তার ঘাটতি কমাবার জন্য এমন সব ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে মনে হয় ডাঙ্কেল প্রস্তাব এই সব উন্নত দেশগুলি মানছে না। অর্থাৎ যারা ডাঙ্কেল প্রস্তাব এনেছিল সেই সব উন্নত দেশগুলিতে এখন প্রচণ্ড গোলমাল যে এই চুক্তির ফলে তাদের ক্ষতি হল কিনা। অনেক উন্নত দেশই চাইছে এই ডাঙ্কেল প্রস্তাব থেকে মুক্তি। বিশেষত

আমেরিকায় এখন তর্ক তুঙ্গে, যা আমাদের ভারতে এক বছর আগেই ঘটে গেছে।

মুক্ত বাণিজ্য কথাটার মানে বোঝা যাক। ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম রাউন্ডে বিশ্ব বাণিজ্যে সব দেশই তাদের শুল্ক বা যাকে বলা হয় টেরিফ (Tariff) তা কমবে। গড় হিসেব বলা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীতে আমদানি শুল্ক গত বছরে কমানো হয়েছে ৩৩ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। বলাই বাহুল্য বিভিন্ন দ্রব্যে শুল্কের হার বিভিন্ন ভাবে কমেছে। এছাড়া লাইসেন্স, কোটা, পারমিট প্রথা, এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ইত্যাদি হয় উঠে গেছে কিংবা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে এবং যত তাড়াতাড়ি এই আমদানি শুল্ক বিলোপ করা হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মুক্ত বাণিজ্যই স্লোগান আর মুক্ত বাণিজ্যের জন্যই পৃথিবীর আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে শিথিল করা হয়েছে।

আমেরিকার কথাই ধরা যাক। মুক্ত বাণিজ্য মানে মুক্ত প্রতিযোগিতা। আমেরিকার দু'শ বছরের ইতিহাসে কখনই মুক্ত বাণিজ্য ছিল না। আমেরিকার উন্নতি অনেকটাই হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের উপর নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে। আমেরিকা বা জার্মানি এই দুটো দেশেই ছিল ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রটেকশন (Protection) বা সংরক্ষণ নীতিতে বিশ্বাসী। তাদের দেশে অনেক শিল্পই গড়ে উঠেছিল বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক আরোপ করে নিজের দেশের শিল্পের প্রসার। অর্থাৎ আমেরিকা ও জার্মানি নিজেদের দেশে ঐতিহাসিকভাবে সংরক্ষণ নীতি চালু রেখে 'অন্যান্য'দের মুক্ত বাণিজ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছে। সবই অবশ্য নিজের স্বার্থে।

ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুযায়ী আমেরিকা ও জার্মানি তাদের আমদানি শুল্ক কমাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে দেখা গেল অনুন্নত দেশের অনেক পণ্যের চাহিদা আমেরিকায় বেড়ে গেল। কারণ অনুন্নত দেশের পণ্য সস্তা আর গুণগত মানও এমন কিছু খারাপ নয়। ফলে আমেরিকার অনেক শিল্প প্রতিযোগিতামূলক বাজারে হয় রুগ্ন হল কিংবা বন্ধ। অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে আমেরিকার ঘাটতি বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেল। দেশের শিল্প লবি নানা দাবি তুলতে আরম্ভ করল যে, অনুন্নত দেশ থেকে দ্রব্য বা পণ্য আমদানি কমাতে হবে।

কিন্তু আমেরিকা নিজে ডাঙ্কেল চুক্তি স্পনসর করেছে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমেরিকা এই অনুন্নত দেশের দ্রব্য আমদানি বন্ধ করার চেষ্টা করল—ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বাইরে। আমেরিকা তার নাম দিল 'সোসাল ক্লস' বা 'সামাজিক ধারা'। এই সামাজিক ধারাগুলি আমেরিকা বহুবার ডাঙ্কেল প্রস্তাব যুক্ত করতে গিয়েছিল কিন্তু অনুন্নত দেশগুলি বাধা দেওয়ায় তা আর সম্ভব

হয়নি। অর্থাৎ 'একতরফা' ভাবে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বাইরে আমেরিকা কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। এর নাম দেওয়া হয়েছে Non-Tariff Barrier বা 'শুল্ক ছাড়া অন্য আত্মরক্ষামূলক প্রাচীর'। মনে রাখা দরকার এই প্রস্তাব ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বাইরে। উন্নত দেশগুলি নিজেদের পছন্দমতো আইন তৈরি করে অনুন্নত দেশের পণ্য রপ্তানি বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এই 'সামাজিক প্রতিবন্ধকতা' কি কি? প্রতিদিনই আমেরিকা বা জার্মানি এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তবুও তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা দরকার। (প্রথম) ভারতের মতো দেশ শিশুশ্রমিক ব্যবহার করছে। যেখানে সেখানে শিশুশ্রমিক ব্যবহার হচ্ছে সেই সব দ্রব্য আমেরিকা কিনবে না বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে। যেমন কার্পেট ও বস্ত্র শিল্প। (দুই) ডাম্পিং বা অনেক পণ্যর দাম ভারতে বেশি কিন্তু আমেরিকায় আমরা কম দামে বিক্রি করছি। এইভাবে আমেরিকা স্টিল পাইপ তার, অ্যাসিড ও কিছু মেশিনারি ভারত থেকে কিনতে চাচ্ছে না। (তৃতীয়) স্বাস্থ্যের কারণে, রাজস্থানী ঘাঘরা আমেরিকায় বিক্রি করা চলবে না, কারণ রাজস্থানী ঘাঘরা বড্ড দাহ্য। এখানে বলা দরকার রাজস্থানী ঘাঘরা আমেরিকায় হঠাৎ এত বিক্রি হল যে আমেরিকার বস্ত্র শিল্পে প্রায় নাভিশ্বাস। আবার 'স্বাস্থ্যের' কারণে ভারতের স্কুটার বা সাইকেল অনেক ইউরোপিয়ান দেশ ও আমেরিকা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। বলা হচ্ছে ভারতীয় স্কুটার বা সাইকেলের ডিজাইন এমনি সেকেলে যে দুর্ঘটনা যখন তখন হতে পারে। আবার 'স্বাস্থ্যের' কারণে ভারতীয় ওষুধ ও অন্যান্য ভেষজ দ্রব্য আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশ কিনতে চাইছে না। কারণ আমাদের দেশের উৎপাদিত ওষুধের মান নাকি নিম্নস্তরের। (চতুর্থ) আমরা এমন সব শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছি তাতে পরিবেশ দূষণ করেছি—অতএব 'পরিবেশগত' কারণে আমাদের কেমিক্যাল পণ্য আমেরিকা ও অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশগুলি কিনতে নারাজ। অর্থাৎ একটার পর একটা ছুতো তুলে আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান দেশগুলি ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের উপর নানাবিধ নিষেধ আরোপ করছে। কারণ একটাই, ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছে না। অতএব তাদের নিজস্ব শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এই নতুন ধরনের প্রতিবন্ধকতা। অর্থনীতিতে এর নামকরণ করা হয়েছে 'New Protectionism' বা 'Non Tariff Barriers'। বলা বাহুল্য এই সব বিধিনিষেধ সবই ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বাইরে। আমেরিকা 'একক' ভাবে এইসব বিধিনিষেধ আরোপ করছে।

এখানে বলা দরকার শুধু ভারতবর্ষ নয়, অনেক অনুন্নত দেশের রপ্তানি দ্রব্যের উপর আমেরিকা ও ইউরোপ এই সব বাধানিষেধ একটার পর একটা আরোপ করে যাচ্ছে। গ্যাটের শেষ মিটিং হয় জেনেভায়। এই জেনেভায়

মিটিং-এ আমেরিকা ও ইউরোপের কিছু দেশ এই 'নতুন ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা' চুক্তির মধ্যে ঢুকাতে চেয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। ডাঙ্কেল চুক্তি একবার হয়ে গেছে এখন আর কোনো নতুন শর্ত অনুন্নত দেশ গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। ফলে আমেরিকা ও ইউরোপ তখনকার মতো পিছু হটলেও পরে 'নিজস্ব আইন' তৈরি করে নানান বাধা বিশ্ববাণিজ্যে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ অনুন্নত দেশের জন্য 'মুক্ত-বাণিজ্য' আর উন্নত দেশগুলির জন্য বিশেষ সংরক্ষণ নীতি বা নিউ প্রটেকশনিজম।

কিন্তু আরও একটা জায়গায় আমেরিকা বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। ডাঙ্কেল চুক্তি অনুযায়ী একটি নতুন বিশ্ব সংস্থা ১৯৯৫ সালে তৈরি হয়। এর নাম W.T.O বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন। এটা একটা 'বিচার সংস্থা'। যারা মুক্ত বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করছে এবং ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুযায়ী বিশ্ববাণিজ্য চালাচ্ছে না তাদের সমস্যার 'বিচারের' দায়িত্ব এই সংস্থার।

গত বছরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা W.T.O. ২৮টি নালিশ পেয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সব দেশের সমান ভোট। 'একটি দেশ একটি ভোট' এই নীতিতে এই বিচার সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ IMF-র মতো আমেরিকার বেশি ভোট বা UNO-তে ভেটো ইত্যাদি নেই। অর্থাৎ সব দেশই এই সংস্থার কাছে বিচার প্রার্থী হতে পারে।

২৮টি নালিশের মধ্যে দুটোর রায়দান হয়ে গেছে। বলা হয়েছে প্রত্যেকটি নালিশের রায়দান ১৮ মাসের মধ্যেই শেষ করতেই হবে। অর্থাৎ বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।

অধিকাংশ নালিশই করেছে অনুন্নত দেশগুলি উন্নত দেশগুলির বিরুদ্ধে। প্রথম কেসটিতে ব্রাজিল ও ভেনেজুয়েলা নালিশ করেছিল আমেরিকার বিরুদ্ধে। তাদের নালিশ ছিল আমেরিকা নিজেদের তেল কোম্পানির স্বার্থে ভেনেজুয়েলার ও ব্রাজিলের পেট্রোল রপ্তানির বিরুদ্ধে নানান বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এই কেসটিতে আমেরিকা হেরে গিয়েছে এবং আবার আপিলেও হেরে গিয়েছে। অর্থাৎ আমেরিকা যে নীতি বহির্ভূত কাজ করেছে তা প্রমাণ হয়েছে।

তৃতীয় নালিশ ছিল ভারতের অন্য একটি আমেরিকার কোম্পানির বিরুদ্ধে। এই আমেরিকান কোম্পানি 'নিম' গাছ থেকে প্রস্তুত কিছু ওষুধের ওপর পেটেন্ট রাইট চেয়েছিল। ভারতের আপত্তি ছিল এই কারণে যে ভারতীয়রা প্রায় হাজার বছর ধরে নিম গাছ থেকে নানান ওষুধ তৈরি করেছে। অতএব আমেরিকা কোম্পানির তথাকথিত নিমগাছ থেকে 'ওষুধ আবিষ্কার' একটি যুক্তিহীন দাবি। এই কেসটিতেও আমেরিকার কোম্পানি 'হেরে' গিয়েছে।

অর্থাৎ IMF বা UNO-তে আমেরিকা যতখানি আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষমতা প্রায় কুক্ষিগত করে রেখেছিল এই নতুন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় এখন পর্যন্ত এই কাজটি আমেরিকা করে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ ১৯৯৫ সাল যে ১৯৪৫ সাল থেকে পৃথক এটা বোঝবার মতো বুদ্ধি ও ক্ষমতা আমেরিকার আছে।

কিন্তু আমেরিকার ইচ্ছা অনুযায়ী যে পৃথিবী চলবে না এটা এখন পরিষ্কার। আমেরিকা বড় জোর কিছু সময়ের জন্য বাধানিষেধ অনুন্নত দেশের উপর চাপাতে চাইবে। তবে তাও বেশিদিন টিকবে না। গত এক বছরে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

আই এম এফ আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মধ্যে গৃহযুদ্ধ

জোসেফ স্টিগলিৎস (Joseph Stiglitz) গত বছর অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তিনি একজন নামকরা লেখক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ এবং সুবক্তা। কিছুদিন ধরে তিনি বিশ্বব্যাঙ্ক বা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের একজন মুখ্য অর্থনীতিবিদ ছিলেন। অন্যদিকে আই এম এফ বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের অর্থনীতিবিদ ছিলেন ফিসার। ফিসারও বিখ্যাত। তিনি মুখ্যত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের নীতি ঠিক করেন। হঠাৎ দেখা গেল দুই আমেরিকান অর্থনীতিবিদের প্রবল সংঘাত। আই এম এফের নীতির কড়া সমালোচক স্টিগলিৎস। স্টিগলিৎসের মতে, আই এম এফ যেভাবে তার দর্শন অন্য দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তাতে অনুন্নত দেশে উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে—অনৈক্য বাড়ছে এবং চতুর্দিকে বেকারি ও মন্দা। আই এম এফ (স্টিগলিৎসের মতে) একটি বিশ্বসংস্থা অথচ তার যে চালচলন, কথাবার্তা, নীতি তা সবই আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিটের (Wall Street) নির্দেশে তৈরি হচ্ছে। আই এম এফের পরিবর্তন দরকার এবং আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাঙ্কাররা যেন বিশ্ব সংস্থাগুলি থেকে দূরে থাকে। আর ফিসার ওয়াল স্ট্রিটের চামচা। হয়তো ঘুষও খায়। জোসেফ স্টিগলিৎসের কড়া সমালোচনায় গৃহযুদ্ধ। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বনাম ইন্টার ন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (IMF)। ঝগড়া এমন পর্যায়ে যায় যে প্রথমে স্টিগলিৎস পদত্যাগ করেন। ফিসারও চাকরি ছেড়ে যান। আর চাকরি নেন এক ওয়াল স্ট্রিটের বিখ্যাত ব্যাঙ্কে। স্টিগলিৎস আবার দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন ফিসারের বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাঙ্ক আর আই এম এফের একের পর এক পদত্যাগ।

অবশেষে বুশ প্রশাসন হোরস্ট কোহেলারকে (Horst Kohler) আই এম এফের প্রধান করেন। আর তিনি ফিসারের বদলে নিয়ে আসেন নয়া কনসারভেটিভ মহিলা অর্থনীতিবিদ অ্যান ক্রুগারকে (Anne Krueger)। ফিসারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বুশ প্রশাসন ক্ষুব্ধ। তবে ক্রুগার আমেরিকার আদর্শ ও নীতি দেখবে এটাই বুশ প্রশাসন আশা করে। স্টিগলিৎস এখন মুক্ত

মানুষ। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আই এম এফের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলে যাচ্ছেন। কয়েকটি বইও লেখেন। যদিও তিনি নিজে আমেরিকান তবুও স্টিগলিৎস কতকগুলি নতুন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে আই এম এফের কাণ্ডকর্ম কখনই 'স্বাধীন' নয়। সবটাই হয় আমেরিকার নির্দেশে। আর আমেরিকা আই এম এফের মারফত অন্যান্য দেশকে 'দুর্বল' করে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখছে। তাঁর মতে, আই এম এফ বিশ্বসংস্থার মতো কাজ করে না। আমেরিকার নয়া কলোনিয়াল তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনীতিতে অন্য দেশকে প্রায় ধ্বংস করাই এর নীতি। প্রথমে ধ্বংস করেছে রাশিয়ার এবং তার অঙ্গরাজ্যের অর্থনীতিকে। কারণ আমেরিকা ৫০ বছর ধরে রাশিয়াকে প্রতিযোগী বলে ভেবে এসেছে। অতএব তাকে আই এম এফ ধ্বংস করে আমেরিকার প্রভুত্ব বজায় রাখবে। দ্বিতীয়ত, নতুন নতুন যে দেশগুলি হঠাৎ শিল্পে বিরাট উন্নতি করেছে যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং সর্বোপরি জাপানকে 'বশে' রাখাই কর্তব্য। তার জন্য আই এম এফের নীতির দরকার। আর নীতি ঠিক করেছে ফিসার। তৃতীয়ত, বাকি অনুন্নত দেশগুলি কৃষি ও শিল্পে স্থায়ী স্বাবলম্বী না হতে পারে তার বন্দোবস্ত আই এম এফ করেছে 'শর্ত' চাপিয়ে দিয়ে। বস্তুত দশ বছর আগেও আই এম এফ থেকে কোনো ঋণ নিতে গেলে শর্ত ছিল বড়জোর দুটি বা তিনটি। এখন শর্তর সংখ্যাই ন্যূনতম ১৫ থেকে ২০টি এবং প্রত্যেকটি শর্তই অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব হরণ করছে।

আগে গৃহযুদ্ধ ছিল স্টিগলিৎস বনাম ফিসারের মধ্যে অথবা বিশ্বব্যাঙ্ক বনাম আই এম এফের মধ্যে। এখন যুদ্ধটা স্টিগলিৎস ছড়াতে চান—তাই যুদ্ধটা এখন স্টিগলিৎস আর বুশ প্রশাসনের মধ্যে। অর্থনীতিতে এখন বিরাট তর্ক। তবে সব সমস্যাই বিশদভাবে বর্ণনা সম্ভব নয়—কয়েকটি বিশেষ অভিযোগ সামান্য হলেও বলা যেতে পারে।

সোভিয়েত রাশিয়ায়' একদা সব শিল্পই ছিল সরকারের অধীনে। আই এম এফ রাশিয়াকে প্রথমে পরামর্শ পরে প্রায় 'ভীতি প্রদর্শন' করে। হয় সরকারি শিল্পকে বেসরকারি হাতে তুলে দাও নতুবা নানান ট্রেড স্যাংকসন—মানে রাশিয়া কোনো দেশে রপ্তানি করতে পারবে না বা আমদানিও করতে পারবে না। যদি সরকারি শিল্পকে বেসরকারিকরণ করা হয় তবে আই এম এফ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঋণ অথবা গ্র্যান্ট দেবে। গ্র্যান্ট মানে ধার শোধ করতে হবে না। সোভিয়েত সোসালিস্ট ব্যবস্থায় কোনো শিল্পপতি বা এনট্রাপেনার (Entrepreneur) বা ক্যাপিটালিস্ট থাকতে পারে না বা ছিল না।' সুতরাং সরকারি প্রতিষ্ঠান কার হাতে যাবে? দেখা গেল আই এম এফের এই শর্তে হয় 'শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ অথবা রুগ্ন কিংবা মাফিয়ার হাতে চলে যাচ্ছে। মাফিয়া কারা? সোভিয়েত ব্যবস্থায় একদল দুর্নীতিপরায়ণ লোক নানান ছলে বলে

কৌশলে কিছু ঘুষ ইত্যাদি খেয়ে অর্থ জমাতে পেরেছিল। তাদের রাশিয়াতে মাফিয়াই বলে। এই মাফিয়ারা একটার পর একটা শিল্প 'দখল' নিতে আরম্ভ করল। মাফিয়ারা আর যাইহোক শিল্পপতি নয়। ফলে রাশিয়ার প্রত্যেক শিল্প এখন রুগ্ন। কিন্তু আই এম এফ এই হাত বদলকে স্বাগত জানাল। কৃষিতেও একই অবস্থা। কালেক্টিভ ফার্ম উঠে গেল। জমি আবার দখল করল নতুন মাফিয়া-কুলাকরা। রাশিয়ায় অর্থনীতিতে বিরাট এক সঙ্কট। আর আশ্চর্য এই যে, যে অর্থ সাহায্য করবে বলে আই এম এফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ রাশিয়াকে দেওয়া হল না। অথচ একটার পর একটা শর্ত চাপিয়ে আই এম এফ রাশিয়ার অর্থনীতিকে এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিল। রাশিয়ার সঙ্গে আই এম এফ যে ব্যবহার করেছে স্টিগলিৎস তার নামকরণ করেছে "Bad Faith"-বা বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস। রাশিয়ার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির অবস্থা আরও খারাপ। আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, কিরঘিস্তান, মলডোভিয়া, উজবেকিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়ছে।

'এইসব অঞ্চলে, গ্রামে বা শহরে, মানুষের আয়ু কমিউনিস্ট প্রথা থেকে অন্তত পাঁচ বছর কমে গিয়েছে। কারণ হাসপাতাল বন্ধ আর ওষুধ পাওয়া যায় না। কমিউনিস্ট আমলে ১০০ শতাংশ লোক শিক্ষিত হয়েছিল—এখন আর তা নেই। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা অন্তত তিনগুণ বাড়ছে। গ্রামের লোক এখন আগে যা খাবার পেত তার অর্ধেকও পাচ্ছে না। রোগের প্রাদুর্ভাব বড্ড বেশি—বিশেষত টিউবারকুলোসিস (Tuberculosis) এবং হেপাটাইটিস। দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কই দেখাচ্ছে মলডোভিয়াতে (Moldovia) ১৯৯২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২০০০ ডলার। আর আজকে তা কমে হয়েছে ২২০ ডলার বছরে। ১৯৯১ সাল থেকে রাশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে মাথাপিছু আয় দ্রুতহারে কমছে। স্টিগলিৎস এর জন্য দায়ী করেছে আই এম এফকে। রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে ঋণ দেবার নাম করে একটার পর একটা শর্ত চাপিয়ে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, স্কুল-কলেজ ধুঁকছে, শিল্প বন্ধ অথবা রুগ্ন, কৃষিতে বিপর্যয়। আই এম এফ-এর কথামতো পরিষেবা খাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ কমছে। সর্বত্রই হাহাকার। 'ঋণ দিবে এবং সাহায্য দিচ্ছে' কিন্তু আই এম এফ ঋণও দেয় না—সাহায্যও করে না শুধু শর্ত চাপায়।

আবার ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা ধরা যাক। প্রথমে বিপর্যয় থাইল্যান্ডে—তারপর ইন্দোনেশিয়া, তারপরে দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে। এই প্রচণ্ড সঙ্কটের. কারণ থাইল্যান্ড আই এম এফের কথামতো বা শর্ত অনুযায়ী তাদের নিজস্ব কারেন্সি ভাটকে (Bhat) বিশ্ববাজারে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছিল। থাইল্যান্ডের সঙ্কট ছড়িয়ে গেল। যারা আই এম এফের কথামতো বা শর্ত অনুযায়ী তাদের নিজস্ব কারেন্সি উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তারা সবাই

ক্রমশ পতনের দিকে চলে গেল। যারা করেনি (যেমন চীন ও ভারত) তারা বেঁচে গেল বা আপেক্ষিকভাবে সঙ্কট থেকে মুক্ত ছিল। আর এই 'উপদেশ'টা যে ভুল ছিল সেটা আই এম এফ স্বীকার করছে না—বরং ভারতকে উপদেশ দিচ্ছে রুপিকে উন্মুক্ত করে বিশ্বায়নের পথে একধাপ এগিয়ে যাবার জন্য। আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা রুপিকে উন্মুক্ত করতে প্রায় নির্দেশ দিয়েছিলেন—কিন্তু অন্য অনেকের আপত্তি থাকায় তা আর হয়নি। আর যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সঙ্কট বা আর্জেন্টিনার পতন তখনও আই এম এফ ঋণ দিচ্ছে না বরং দেশের বাজেটের ওপর শর্ত চাপিয়ে যাচ্ছে। পরিষেবা ক্ষেত্রে খরচ এতটাই কম যে শিক্ষা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি সর্বত্রই বেহাল অবস্থা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কটের জন্য স্টিগলিৎস প্রত্যক্ষভাবে আই এম এফ-কে দায়ী করে অভিযুক্ত করেছে।

স্টিগলিৎসের 'বিবেকের দংশনে' একটা সুবিধা অবশ্য হয়েছে। নতুন আই এম এফের প্রধান কোহেলার বলছেন 'শর্ত'গুলি সম্বন্ধে আরও আলোচনা দরকার। কি কি শর্ত দূর করা যায় তাই নিয়ে তিনি একটি কমিটিও করেছেন। অবশ্য কোহেলার বললেই যে পরিবর্তন হবে তা নয়—কারণ অ্যান ক্রুগার যিনি আমেরিকার প্রশাসনের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তিনি আপত্তি তুলছেন। আগে গৃহযুদ্ধ ছিল স্টিগলিৎস বনাম ফিসারের মধ্যে। এখন বোধহয় হবে জার্মান কোহেলার আর আমেরিকান ক্রুগারের মধ্যে। মনে হচ্ছে আমরা সেই দিকেই যাচ্ছি।

বিশ্বায়ন নিয়ে বিশ্ব সংস্থাগুলোর মধ্যে বিবাদ ও মতভেদ

বিশ্বায়ন বা যাকে গ্লোবালাইজেশন বলা হচ্ছে তাই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, উন্নত দেশগুলো এই বিষয়ে একই সুরে কথা বলছে। কথাটা যে আদৌ সত্য নয় তা গত বছর থেকেই পরিষ্কার। বিশ্বায়ন নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সুরে কথা বলছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলতে এখানে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে—আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (আই এম এফ), বিশ্ব ব্যাঙ্ক (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক) এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লু টি ও) অর্থাৎ এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে বিশ্বায়ন কাকে বলে, কি করা উচিত, কি করলে জগতের সামগ্রিক উন্নতি হয় তাই নিয়ে প্রচণ্ড মতানৈক্য। বিশেষত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ।

সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান উচিত যে, একই সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই দু'টি সংস্থা তৈরি করা হয়। মোটামুটি সরল ভাষায় বলতে গেলে বলা দরকার যে, দু'টি সংস্থা একে অন্যের পরিপূরক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। আর বিশ্ব ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার মূলত ঋণ দেয় যখন আমদানি রপ্তানি থেকে বেশি হয় অথবা যাকে বলা হয় ব্যালেন্স অব পেমেন্টের সমস্যা সমাধানে। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার আমদানি ও রপ্তানি নীতিই বেশিই দেখাশোনা করে, তবুও এরই সঙ্গে দেশের অর্থনীতি বিষয়ে নানান 'পরামর্শ' দেয়। সেই পরামর্শ না মানলে পরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ঋণ দেওয়া স্থগিত রাখতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার দেশে ও বিদেশে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং করেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের মতো বিশ্ব ব্যাঙ্ক শুধু আমদানি-রপ্তানি নীতিই নির্ধারণ করে তা সত্য নয়, দেশের 'উন্নতি', 'পরিকাঠামোগত উন্নতি', 'পরিষেবার উন্নতি', 'শিক্ষার উন্নতি', 'স্বাস্থ্য-শিক্ষার উন্নতি' ইত্যাদি বিবিধ

বিষয়ে ঋণ দেয়। আগে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জাপান ও জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নতিতেই বেশি ঋণ দিয়েছিল। ক্রমশ অনুন্নত দেশের দিকে এদের লক্ষ্য যায় এবং বর্তমানে ঋণের সিংহভাগই অনুন্নত দেশগুলো পায়। দু'টি সংস্থার বার্ষিক সভা বছরে প্রায় একই সঙ্গে হয় আর মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এই দু'টি সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতি 'বিশ্ব নীতি' বলে চালানো হয়। কারণ, ৬০-৭০ শতাংশ ভোটই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইউরোপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনুন্নত দেশগুলো তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, বড় বড় কথা বলতে পারে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই শেষ কথা। এই দু'টি সংস্থা ঋণ দেবে, যদি দেয় 'শর্তাদি' বা যাকে বলা হয় কন্ডিশনালিটি তা মেনে অনুন্নত দেশগুলো চলে। শর্ত মানে এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি করতে হবে, দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, দেশের আমদানি শুল্ক কমাতে হবে, বাজেটে ঘাটতি কমাতে হবে ইত্যাদি। যাকে বলা হয় এল পি জি বা লিবারেজেইশন, প্রাইভেটাইজেশন অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বেশ চলছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রায় একই সুরে কথা বলত বা একই ধরনের শর্তাদি দিত বা ধমক-ধামকের ভাষা একই ছিল। কাল হল গত বছরের বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক সমীক্ষা।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদরা যে সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার বা চাটুকার এই রকম ধারণা করা অন্যায় হবে। বহু জ্ঞানী, গুণী অনুন্নত দেশের অর্থনীতিবিদরাও বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যুরোক্রেসিতে চাকরি করে। তারা গত বছর একটি বিশ্বব্যাপী সমীক্ষা করে জানতে চায় বিশ্বায়নের প্রভাব বিভিন্ন দেশে কি রকম হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমীক্ষার পর রাষ্ট্রসংঘের এক সংস্থা ইউ এন ডি পি'ও একটি সমীক্ষা চালায়। অর্থাৎ দু'টি সংস্থা পৃথকভাবে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্বন্ধে সমীক্ষা চালায়। আশ্চর্যের কথা, দু'টি রিপোর্ট প্রায় একই 'ধরনের তত্ত্ব' ও তথ্য দিয়েছে। সামান্য প্রভেদ আছে, তবে সেটা নেহাতই প্রান্তিক। আরও আশ্চর্য কথা, পৃথকভাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আই এল ও পৃথিবীব্যাপী চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির একটি সমীক্ষা চালায়। তারাও যে বিশ্লেষণ করেছে তাও বিশ্বায়ন গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলেছে। এই তিনটি রিপোর্টের সারাংশ বলা যাক। সারাংশকে সারাংশ বলেই ধরতে হবে। কারণ, তিনটি মূল রিপোর্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা হাজারখানেকের বেশি হবে।

সাধারণভাবে বলা হয় যে, বিশ্বায়নে জীবনযাত্রার মান বাড়বে। জীবনযাত্রার মান যে কয়েকটি সীমিত দেশে বাড়েনি তা নয়। তবে সীমিত দেশগুলো প্রধানত আগেই 'উন্নত' ছিল যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয় প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে, তবে এটা একটি দিক। অন্যদিকে ইউরোপে বিশেষত জার্মানি, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে জীবনযাত্রার মান কমতির

দিকে। চাকরির বাজারও সঙ্কুচিত। আর জীবনযাত্রার মান কমছে আফ্রিকার অনেক দেশে। আফ্রিকার অনেক দেশেই অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য জাতিগত দাঙ্গা, গৃহযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ। এছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান-এ হঠাৎ অস্থিরতা। কখনও বা হঠাৎ, না-জানা কারণে বাড়ছে এবং হঠাৎ না-জানা কারণে কমছে। এর ফলে রাষ্ট্রজীবনে এক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। আর এই অস্থিরতার কারণে কোনো এশীয় দেশই দীর্ঘমেয়াদী রীতি-নীতি গ্রহণ করতে পারছে না। অর্থাৎ বিশ্বায়নের ফলে নানান ধরনের 'আকস্মিকতা' (এর ইংরেজি নামকরণ করা হচ্ছে ভোলাটিলিটি অ্যান্ড আনসার্টেনটি)। এর ফলে মুদ্রা বাজার, শেয়ার বাজার বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সতত নৃত্যশীল। ফলে দেশে দেশে নানান সঙ্কট আর নীতি নিয়ে বিভ্রান্তি।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের ফলে অনৈক্য কি কমেছে? অনৈক্য দুই ধরনের হতে পারে। কোনো দেশের সঙ্গে অন্য একটি দেশের তুলনা অথবা দেশের মধ্যেই সর্বোচ্চ প্রথম দশাংশের সঙ্গে নিচে পেছিয়ে পড়া দশাংশের তুলনা। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে অনৈক্য বা ইনইকোয়ালিটি বিশ্বায়নের প্রথম ধাক্কায় বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অনৈক্য ক্রমশ বাড়ছে। অর্থাৎ একদল বড়লোক হচ্ছে, অন্য দল প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। অনৈক্য সবচেয়ে বেশি বাড়ছে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে। কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতেও একই অবস্থা। অনৈক্য বাড়া মানে নানান সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়া। আফ্রিকায় যে গণতন্ত্র প্রায় সর্বত্রই বিপন্ন আর গৃহযুদ্ধ নিত্যঘটনা তার পেছনে এই অনৈক্য এক বিরাট ভূমিকা নিচ্ছে। অনৈক্য অনেক সময় আফ্রিকায় বা এশীয় দেশে আসছে জাতিগতরূপে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের সুযোগ কোনো জাতি নিতে পারছে, অন্যরা নিতে পারছে না। কারণ বহুবিধ। কলোনিয়াল পলিসি, বাণিজ্য প্রথা, কৃষিজমির বন্টন, চাকরির সুবিধা ও সুযোগ ইত্যাদি। ফলে বহু দেশে অনৈক্য বাড়ার জন্য নানান সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। গ্রাম থেকে শহরে লোক আসছে, দারিদ্র্য বাড়ছে আর কমছে চাকরির সুযোগ-সুবিধা। সর্বত্রই বিশ্বায়ন চাকরির সুযোগ বিশেষ বাড়ায়নি, বরং কমিয়েছে। পুরনো শিল্প ধ্বংস হচ্ছে অথচ নতুন শিল্প চট করে গড়ে উঠছে না।

এর জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের ব্যর্থ নীতিকে দায়ী করছেন। দেশে দেশে বিভিন্ন সমস্যা। অথচ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সর্বত্রই 'একই নীতি' জোর করে চাপিয়ে সমস্যাকে গভীরতর করে ফেলেছে। তাদের ঋণ ঠিক সময়ে আসে না, উপযুক্ত পরিমাণে আসে না আর আসে নানান শর্ত নিয়ে। আর সেই শর্ত পালন করতে গিয়ে অনুন্নত দেশের নাভিশ্বাস। বেকারি বাড়ছে, আয় কমছে এবং অনৈক্য বাড়ছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কও বিশ্বায়ন চায়, তবে সর্বত্র 'একই নীতি' চালু করার বিপক্ষে। দেশে দেশে যে প্রভেদ আছে সেই সমস্যাকে মনে রেখে 'বিভিন্ন দেশের জন্য

বিভিন্ন নীতি' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাছাড়া বিশ্বায়ন যদি সুযোগ-সুবিধা অনেক দেশেই কমায় তবে 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। বিশ্ব ব্যাঙ্ক হুড়োহুড়ি করে সর্বত্রই একই নীতি চাপানোর বিপক্ষে। বলাবাহুল্য, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই তথ্য মানতে নারাজ। দেশ অনুযায়ী নীতির পার্থক্যকরণের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার। ফলে তর্কটা গত বছর ধরে বেশ জমে উঠেছে। বিশ্বায়নের মানবিক দিকটা ঠিক কি তা নিয়ে আজকে নানান সন্ধান চলছে। অবশ্য শেষ নাই যার শেষ কথা কে বলবে?

'মবুটু-ইজম' ঃ অন্যান্য দেশে চালু হলে সব স্বাধীনতাই বৃথা

কঙ্গো তথা জাইরের শাহেনশাহ্ প্রবল শক্তিমান ডিকটেটর মবুটু বর্তমানে গৃহযুদ্ধে হেরে দেশ থেকে বিতাড়িত। মবুটু দেশ ছাড়া তবে সি আই এ-র কাছে মবুটু-ইজমের ভূত দেশ ছাড়া কিনা সন্দেহ। কারণ অনুন্নত দেশে এই মবুটু-ইজমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করবার জন্য আমেরিকা এই নতুন কলোনিয়াল তত্ত্ব অন্যান্য অনেক দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। মবুটু ক্ষমতাচ্যুত কিন্তু মবুটু-ইজম এখনও বেঁচে আছে।

সাধারণ লোকেদের স্মৃতি দুর্বল তাই মবুটু-ইজমের উত্থান কি ভাবে হল তা একটু বোঝা দরকার। কঙ্গো একটি বিরাট দেশ। বর্তমানে পৃথিবীর ৬০ শতাংশ কোবাল্ট এই কঙ্গোতেই পাওয়া যায়। আর জেট ইঞ্জিন তৈরি করতে, সামরিক মিসাইল তৈরি করতে কোবাল্টের প্রয়োজন নাকি অপরিসীম। এছাড়া কঙ্গোতে পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তামা, প্রচুর সোনা, হীরা এবং অনেক মূল্যবান ধাতু পদার্থ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বনজ শিল্প সম্পদ অফুরন্ত। কৃষি দ্রব্যের মধ্যে চা, কফি, রাবার, কোকো ইত্যাদি নানা সম্পদে কঙ্গো অত্যন্ত ধনী। আর এই সম্পদের উপর পাশ্চাত্য দেশ ও আমেরিকার যত লোভ।

কঙ্গো কিন্তু ছোট দেশ নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার একটি বৃহৎ দেশ। আয়তনে প্রায় ১০ লক্ষ স্কোয়ার মাইল—অনেক দেশ থেকেই বৃহৎ। লোকসংখ্যা ৪ কোটির কাছাকাছি। ১৯০৮ সালে পাশ্চাত্য দেশগুলির অন্যতম বেলজিয়াম এই দেশ দখল করে ও নিজেদের শাসন ব্যবস্থা চালু করে। শাসন ব্যবস্থা মানে অবশ্য শোষণ। কঙ্গোর সব সম্পদ লুট করে বেলজিয়ামের আজকের রমরমা।

অবশ্যম্ভাবী সত্য হিসেবে কঙ্গোতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হল। নেতৃত্ব

দিল লুমুম্বা। লুমুম্বার স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বিদেশী কোম্পানির পরিচালনায় যে সব খনি আছে তাকে জাতীয়করণ করা। অর্থাৎ কঙ্গোর সম্পত্তি ও সম্পদ কঙ্গোবাসীদের ব্যবহার করার জন্য যা প্রয়োজনীয় তা করা উচিত। আর এটাই হল লুমুম্বার কাল।

১৯৬০ সালে কঙ্গোর স্বাধীনতা হল। বেলজিয়াম ও ব্রিটেন যা করেছিল তাই করতে চেষ্টা করল। Divide and Rule—কাটাঙ্গা নামক এক প্রদেশে বিদ্রোহীদের লুমুম্বার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হল। অর্থাৎ কঙ্গোর স্বাধীনতা যাতে না হয় তার জন্য চেষ্টা। লুমুম্বা রাশিয়ার সাহায্য চাইল। বেলজিয়াম দেশ ছেড়ে চলে গেল ১৯৬০ সালে, তবে লুমুম্বাকে কি ভাবে শাস্তি দেওয়া যায় তার জন্য আমেরিকার শরণাপন্ন হল। সি আই এ সম্পদ সমৃদ্ধ কঙ্গো রাশিয়ার পরিমণ্ডলে যাতে না যেতে পারে তার জন্য 'সৈন্য' পাঠাল। এখানে ঢাকঢাক গুড়গুড় ছিল না। সি আই এ ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে লুমুম্বাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। লুমুম্বা এই ভাড়াটে বিদেশী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। এই অবস্থায় ইউনাইটেড নেশনস ও তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল ইউনাইটেড নেশনস-এর তরফে 'শান্তি' বজায় রাখার জন্য সৈন্য পাঠাল।

অর্থাৎ তখন লুমুম্বার পক্ষে ইউনাইটেড নেশনস-এর সৈন্য আর অন্য পক্ষে আমেরিকা-বেলজিয়াম-ফ্রান্স-সি আই এ-র ভাড়াতে সৈন্য। আমেরিকা ইউনাইটেড নেশনসের কার্যকলাপ পছন্দ করল না। তখন রাষ্ট্রসঙেঘর বাহিনী মানে ভারতীয় সৈন্য। আর ইউনাইটেড নেশনসের কার্যাবলী দেখাশোনা করছে ভারতীয় অফিসার শ্রীরাজেশ্বর দয়াল। লুমুম্বা ও দয়ালের বিরুদ্ধে পশ্চিমী-রাষ্ট্রগুলির নিয়ত বিষোদগারণ।

সি আই এ-র সৈন্য দিয়ে অন্য দেশে যুদ্ধ চালানো যায় না। বশংবদ লোক তাঁরা খুঁজে বেড়াতে লাগল। পছন্দর তালিকা ক্রমশ ছোট হতে লাগল। খুঁজে বের করল মবুটুকে। কঙ্গোর সৈন্যতে সামান্য পদে আসীন। লেফটেন্যান্ট। তাকে দিয়েই সি আই এ তার সৈন্য লুমুম্বার বিরুদ্ধে ব্যবহার করল। জীবনে টাকার মুখ দেখেনি। অত্যন্ত গরিব এই মবুটু সি আই এ-র পক্ষে তার সম্মতি দিয়ে লুমুম্বাকে মারবার প্রতিশ্রুতি করল।

শেষ পর্যন্ত সফল হল। বলা যায় আমেরিকা যে মানবিক অধিকার সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে সেই কঙ্গোর 'স্বাধীনতাকে পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে হরণ করতে সচেষ্ট হল। প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার অর্ডার দিয়ে ষড়যন্ত্র করে রাস্তায় লুমুম্বাকে মারল। এইখানেই শেষ নয়। বলা হয় ইউ এন ও'র প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল হাম্‌রস জোয়েন একটি সাজানো 'প্লেন দুর্ঘটনায়' দক্ষিণ আফ্রিকায় মারা গেল। UNO-র বাহিনীর রাজেশ্বর দয়ালকে সি আই এ কঙ্গো ছাড়া করল।

এর পরেই আমেরিকা কঙ্গোতে নতুন এক ইজম চালু করল। নাম পশ্চিমী

দেশগুলির বশংবদ কাগজপত্র পত্রিকাগুলোই দিল। মবুটু-ইজম। আর মবুটু-ইজমের প্রশংসায় ওয়াশিংটন পোস্ট ও লন্ডনের টাইমস ও ফ্রান্সের-লে মন্ত একবারে পঞ্চমুখ কিংবা দশমুখ। চালু হয় গেল 'মবুটু-ইজম।'

এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

১) কঙ্গো স্বাধীনতা পেলেও তার সমস্ত খনিজ সম্পদ বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা পরিচালিত করত। লভ্যাংশ মবুটুকে সামান্যই দিত।

২) যে লভ্যাংশ মবুটুকে দিত তা আবার মবুটুকে দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম কিনে নিতে বাধ্য করত।

৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কঙ্গোর বিন্দুমাত্র ছিল না। সি আই এ যা বলবে মবুটু তাই করতে বাধ্য। তার জন্য মবুটুকে অর্থ দেওয়া হত।

৪) দেশে যা জিনিসপত্র কেনা হত তার একটা ভাগ মবুটুকে দেওয়া হত। আর মবুটু হয়ে দাঁড়াল এক বিরাট ধনী লোক।

৫) মবুটুকে সাহায্য করার জন্য বারবার ফরাসি সৈন্য, বেলজিয়ামের ভাড়াটে সৈন্য আমদানি করা হত। কারণ ছিল মবুটুকে দিয়ে বহুজাতিক মাইনিং কোম্পানির স্বার্থ যেন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়।

৬) মবুটুর কঙ্গো হয়ে দাঁড়াল আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি। এই রাজ্যে সি আই এ তার সাজসরঞ্জাম সৈন্য নিয়ে আঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে ইউনিটা বিদ্রোহীদের দমন করবার চেষ্টা করেছিল প্রায় ১৫ বছর। অর্থাৎ কঙ্গোকে অবলম্বন করে অন্য আফ্রিকার রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ সৈন্য সি আই এ পাঠাত।

৭) অ্যাঙ্গোলার প্রক্সি যুদ্ধ যেহেতু কঙ্গো থেকেই করা হত তার জন্য আমেরিকা কঙ্গোকে অর্থ সাহায্য করত। আর অর্থের এক বিপুল অংশ মবুটু নিজের নামে সরিয়ে রাখত। লন্ডনের ফিনানসিয়াল টাইমস জানাচ্ছে সি আই এ এই বাবদ মবুটুকে প্রতি বছর চার বিলিয়ন ডলার দিত।

৮) প্রতি বছরের এই টাকা মবুটু নিজের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দেশের টাকা লুট করত। আর বিপদ হলেই ভাড়াটে সাদা সৈন্য ও কালো সৈন্য মবুটুকে সাহায্য করত।

৯) মবুটু দেশ থেকে অর্থ নিয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কে রাখত। আর দেশের কল্যাণমূলক কোনো উন্নতি তেমন কিছু নেওয়া হয়নি। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি কিছুই করার চেষ্টা হয়নি। দেশের টাকা মবুটু লুট করত আর তাকে সাহায্য করত বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা।

১০) দেশে মবুটুর কোনো সমালোচনা করলেই তার জেল অনিবার্য। মবুটু যেভাবে দেশ চালাত তার একটাই নাম ডিকটেটরশিপ। আর এই ডিকটেটর ছিল একজন পুতুল মাত্র। সি আই এ এবং বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থ ছাড়া কিছুই দেখেনি।

স্বাধীনতা পেয়েও কঙ্গো ছিল বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। আর

ডিকটেটরকে রাখবার জন্য ছিল ভাড়াটে সৈন্য। আর সৈন্যর পরিচালনা করত সি আই এ ও ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের জাঁদরেল জেনারেলরা।

মবুটুকে দিয়ে পুতুল সরকার করা, লুমুম্বাকে হত্যা, UNO-র সেক্রেটারি জেনারেলের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু সবই নাকি তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছিল। তথাকথিত স্বাধীন দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীন করে রাখার ছক নাকি হয়েছিল সি আই এ-র হেড অফিসে। পশ্চিমী দুনিয়াই এর নাম দিয়েছিল মবুটু-ইজম।

যা হবার তাই ঘটেছে। মবুটুর পতন বর্তমানে হয়েছে। গৃহযুদ্ধে কাবিলা মবুটুকে হারিয়ে দিয়েছে। মবুটু দেশ ছেড়ে চলে গেছে। সে ছিল সাধারণ একজন লোক। পাশ্চাত্য দেশের কৃপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল পৃথিবীর অন্যতম ধনী লোক। নতুন নেতা কবিলা ঠিক কি উপায়ে দেশ চালাবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সেও কি 'পুতুল' হবে?

সব অনুন্নত দেশের পক্ষে মবুটুর উত্থান ও পতন বিশেষ এক শিক্ষা। বহুজাতিক সংস্থা তাদের স্বার্থের জন্য একটা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন রাখতে পারে এবং প্রায় ৪০ বছর ধরে রেখেছে। এই 'মবুটু-ইজম' যদি অন্যান্য দেশে চালু করা হয় তবে সব স্বাধীনতাই বৃথা। আর এই 'বৃথা' করার জন্যই আছে সি আই এ-আর তার দোসর বহুজাতিক সংস্থা।

একটি ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি বনাম কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা

পৃথিবীতে সামান্য ছোট ঘটনা অনেক সময়েই সুদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিছুদিন আগে যেটা হয়েছে। ভারতের একটি ওষুধ কোম্পানি—নাম সিপলা—তাদের একটি ওষুধ ফরাসি সরকারকে দিয়েছে আফ্রিকার এইড্স রোগের চিকিৎসার জন্য। আফ্রিকার বহু লোক এই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। অথচ এই ওষুধ পাওয়া দরিদ্ আফ্রিকার লোকদের প্রায় অসাধ্য। দাম আকাশচুম্বী। ফরাসি সরকার ওষুধ কিনত আমেরিকার পাঁচটি ওষুধ কোম্পানি থেকে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আমেরিকার কোম্পানিগুলি ওষুধের দাম চাইল ১০,০০০ ডলার থেকে ১৫,০০০ ডলার। টাকা বা রুপি হিসেবে ব্যক্তিপ্রতি খরচ লাগত প্রায় সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখের ওপর। বলাই বাহুল্য আফ্রিকার রোগগ্রস্ত রোগীরা এত টাকা খরচ করতে পারত না। ফলে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। তবুও তারা এইডসের ওষুধের দাম কমায়নি।

ফরাসি ডাক্তাররা একটি ভলান্টারি এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। নাম 'ওষুধের কোনো সীমানা নেই'। তারা খোঁজ নিয়ে জানল যে ভারতীয় একটি ওষুধ কোম্পানি সস্তা দরে এই 'ধরনের' ওষুধ তৈরি করে। তারা ভারতীয় কোম্পানির সঙ্গে বা সিপলার (CIPLA) সঙ্গে যোগাযোগ করে। সিপলা তাদের ওষুধের দাম ধরেছিল ১৫ হাজার টাকার মতো ব্যক্তিপ্রতি। যখন সিপলা শুনল আফ্রিকার রোগগ্রস্ত লোকদের চিকিৎসার জন্য এই ওষুধ ব্যবহৃত হবে এবং ডাক্তাররা সবাই সমাজসেবী তারা বিনা পয়সায় ওষুধ দিতে চাইল। আর যদি ফরাসি ডাক্তাররা বিনা পয়সায় ওষুধ নিতে রাজি না হয় তবে দাম কমিয়ে ৫ হাজার করা হল। সিপলা কোম্পানি ফরাসি ডাক্তারদের জানাল দাম কোন সমস্যা নয়—চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হলে তারা বিনা

পয়সায় বা নামমাত্র মূল্যে ওষুধ দিতে রাজি।

এতে উৎফুল্ল হবারই কথা। পৃথিবীতে এখনও সেবা, ভালোবাসা, করুণা ইত্যাদি কথাগুলি এবং কাজগুলি উবে যায়নি। ফরাসি ডাক্তাররা বিনা পয়সায় কাজ করতে রাজি আর ভারতীয় কোম্পানি বিনা পয়সায় ওষুধ দিতে রাজি।

কিন্তু বাধ সাধল ইউরোপের ও আমেরিকার পাঁচটি ওষুধ কোম্পানি। তারা বলল যে ভারতীয় সিপলা কোম্পানির ওই ওষুধ W.T.O.-র ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের বিরোধী। এর মানে হচ্ছে এই যে, ভারতীয় কোম্পানি সিপলা তাদের পেটেন্ট করা ওষুধের 'নকল' করেছে। অতএব ভারতীয় কোম্পানি ওষুধ বিক্রি করতে পারবে না। বিনি পয়সায় আফ্রিকায় পাঠাতে পারবে না। আফ্রিকায় ওষুধ পাঠাতে গেলে তাদের উৎপাদিত ৫ লাখ টাকার ওষুধ কিনতেই হবে এবং বিলি করতে হবে।

তারা ওষুধের দাম অবশ্য কিঞ্চিৎ কমাতে রাজি। তবে ভারতীয় ওষুধ নেওয়া চলবে না। এই বৃহৎ পাঁচটি বহুজাতিক সংস্থা সিপলার বিরুদ্ধে W.T.O-তে নালিশ করল। সিপ্‌লার ওষুধ আমেরিকা কোম্পানির ওষুধের 'নকল'— এটাই তাদের বক্তব্য।

এখন এই ধরনের সমস্যা এল কেন তাও বোঝা দরকার—যদিও সমস্যাটা অনেকেরই জানা। সমস্যাটা গত পাঁচ বছরের। পৃথিবীতে 'আইন' বলে একটি ডাঙ্কেল ড্রাফ্‌টের অংশ চালু আছে তার নাম TRIP বা বিশদ করে বললে Trade Related Intelectual Property-এর অর্থ হল এখন যদি প্রমাণিত হয় কেউ কোনো ওষুধ বা দ্রব্য কোনো বিদেশী কোম্পানি থেকে 'নকল' করেছে তবে বিদেশী কোম্পানিকে দেশী কোম্পানিগুলি 'ক্ষতিপূরণ' দেবে ২০ বছর ধরে। ২০ বছর পরে আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। TRIP-এর বিচার ব্যবস্থাও একটু অদ্ভুত ধরনের। এখানে বিচার করবে W.T.O.-র কিছু সদস্য যেখানে আমেরিকা ও ইউরোপের সদস্যই বেশি। অনুন্নত দেশের সদস্য নেই বললেও হয়। আর যার বিরুদ্ধে 'নকল' করার 'অভিযোগ' করা হচ্ছে তাকে প্রথম থেকেই 'আসামী' বলে ধরা হয়। অভিযুক্ত কোম্পানিকে প্রমাণ করতে হবে সে 'নকল' করেনি। অর্থাৎ ভারতীয় জুরেসপ্রুডেন্স থেকে আলাদা। ভারতীয় জুরেসপ্রুডেন্সে অভিযোগকারীকে 'প্রমাণ' করতে হবে সে অভিযুক্ত 'আসামী'। বিচার পদ্ধতি আমাদের দেশ থেকে আলাদা। জুরেসপ্রুডেন্স আলাদা।

যা হোক, আপাতত যা মনে হচ্ছে সিপলা কোম্পানি ও ফরাসি ডাক্তাররা সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তারা আইনের পথেই চলতে চায়।

সিপলা কোম্পানির সম্ভাব্য কৈফিয়ত কি কি হতে পারে তা নিয়ে পৃথিবীব্যাপী সরগরম। প্রথমত, সিপলা বলতে পারে যে যদি পাঁচটি বহুজতিক সংস্থা এইডসের ওষুধ তৈরি করতে পারে তবে ষষ্ঠ ভারতীয় কোম্পানিও বা

ওষুধ তৈরি করতে পারবে না কেন? পাঁচটি কোম্পানি কি কারুর নকল করেছে বা পরস্পরের পিঠ চুলকিয়ে পৃথিবীতে তারা এই মারণ রোগের ওষুধের মনোপলি বজায় রাখতে চায়। তারা প্রতিযোগী হিসেবে অনুন্নত দেশের কোনো কোম্পানিকে বাজারে প্রবেশ দিতে চায় না।

যেহেতু পাঁচটি ওষুধ কোম্পানি সিপলার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে—এক ধরনের এটা Collusion বা ষড়যন্ত্রমূলক সহযোগিতা—যা W.T.O. চার্টারে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, সিপলা ভারতীয় পদ্ধতি ও নানান উদ্ভিজ পদার্থ থেকে ওই ওষুধ তৈরি করেছে যা ইউরোপ ও আমেরিকায় পাওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, TRIP-এর একটি ব্যতিক্রম আছে। যদি ওষুধ কোনো মারণ রোগের প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয় তবে সাধারণের কল্যাণে সেই ওষুধের দাম কম রাখা দরকার।

সম্ভাব্য ডিফেন্স কি হবে তা নিয়ে দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় নানান জল্পনা-কল্পনা। সমস্যাটা এখন সবাই স্বীকার করছে যত না আইনি তার থেকে বেশি মরালিটির বা নৈতিক। এর জন্য বিশ্বের এক ধরনের বুদ্ধিজীবী সিপলার পক্ষে।

নৈতিক সমস্যাটা হচ্ছে যে আমেরিকার বা ইউরোপের কোনো রিসার্চে যদি 'নতুন' কোনো ওষুধ তৈরি হয় এবং যদি তারা সেই ওষুধের পেটেন্ট নেয় তবে ২০ বছর ধরে তারা কি যা ইচ্ছা দাম চাইতে পারে? এটা Patent Monopoly যা Patient বা রোগীর বিরুদ্ধে। প্রশ্নটা তোলা হচ্ছে এখন Patent Vs Patient.

ধরে নেওয়া হোক সিপলা 'নকল' করছে। তবুও সিপলা প্রায় বিনি পয়সায় সর্বজন হিতায় এই ওষুধ বাইরে ছাড়তে চায়। তাতে অসংখ্য লোকের চিকিৎসা হবে। এটা ভালো, না আইনি পেটেন্ট ব্যবস্থায় কয়েকটি ওষুধ কোম্পানি মিলিয়ন্ বা বিলিয়ন ডলার রোজগার করবে সেটা ভালো। 'ভালো' কোন্‌টা আর বিশ্ব-আইন কি বিশ্ব-হিতের বাইরে কোনো নীতি-নির্ধারণ করতে পারে কিনা। এখন বিশ্বে W.T.O-র পেটেন্ট আইনের বিরুদ্ধে নানান ইনটেলেকচুয়েল মহল সোচ্চার।

পৃথিবীতে এখন অনেকেই বলতে চাইছে TRIP-এর আমূল পরিবর্তন দরকার। কারণ আমেরিকা বা জার্মানি কেউ যদি 'জনহিতকর ওষুধ বা জিনিস তৈরি করে তার উপর অধিকার মুষ্টিমেয় মুনাফা-বাজ কোম্পানির নয়। আর 'আবিষ্কার' কথাটির মানেই বা কি? একটা 'আবিষ্কারের' পেছনে সহস্র বছরের মেধা ও শ্রম আছে। 'আবিষ্কার' কখনই একক হতে পারে না। বহু লোকের বহু সহস্র বছরের সাধনার ফলে বর্তমান সভ্যতা। তার cut-off year ১৯৯৫ সাল হতে পারে না। বর্তমানে যা চালু। আর পেটেন্ট কথাটির মানেই বা কি। কারণ আমেরিকা ভারতীয় ভেষজের অন্তত ২৯টি দ্রব্য তাদের পেটেন্ট বলে ঘোষণা করেছে—যেমন হলুদ, নিম, তেঁতুল, বাবলা বা তুলসী। পেটেন্ট

আইনের কল্যাণে এগুলি কিভাবে আমেরিকান হয়। বাসমতী চাল কেনই বা হবে ট্রাসমতী? পৃথিবীব্যাপী এখন ইনটেলেকচুয়ালরা TRIP নিয়ে নানান সমালোচনায় সোচ্চার। তারা চায় TRIP-এর পরিবর্তন এবং W.T.O'র যথার্থ বিশ্বায়ন এবং রূপান্তর। কিছু মুষ্টিমেয় বড়লোক উন্নত দেশের মুখপাত্র হয়ে W.T.O বিশ্বের দরিদ্র জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হতে পারে না।

সিপলার ঘটনার পর আমেরিকার সরকার অবশ্য অবিচল। তারা হঠাৎ বলতে আরম্ভ করেছে (বুশ আসার পর) ভারতীয়রা আমেরিকার 'আবিষ্কারের' নকল করছে এবং ভারতের কাছে আমেরিকার পাওনা ন্যূনতম ৩০০ মিলিয়ন ডলার। আর ভারতকে এই ডলার আমেরিকাকে দিতেই হবে। কি কি নকল ভারতীয়রা করছে? বুশ প্রশাসন জানাচ্ছে ভারতীয় বলিউডের সিনেমা হলিউডের 'নকল' করেছে—ভারতীয় সুরকাররা আমেরিকার গানের 'নকল' করেছে। আমেরিকা ক্ষতিপূরণ চায়।

সিপলা-ঘটনা নানান হাস্যকর দিক উন্মোচন করছে এবং করবে। কারণ প্রচুর রাষ্ট্র TRIP-এর পরিবর্তন চায়। আর আমেরিকা তা চায় না। ফলে বিশ্ব বাণিজ্যে ও পেটেন্ট ব্যবস্থায় উন্নত দেশ আর অনুন্নত দেশেগুলির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। তবে এটা আশার কথা বিশ্ব বাণিজ্যের একটা 'নৈতিক' ও 'মানবিক' দিকও আছে সেটা বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয় এটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

তৃতীয় শিল্প বিপ্লব ও চাকরির বাজার

পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব প্রথম আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই প্রথম শিল্প বিপ্লব পৃথিবীতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনে। বস্তুত এই শিল্প বিপ্লব ছিল মুখ্যত স্টিম ইঞ্জিন বিপ্লব।

প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর বিংশ শতাব্দীতে আসে অন্য এক বিপ্লব। এটি ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স বিপ্লব। পৃথিবীর আয় বহুগুণ বাড়ে। চাকরি সৃষ্টি হয়। মানুষের অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। অন্তত প্রথম দুটি শিল্প বিপ্লব অর্থাৎ স্টিম ও ইলেকট্রিক বিপ্লবে মানুষের অবস্থার গুণগত উন্নত হয়। আবার চাকরি সৃষ্টি হয়। পুরাতনের জায়গায় নতুন দ্রব্য পৃথিবীতে আসে। জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হয়।

এই প্রথম দুটি শিল্প বিপ্লব থেকে লোকের ধারণা ছিল যে টেকনোলজির উন্নতি হলে চাকরি সৃষ্টি হয়, আয় বাড়ে আর মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হয়। টেকনোলজি উৎপাদিকা শক্তি বাড়ায়। যত উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে তত বিনিয়োগ বাড়ে অতএব চাকরিও বাড়ে। টেকনোলজি সব সময় কল্যাণকর।

বর্তমানে আমরা তৃতীয় শিল্প বিপ্লব দেখছি। এটিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তবে মুখ্যত এটি কম্পিউটার বিপ্লব। নতুন নতুন কম্পিউটার, সফটওয়ার, হার্ডওয়ার ইত্যাদি আসার ফলে মানুষের কাছে নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। কম্পিউটার বিপ্লব আবার সঙ্গে করে এনেছে কমিউনিকেশন বিপ্লব। ব্রাজিলের ফুটবল খেলা বা আমেরিকার টেনিস, কমনওয়েলথ গেম, আফগানিস্তানের যুদ্ধ ইত্যাদি বাড়িতে বসেই দেখতে পারি।

এটিকে শিল্প বিপ্লবের তৃতীয় ধারা বলা হচ্ছে। শিল্প বিপ্লব হলেই চাকরি সৃষ্টি হবে, উৎপাদন বাড়বে, উৎপাদিকা শক্তি বাড়বে। এটি যেন স্বতঃসিদ্ধ। প্রমাণের দরকার হয় না। নতুন টেকনোলজি উৎপাদন বাড়ায়। উৎপাদিকা

শক্তি বাড়ায়। চাকরি বাড়ায় আর অনৈক্য কমায়। এই তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের কাছে সবাই এটা আশা করে। যদিও স্বল্প সময়ে বেকারি সৃষ্টি করতে পারে, তবে দীর্ঘ সময়ে প্রচুর চাকরি হবে। এটাই তত্ত্ব ছিল।

এই তত্ত্বে প্রথম আঘাত করে একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। নাম সোলো (Solow)। তিনি দেখাচ্ছেন কম্পিউটার বিপ্লবের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে এই তৃতীয় বিপ্লব যাকে কম্পিউটার বিপ্লব বলছি তাতে উৎপাদিকা শক্তি ও চাকরি বেড়েছে কি? পঞ্চাশ বছর খুব একটা কম সময় নয়। সোলো নানান সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন—আশ্চর্য এই কম্পিউটার বিপ্লবে উৎপাদিকা শক্তিও বাড়েনি, উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বাড়েনি, চাকরি বাড়েনি এবং দেশে দেশে অনৈক্য বেড়েছে। প্রথম দুটি শিল্প বিপ্লবে প্রচুর চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে—কিন্তু এই বর্তমান কম্পিউটার বিপ্লব একটু অন্য ধরনের। এটিতে উৎপাদন বিশেষ বাড়েনি। উৎপাদিকা শক্তি বাড়েনি, চাকরি বাড়েনি, অনৈক্য বেড়েছে। এটি সোলোর বিখ্যাত "Productivity Paradox" —কখনও এর নাম "Employment Paradox" কখনও এর নাম "Income Paradox".

সোলো বলতে চেয়েছেন যত কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে তত উৎপাদিকা শক্তি বা প্রডাক্টিভিটি শিল্পে বাড়েনি। বরং পৃথিবীতে মন্দা দীর্ঘস্থায়ী। এক দেশ থেকে মন্দা অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। জার্মানি তথা পৃথিবীর সর্বত্র বেকারি এত বেশি যে এটা প্রমাণ করা যায় যে, কম্পিউটার যত চাকরি সৃষ্টি করেছে তার থেকে অনেক বেশি চাকরি ধ্বংস করেছে। কম্পিউটার একদিকে যেমন নতুন চাকরি সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে চাকরি ধ্বংস করছে। ধ্বংসের পরিমাণ সৃষ্টির পরিমাণ থেকে অনেকটাই বেশি। এটি আগেকার প্রথম দুটি শিল্প বিপ্লবে হয়নি। তখন চাকরি যত না ধ্বংস হয়েছিল তার থেকে বেশি চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম দুটি শিল্প বিপ্লবে বিভিন্ন দেশে বেকারি সম্পূর্ণ দূর হয়েছিল। ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অথচ এই তৃতীয় শিল্প বিপ্লব যাকে আমরা কম্পিউটার বিপ্লব বলছি সেখানে বেকারিও দূর হল না আর ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র এখন প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল। অথচ প্রথম দুটি শিল্প বিপ্লবে (অর্থাৎ স্টিম. ও ইলেকট্রিসিটি) প্রথম পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীব্যাপী অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল—কিন্তু তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের প্রথম পঞ্চাশ বছরে আমরা দেখছি মন্দা, বেকারি ও আয়ের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য। এটিই হচ্ছে সোলোর (Solow) বিখ্যাত Paradox—নতুন শিল্প বিপ্লবে চাকরি আপাতত বাড়ছে না। উৎপাদন বাড়ছে না। উৎপাদিকা শক্তিও তেমন একটা বাড়ছে না।

দুই টেকনোলজির তুলনা—ইলেকট্রিসিটি ও কম্পিউটার যুগ প্রত্যেক বছরে % হিসেবে উৎপাদিকা শক্তির হার বৃদ্ধি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে	শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি	শ্রমিক ও ক্যাপিটালের উৎপাদিকা শক্তি
ইলেকট্রিক যুগ		
১৯০৯-১৯	২.১	১.৩
১৯১৯-২৯	২.৩	২.০
আই টি বা কম্পিউটার যুগ		
১৯৮৫-৯৫	১.৪	০.৫
১৯৯৫-২০০০	১.৯	১.৫

(ইকনমিস্ট Sept 2000 পৃ-১৮)

এই প্যারাডক্সের নানান দিক আছে। প্রথমটা হচ্ছে দেশে যা বিনিয়োগ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে তার প্রায় অর্ধেক IT বা নতুন ইনফরমেশন টেকনোলজিতে চলে গেছে। অর্থাৎ সিংহভাগ বিনিয়োগ একটি এবং একটি শিল্পতে হওয়ার ফলে 'অন্যত্র' বা অন্য শিল্পে বিনিয়োগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যার ফলে 'অন্য শিল্পে' যত দ্রুত চাকরি সঙ্কুচিত হচ্ছে, নতুন IT শিল্পে তত তাড়াতাড়ি চাকরি বাড়ছে না। ফলে 'অন্যত্র' আয় কমে যাচ্ছে। বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে বেকারি বেড়ে যাচ্ছে।

সোলোর প্যারাডক্স থেকে নানান তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। একটি হচ্ছে ইলেকট্রিকের বিপ্লব যত উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়েছিল IT বিপ্লবে বা কম্পিউটার বিপ্লবে তা হয়নি। প্রথমে শ্রমিকের সামগ্রিকভাবে উৎপাদিকা শক্তি তেমন একটা বাড়েনি। অর্থাৎ যাকে আমরা লেবার প্রোডাক্টিভিটি বলি তা কম্পিউটার বিপ্লবে আপেক্ষিক ভাবে কম। দ্বিতীয় আরও একটি উৎপাদিকা শক্তির কথা বলা হচ্ছে তার নাম টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি (Total Factor Productivity) এই TFP-তে আমরা শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি ধরি আর তার সঙ্গে ধরি ক্যাপিটালের উৎপাদিকা শক্তি। অর্থাৎ শ্রমিক ও ক্যাপিটালের যুগ্ম উৎপাদিকা শক্তিকে বলা হয় TFP বা টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি। দু'টি শিল্প বিপ্লবের তুলনা করে বলা হচ্ছে আপাতত কম্পিউটার বিপ্লবে উৎপাদিকা শক্তি ইলেকট্রিক বিপ্লব থেকে কম।

আমেরিকা ছাড়াও বিভিন্ন দেশে একই প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে কি হবে বলা মুশকিল—আপাতত কম্পিউটার বিপ্লব নিয়ে আমরা যতটা উচ্ছ্বসিত ঠিক ততটা চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, উৎপাদিকা শক্তি বাড়ছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ। সোলো (Solow) ছাড়াও অনেকেই এই আপাত প্যারাডক্স নিয়ে নানান তত্ত্ব দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন আঁদ্রে বাসানিনি (Andrea

Bussanini)। স্টিফানো স্কারপেটা (Stefano Scarpetta) এবং ইগ্‌নাসিও ভিসকো (Ignazion Visco) এবং অনেকে। তাঁদের সব তথ্য ও তত্ত্ব ইউরোপকে নিয়ে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organization) কম্পিউটারের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছে। সামগ্রিকভাবে চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে না।

সমস্ত আলোচনা থেকে কয়েকটি তত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে। সংক্ষেপে এগুলি বলা যাক।

১) কম্পিউটার বা IT বিপ্লবে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী এক মন্দা। আর এই ধরনের মন্দা দীর্ঘস্থায়ী। সহজে দূর করা যাচ্ছে না।

২) পৃথিবীতে সর্বত্র বেকারি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি বেকারি বৃদ্ধির হার অনুন্নত দেশে।

৩) অন্য দুটি শিল্প বিপ্লবে আয়ের সমতা এসেছিল। অথচ এই IT বিপ্লবে দেশে অনৈক্য ও অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪) আশ্চর্য এই যে পৃথিবীব্যাপী ফিনান্স সেক্টরে কম্পিউটার ব্যবহার করে উৎপাদিকা শক্তি তেমন একটা বাড়েনি। অথচ বেকারি বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাঙ্কিং সেক্টরে। এই ব্যাঙ্কিং সেক্টরে উৎপাদিকা শক্তি কমছে। অবশ্য এটা আমেরিকার তথ্য। ভারতে খুব একটা বেড়েছে কি?

সোলোর প্যারাডক্স সমাধান করার নানান চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে কম্পিউটার উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন ও চাকরি বাড়াবে যদি আরও সময় দেওয়া হয়। প্রথম পঞ্চাশ বছর ইলেকট্রিক বিপ্লব যত চাকরি বাড়িয়েছিল তা কম্পিউটারও বাড়াবে যদি আরও বেশি সময় দেওয়া হয়। এই বেশি সময় দেওয়ার প্রধান প্রবক্তা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পল ডেভিড (Paul David) দ্বিতীয় আরও একটি উপায় সমাধান করা হচ্ছে তার নাম "Degree of Penetration"-অর্থাৎ সর্বসাধারণ প্রতি হাজারে কত কম্পিউটার ব্যবহার করছে। যদি অন্তত ৫০ শতাংশ লোক কম্পিউটার ব্যবহার করে তবে উৎপাদিকা শক্তি বাড়বে। তবে আমেরিকা ছাড়া এই Penetration Rate সর্বত্রই কম। আরও একটি বক্তব্য তোলা হচ্ছে। সব সমস্যার জন্য কম্পিউটার দায়ী এটা সত্য নয়। নানান কারণে উৎপাদিকা শক্তি বাড়ছে না। চাকরি বাড়ছে না। শুধু কম্পিউটারকে দোষ দিলে সামগ্রিক বিচার হবে না।

অর্থনীতিবিদরা এখন Solow's Paradox-এর জট খুলতে নানান চেষ্টা করছেন। সমাধান সূত্রের আরম্ভ ঠিক কোথায় তা নিয়ে মতানুবাদ। তবে এই নতুন প্রযুক্তি নিয়ে উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত হবার আগে একটু চিন্তা করা দরকার যতখানি কম্পিউটার ব্যবহার করছি দেশের সামগ্রিক উপকারে আসছে কতটা। টেকনোলজিটা কি খেলনা বা Toy? কি করে মানুষের বিশেষত চাকরি সৃষ্টি করা যায় তাই নিয়ে চিন্তা দরকার। ভারতবর্ষে এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা হচ্ছে না—তবু যে সর্বগ্রাসী বেকারি তার একটা আলোচনা অন্তত দরকার।

ডাঙ্কেলের প্রভাবে নিমগাছ, বাসমতী চালের দখল নিচ্ছে বিদেশীরা

ভারতীয়রা প্রায় পাঁচ বছর ধরে নিমগাছ নানা বিষয়ে ব্যবহার করে যাচ্ছে। নিমগাছের ডালে দাঁত মাজা এই দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। নিমগাছ থেকে নানা ওষুধ তৈরি হয় এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। আমাদের পুরনো শাস্ত্রে নিমগাছের নানান উপকারিতা সম্বন্ধে লেখা আছে। আমাদের দেশের চাষীরা চাষের আগে এবং পরে নিমগাছের পাতা ও ফল নানান পেস্টিসাইড হিসেবে ব্যবহার করে। গোলায় যখন ধান চাল তোলা হয় তখন নিমগাছের পাতা ও ফল সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আমাদের দেশে নিমগাছের উপকারিতা এতই ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী যে নিমগাছ সে আমাদের ভারতীয় নয়, এইটা এতদিন কারোর মাথায় কোনোদিনই খেলেনি।

যা সম্ভব তাই হয়েছে। হঠাৎ আমেরিকার এক সংস্থা ডব্লু আর গ্রেস কোম্পানি দাবি করেছে নিমগাছ থেকে যা ওষুধ পেস্টিসাইড তৈরি হবে তা তাদের 'আবিষ্কার' অতএব নিমগাছের থেকে উৎপাদিত কোনো দ্রব্য ব্যবহার করতে গেলে তাদের রয়্যালটি দিতে হবে। কারণ ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে তারা নিমগাছ 'পেটেন্ট' নিয়েছে। তাই শুধু নয়, নিমগাছ থেকে উৎপাদিত আরও পঞ্চাশটি ওষুধ, পেস্টিসাইড ও সংরক্ষণের উপর তাদের 'পেটেন্ট'। অর্থাৎ তাদের অনুমতি বিনা নিমগাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজাও তাদের 'পেটেন্ট'। যেহেতু তাদের 'পেটেন্ট' অতএব তাদের বা গ্রেস কোম্পানিকে রয়্যালটি না দিলে তারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে—ভারতের বিরুদ্ধে, চাষীদের বিরুদ্ধে এমনকি, সাধারণ জনতার বিরুদ্ধে।

এই ঘটনার বিশদ বিবরণ ও কারণ বলার আগে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। জার্মানির অন্য এক কোম্পানি আমাদের দেশের 'বাসমতী' চালের উপর 'পেটেন্ট' দাবি করছে। অর্থাৎ যে চাল আমরা প্রায় হাজার বছর ধরে

ব্যবহার করেছি তার এখন 'জার্মান' নামকরণ করে তাকে আমরা বিদেশী বলে চিহ্নিত করতে যাচ্ছি। বাসমতী চাল ছাড়াও অসংখ্য ভেষজ ওষুধ যা ভারতীয় বলে জানি ও বিশ্বাস করি তাকে বিদেশীরা 'পেটেন্ট' নিয়ে তাদের আবিষ্কার করে চালাবার চেষ্টা করছে। নিম, বাসমতী চাল, চালমুগরার তেল যা নানান চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় তাতে বিদেশী কোম্পানিগুলি নামের সামান্য পরিবর্তন করে 'আমেরিকার পেটেন্ট' বা 'জার্মানির পেটেন্ট' বলে দাবি তুলেছে। এর মানে হচ্ছে এইসব জিনিস ব্যবহার করতে গেলে বিদেশী কোম্পানিগুলিকে আমাদের রয়্যালটি দিতে হবে।

এই অবস্থা হবার কারণ কি? এর কারণ ডাঙ্কেল প্রস্তাবে লেখা আছে যে ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে 'পেটেন্ট' আইন পৃথিবীব্যাপী চালু হল। ডাঙ্কেল প্রস্তাবে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট বলে একটি অধ্যায় আছে। এর অর্থ হল যে যদি কোনো কোম্পানি কোনো ওষুধের বা আবিষ্কারের পেটেন্ট নেয় তবে সেই কোম্পানিকে প্রায় ২০ বছর ধরে আমরা রয়্যালটি দিয়ে যেতে বাধ্য। যেহেতু নিমগাছের উপর ভারতীয় সরকারি সংস্থা বা কোনো ভারতীয় কোম্পানি কোনো 'পেটেন্ট' নেয়নি, তাই যে কোনো বিদেশী সংস্থা যদি 'পেটেন্ট' নেয়, তবে সেই কোম্পানিকে তাদের 'আবিষ্কারের' জন্য আমাদের রয়্যালটি দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ আমাদের মূর্খামির সুযোগ নিয়ে আমেরিকার কোম্পানি এখন নিমগাছের উপর তাদের পেটেন্ট রাইট দাবি করছে।

আর আইনের মারপ্যাঁচ যে আমেরিকার গ্রেস কোম্পানি নিম গাছের উপর তাদের পেটেন্ট আমেরিকার সরকারের কাছে দাবি করছে আমেরিকার আইন অনুযায়ী। আর আমেরিকা যদি এই দাবি গ্রাহ্য করে, তবে নিমগাছ আর ভারতীয় থাকল না। হবে বিদেশী। কি আশ্চর্য সব আইন-কানুন।

নিমগাছের ওপর পেটেন্ট নেবার চেষ্টায় হঠাৎ ভারতীয়রা নড়েচড়ে বসেছে। প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় আর ২২৫ জন বৈজ্ঞানিক গ্রেস কোম্পানির বিরুদ্ধে দস্তখত করে সারা পৃথিবীব্যাপী এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতীয়দের বক্তব্য যে যুগ যুগ ধরে গ্রেস কোম্পানির দাবি অযৌক্তিক, অ-ঐতিহাকি ও অমানবিক।

আমেরিকার বক্তব যে নিমগাছ ভারতীয় হতে পারে তবে নিমগাছ থেকে উৎপাদিত 'নিমিক্স' বলে যে পেস্টিসাইড গ্রেস কোম্পানি তৈরি করেছে তা তাদের 'আবিষ্কার'। অতএব নিমিক্স-এর ওপর অধিকার গ্রেস কোম্পানির পূর্ণ মাত্রায় আছে। আর ভারতীয়রা বলে, 'নিমিক্স' নাম করলেই তো হবে না, আমাদের দেশের চাষীরা নিমগাছকে পেস্টিসাইড হিসেবে বহু হাজার বছর ধরে ব্যবহার করেছে, অতএব নিমগাছের ওপর কোনো 'পেটেন্ট' নেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাইরে। আর ভারতীয় চাষীরা যে প্রথায় নিমগাছকে

পেস্টিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত করে, তার প্রথা নিমিক্স থেকে আলাদা নয়।

গ্রেস কোম্পানি অবশ্য দাবি করেছে, যে প্রথায় তারা নিমগাছ থেকে নিমিক্স তৈরি করেছে তা ভারতীয় প্রথা থেকে আলাদা। তাদের প্রথা অনেক বৈজ্ঞানিক। অনেক উন্নত। অতএব নিমগাছ থেকে প্রস্তুত পেস্টিসাইড এখন আমেরিকান কোম্পানির জবরদখলে। ভারতীয়রা যদি নিমগাছকে আর কোনো সময়ে 'পেস্টিসাইড' হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তবে গ্রেস কোম্পানিকে অবশ্যই রয়্যালটি দিতে হবে।' আমেরিকায় বসবাসকারী কিছু ভারতীয় আমেরিকার কোর্টে এই বিষয়ে মামলা দায়ের করেছে। কারণ নিমগাছ ভারতীয় কিনা তার প্রথম ফয়সলা হবে আমেরিকান কোর্টে—ভারতীয় কোর্টে নয়। অর্থাৎ ডাঙ্কেল প্রস্তাবের এই ব্যাখ্যা বর্তমানে আমেরিকান সরকার দিচ্ছে।

কিছু কিছু আমেরিকান অর্থনীতিবিদ বা কোম্পানি লবি এই ধারণা চতুর্দিকে ছড়াচ্ছে যে নিমিক্স আবিষ্কারের কল্যাণে ভারতবর্ষ থেকে এখন নিমের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। নিমের রপ্তানি যেই বৃদ্ধি পাবে, নিমের দাম বাড়বে। আর আন্তর্জাতিক বাজারে নিমের দাম যত বাড়বে ভারতীয় গরিব চাষীদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। আমেরিকান গ্রেস কোম্পানির দৌলতে গরিব ভারতীয়রা এরপর বড়লোক হয়ে যাবে। মোট কথা গ্রেস কোম্পানিও স্বীকার করছে নিমগাছের দাম বাড়বে।

এর ফলটা উল্টোটাও হতে পারে আমেরিকান সাহেবরা তা চিন্তা করছে না। নিমগাছ ভারতীয় চাষীদের কাছে প্রায় বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তারা চাষের বিভিন্ন কাজে পেস্টিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড হিসেবে নিম ব্যবহার করে। নিমিক্স আসার ফলে তাদের নাম ব্যবহার বন্ধ হবে। আর তার অর্থ বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়ে চাষীদের এখন পেস্টিসাইড নিমিক্স কিনতে হবে। ফলে চাষের খরচও বেড়ে যাবে।

সমস্যাটা ডাঙ্কেল প্রস্তাবে। ডাঙ্কেল প্রস্তাবে ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট (TRIP) সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে তা বড় বড় কোম্পানির স্বার্থে। আর ভারতবর্ষে এবং আফ্রিকায় অসংখ্য দ্রব্য গাছ, ওষুধ গাছড়া ইত্যাদি আছে যার ওপর কারোর কোনোদিন পেটেন্ট নেবার কথাই মাথায় আসেনি। এই সুযোগটা কিছু সুযোগ-সন্ধানী আমেরিকার ও জার্মানির কোম্পানি পুরো মাত্রায় গ্রহণ করে হঠাৎ নিমগাছের উপর, বাসমতী চালের উপর 'পেটেন্ট' দাবি করছে। অর্থনীতিতে একটা কথা আছে 'কমন প্রপার্টি' অর্থাৎ কিছু দ্রব্য আছে যা সর্বসাধারণের। নিমগাছকে আমরা এতদিন 'কমন' প্রপার্টি হিসেবে দেখেছিলাম। ফলে আজকের দিনে এই গণ্ডগোল। কিছুটা আমাদের বোকামি।

এই সমস্যাটা যে হতে পারে তার জন্য কিছু অনুন্নত দেশ ১৯৯২ সালের আর্থ সাম্মিটে একটি প্রস্তাব রেখেছিল। প্রস্তাবের সারাংশ হচ্ছে, যে গাছ-

গাছড়া যে দেশে পাওয়া যায় সেই গাছ-গাছড়ার উপর সেই দেশের 'সার্বভৌমত্ব' থাকবে। বুশ প্রশাসন এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। পরে ক্লিন্টন প্রশাসন কিছুটা সার্বভৌমত্বে রাজি হয় তবে ক্লিন্টনের প্রস্তাব আমেরিকান কংগ্রেস এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। পরে এর নামকরণ করা হয়েছে 'বায়ো ডাইভারসিটি কনভেনশন' অর্থাৎ আমাদের দেশের গাছ-গাছড়ার উপর যে আমারই অধিকার, এটা উন্নত দেশগুলি এখনও মানেনি।

যদি এই বিষয়ে কোনো ফয়সালা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে না হয় তবে এক অদ্ভুত অবস্থা পৃথিবীতে তৈরি হবে। ভারতীয় আইন অনুযায়ী কৃষিজাত দ্রব্য পেটেন্ট হয় না—অথচ আমেরিকায় বা ইউরোপে হয়। অতএব আমাদের 'গোবিন্দভোগ চাল' বা 'বাসমতী চাল' যদি আমেরিকানরা বা জার্মানরা 'পেটেন্ট' নেয় তবে চাল হবে 'বিদেশী'। অর্থাৎ আমাদের 'পেটেন্ট রাইট' নিয়ে আমরা বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করছি না—বিদেশী কোম্পানিগুলি এর সুযোগ পুরো মাত্রায় নিচ্ছে।

১৯৯২-'৯৩ সালের এক হিসেব বেরিয়েছে। ভারতে ১০,০৩১টি নতুন দ্রব্যের জন্য পেটেন্ট দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বিদেশী কোম্পানিগুলি পেয়েছে ৮৯৯৭টি অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানিগুলো দশ শতাংশের বিষয় পেটেন্ট পেয়েছে কারণ তারা চায়নি। বা ভারতীয়রা মনে করে 'পেটেন্ট' রাইট থাকা বা না থাকা মূল্যহীন। এটা যে আর সত্যি নয়, বিশেষত ডাঙ্কেলের যুগে তা বুঝবার মতো দায়িত্ব ভারতীয় কোম্পানিগুলোর এখনও নেই। ভারতীয় সরকার ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা এখনও অমূল্য যে সব সম্পদ আছে তার পেটেন্ট নেয়নি—কারণ দরকার মনে করেনি।

অথচ বিদেশী কোম্পানিগুলো এখন বুঝছে যে 'পেটেন্ট' রাইট থাকা মানে প্রায় মনোপলি সুবিধা। আগেভাগে অসংখ্য দ্রব্যর উপর ভারতবর্ষেই তারা 'পেটেন্ট' নিচ্ছে। ফল হবে বহু দ্রব্যে ভারতীয়রা দ্রব্য ভারতের বাজারের জন্য উৎপাদন করতে পারবে না। অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানিগুলি আগেই 'পেটেন্ট' নিয়ে বসে আছে।

অর্থাৎ ডাঙ্কেল প্রস্তাব গ্রহণ করব অথচ তাকে উপেক্ষা করব এমন জোর ভারতীয় অর্থনীতিতে নেই। এটা ভারতীয়রা বুঝতে পারছে না—বা বুঝেও না বোঝার ভান করছে। ফলস্বরূপ ভারতীয় নিমগাছের উপর এখন আমেরিকার পেটেন্ট আর বাসমতী চাল যে জার্মান তা এখন বুঝতে হবে এবং জানতে হবে।

নেদারল্যান্ডসে পরিবেশ সংক্রান্ত কনফারেন্স ভেস্তে গেল

গত মাসে নেদারল্যান্ডের হেগে আবহাওয়ার পরিবর্তন দিয়ে এক কনফারেন্স হয়ে গেল। কনফারেন্সটা হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনস-এর আনুকূল্যে। নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্রেমওয়ার্ক কংগ্রেস অন ক্লাইমেটিক চেঞ্জ (Framework Congress on Climatic Change)। এই কনফারেন্সে অনেক কিছু আলোচিত হল—কিন্তু কোনো সুরাহা হল না। তার প্রধান কারণ আমেরিকা ও ব্রিটেন কোনো চুক্তিতে হস্তাক্ষর করতে অস্বীকার করল।

হেগ কনফারেন্সের সঙ্গে জাপানে কিয়োতো (Kyoto)-তে কনফারেন্স হয়েছিল। কিন্তু ফলাফল একই। কোনো উন্নত দেশ কোনো পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু চুক্তি করতে অস্বীকার করল। এই নিয়ে পৃথিবীব্যাপী নানান প্রতিবাদ-মিছিল ইত্যাদি হল কিন্তু কোনো সুরাহা হল না। উন্নত দেশগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো প্রটোকল বা চুক্তিতে হস্তাক্ষর করতে সম্মত হল না।

তবুও যে সব আলোচনা হেগ কনফারেন্সে হল তা থেকে পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে অনেক নতুন তথ্য জানা গেল। সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করছি।

১) গত শতাব্দী যাকে আমরা বিংশ শতাব্দী বলি তা গত ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরম ছিল। সবচেয়ে গরম ছিল ৯০-এর দশক। যদি এইভাবে পৃথিবী চলতে থাকে তবে ২০৫০ সালে পৃথিবী আরও উত্তপ্ত হবে ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস—৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে ২০৮০ সালে।

২) গরম হবার অনেক সমস্যা পৃথিবীতে আসছে। তবে ভারতের পক্ষে আশু সমস্যা হবে যে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার ক্রমশ গলছে। গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার বা বরফ আমাদের মুখ্য নদীর উৎস। গঙ্গোত্রী যদি গলতে থাকে তবে প্রথম দিকে ঘনঘন বন্যা হবে। বন্যার পর হবে খরা। আর খরা মানে আমাদের ভারতবর্ষে শস্য উৎপাদন অনিয়মিত হবে। ফলে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ভারতের কপালে।

৩) প্রকৃতিতে নানান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ৯০ দশকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা আর রাজস্থানে বৃষ্টিপাত ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ অসম,

পঃবঙ্গ, ওড়িশায় বৃষ্টি অনিয়মিত। ভবিষ্যতে কম দিন বৃষ্টি হবে—কিন্তু বৃষ্টির তীব্রতা (Intensity) বাড়বে। বৃষ্টির তীব্রতা আগামী দশকে অন্তত ২৫ শতাংশ বাড়বে।

৪) যে সব জায়গা নাতিশীতোষ্ণ ছিল তার দ্রুত পরিবর্তন হবে। 'সত্তর দশকে বাঙ্গালোরে যে তাপ ছিল তা ৯০ দশকে প্রায় ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে। লন্ডনের মতো দিল্লিতে শীতের দিনের সংখ্যা কমছে। দিল্লিতে আগেই অক্টোবরে শীত আসত। এই বছর শীত এসেছে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। কলকাতাতে ঘনঘন বৃষ্টি—কম শীতের দিন।

৫) আবহাওয়া ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিপর্যয় ঘনঘন হতে বাধ্য। ওড়িশা বা তামিলনাড়ুতে সাইক্লোনের গতি ক্রমশ বাড়ছে। প্রায় ২৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। আর সাইক্লোন সমুদ্রতটের নিকটবর্তী এলাকায় ঘনঘন হচ্ছে এবং হবেও।

৬) মৌসুমী বায়ুর গতিপথ কি পরিবর্তন হচ্ছে? প্যানেল ফর ক্লাইমেটিক সেতু Panel for climate change) অন্তত তাই মনে করছে। ফলে রাজস্থানে ঘন ঘন বন্যা আর চেরাপুঞ্জিতে প্রায় খরা। কেরল ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত হয় কমছে কিংবা দ্রুত পরিবর্তনশীল। কেরল কি ক্রমশ স্তব্ধ হচ্ছে? কেরল ও অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারত ক্রমশ স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হচ্ছে।

৭) পরিবেশ সংক্রান্ত বিপর্যয় গত দশ বছরে ভারতে দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৬০ সালে ভারতবর্ষে পরিবেশ সংক্রান্ত বিপর্যয়ের (Disastar) সংখ্যা ছিল ১৬টি। ১৯৯০ দশকে এই বিপর্যয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০টি।

এইবার হেগ কনফারেন্সে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। কারণ নদীমাতৃক উত্তর ভারতে এই গ্লেসিয়ারটি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। যদি গঙ্গোত্রী না থাকে তবে গঙ্গা কি থাকবে? গঙ্গা যদি না থাকে তবে ভারতের সভ্যতা কি ধরনের হবে? বলা হয়েছে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার ১৮ মিটার করে বছরে কমে যাচ্ছে। পিন্ডারি (Pindari) গ্লেসিয়ার বছরে ১৩০ মিঃ কমছে। হিমাচলপ্রদেশে ছোটা সিগ্‌রী (Chota Shigri) গ্লেসিয়ার বছরে ৬ থেকে ১০ মিটার কমছে।

ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর স্লো অ্যান্ড আইস (International Commission for snow and Ice) ভারতবর্ষকে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে, ভারতবর্ষ গ্লেসিয়ার সম্বন্ধে যদি কোনো 'নীতি' গ্রহণ না করে তবে ২০৩৫ সালের মধ্যে বিরাট বিপর্যয় আসতে বাধ্য? গঙ্গার ভবিষ্যৎ কি এটাই বর্তমানে অনেকের চিন্তার বিষয়।

ভারতবর্ষে বলা হচ্ছে কৃষি উৎপাদন হেক্টরপ্রতি ৫০ শতাংশ কমে যেতে পারে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বৃষ্টির এবং আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। যদি কৃষি উৎপাদন সহসা কমে যায় তবে

ভারতবর্ষে যে বিপর্যয় আসবে তা আমাদের কল্পনার বাইরে।

হেগ কনফারেন্সে মুখ্যত যে আলোচনা হয় তার বিষয়বস্তু ছিল পরিবেশ সংক্রান্ত বিপর্যয় ভারতে বা অন্য অনুন্নত দেশে যা আসছে তার মূল কারণ আসছে উন্নতদেশ থেকে। উন্নত দেশের শিল্প নীতির ফলে আজ অনুন্নত দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা।

পরিবেশ সংক্রান্তর আদি উৎস উন্নতশীল দেশে শিল্প। পৃথিবীর ৮০ শতাংশ শিল্পই উন্নতদেশে। প্রত্যেক শতাব্দীতে পৃথিবী কিছু না কিছুটা গরম হয়েছে। কিন্তু গত শতাব্দীতে যা গরম হয়েছে তা অভূতপূর্ব। আর এর প্রধান কারণ উন্নত দেশের শিল্পের ফলে যা হচ্ছে তার নাম গ্রীন হাউস এফেক্ট। কার্বন ডাই-অক্সাইড মেসাইন, নাইট্রিক অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস শিল্পের কল্যাণে পৃথিবীতে যে পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে তা অকল্পনীয়। শিল্প বিপ্লবের পরে পৃথিবীতে গ্রীন হাউস এফেক্ট প্রায় ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। নানা কারণে আমাদের পরিবেশ দূষিত। গ্রীন হাউস এফেক্ট কিভাবে হয়, কেন হয়, কতখানি হয় তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা নানান আলোচনা করছেন। তবে শিল্পের ফলে পৃথিবীতে যে নানান পরিবর্তন হচ্ছে এই নিয়ে সবাই একমত।

এইবার হেগ কনফারেন্সে দুটো জিনিসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথম যেহেতু ৮০ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান উন্নত দেশে অবস্থিত তাই শিল্প উন্নত দেশে এমনভাবে করা উচিত যাতে পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে দূষণ কমানো যায়। অর্থাৎ Eco-Friendly শিল্প যাতে উন্নত দেশ করতে পারে তার জন্য চাপ দেওয়া। আর যে শিল্পগুলি আছে তাকে Eco-Friendly করা। আমেরিকা ও ব্রিটেনে হেগে প্রথমে আপত্তি তুলল। তারা এই বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের পর জাপানও এককথা বলতে আরম্ভ করল। তাদের শিল্পগুলি বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত। অতএব এখন যদি এই শিল্পগুলি পরিবেশ বন্ধু করতে যাওয়া হয় তবে উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাবে। খরচ বেড়ে যাওয়া মানে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতায় তাদের পিছিয়ে আসতে হবে। তাদের জীবন ধারণের মান কমে যাবে। সুতরাং তারা পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

দ্বিতীয়, ইউনাইটেড নেশনস চেয়েছিল যে উন্নত দেশগুলি অর্থ সাহায্য করে পরিবেশ সংক্রান্ত এক তহবিল তৈরি করে। যারা যত শিল্পে উন্নত তাদের চাঁদা বেশি হবে। অর্থাৎ আমেরিকার চাঁদাই এই তহবিলে সবচেয়ে বেশি হবার কথা। তারপর জাপান, জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপের দেশগুলি। আমেরিকা এই তহবিল গঠনের বিপক্ষে। তারা আন্তর্জাতিক কোনো সমাধান চায় না— তারা চায় প্রত্যেক দেশ তাদের নিজস্ব পরিবেশ নীতি তৈরি করুক। অনুন্নত দেশগুলির বক্তব্য, সমাধান আন্তর্জাতিক স্তরেই করতে হবে। কারণ গঙ্গোত্রী

গ্লেসিয়ার যে ধ্বংস হচ্ছে তার কারণ ভারতবর্ষ নয়, উন্নত দেশের শিল্পনীতি। উন্নত দেশের শিল্পই আজকে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করছে। সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে কোনো দেশই নীতি গ্রহণ করলে তা সফল হবে না। গ্রীন হাউস এফেক্টই পৃথিবীর সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইউনাইটেড নেশনসকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আপাতত হেগ কনফারেন্স ভেস্তে গেল। কোনো নীতিই গ্রহণ করা হল না। একটা 'উপদেশ' অবশ্য এল সেটা হল আমাদের দেশের বন সংরক্ষণ নীতি আরও জোরালো করতে হবে। যত্রতত্র গাছ কাটা চলবে না। যদি প্রয়োজনে গাছ কাটতেই হয় তবে তার তিনগুণ বা চারগুণ গাছ লাগাতে হবে।

বৃক্ষ ছেদন চলবে না এটা অবশ্য বনলুটেরা নাও মানতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা খোদ উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে গাছ কাটা চলছে নির্বিচারে। অন্তত খবরের কাগজ তাই বলে। কার স্বার্থে এবং কোন্ মূল্যে এই গাছ কাটা পর্ব চলছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি জানান তবে পরিবেশ দূষণ নীতি 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও' সার্থক হবে। এই বৃক্ষ ছেদন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে হবে সবাই তাই ভেবেছিল। আপত্তিও জানিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংক্রান্ত সিলেবাসও চালু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছগুলি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি নয়। অতএব উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দায় নেই। দায়িত্বও নেই। গাছ কাটা হয়। চলছে এবং চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য বর্তমানে এই বিষয়ে কানে শোনেও না, কথাও বলবে না, চোখেও দেখবে না। বলতে গেলে এঁড়ে তর্ক করবে। তাই গাছকাটার সপক্ষে যুক্তি, ধারালো বক্তব্য শানিত করে বিপক্ষকে ঘায়েল করাই নীতি। বিপক্ষ অবশ্য ঘায়েল হবে কিন্তু গাছগুলি কি বাঁচবে। সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ই জানে। বিশ্ববিদ্যালয় মানে অবশ্য কর্তৃপক্ষ। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন বা ক্ষমতাপ্রিয়।

ঋণের বদলে সাহায্য, বিশ্বায়নের মানবিক মুখোশ

বিদেশী ঋণ পাওয়া যায় কিন্তু বিদেশী সাহায্য বা যাকে বলে ফরেন এইডস তা কি পাওয়া যাবে? বিশ্বায়নের একটা জাত হচ্ছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আর্থিক সাহায্য ক্রমশ বন্ধ হতে হবে। বিদেশী সাহায্য বোধহয় কোথাও কোনো সমস্যার সমাধান করেনি। আফ্রিকার দেশগুলি সাহায্য পেয়ে নেতারা টাকাটা আত্মসাৎ করে সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করেছে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা 'বিদেশী সাহায্য' স্বদেশী দরিদ্রশ্রেণীর জন্য খরচ না করে পকেটস্থ করেছিল। এটা সর্বত্র এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেটা আফ্রিকার কঙ্গোতেই হোক বা ল্যাটিন আমেরিকার নিকারাগুয়াতে।

'সাহায্য' পেয়ে কোনো দেশ উন্নতি করেছে এটা অনুন্নত দেশেগুলিতে ঘটছে না। যদি 'সাহায্য' পেয়ে উন্নতি হয়ে থাকে সেটা নিতান্তই প্রান্তিক। সাহায্য বা এইডস ক্রমশ বন্ধ হয়েই আসছিল। হঠাৎ মার্চ ২০০২ সালে ইউনাইটেড নেশনস 'সাহায্য' নিয়ে মেক্সিকোর মনতারী বলে এক জায়গায় একটা কনফারেন্স ডেকে বসল। ইউনাইটেড নেশনস পৃথিবীর বিখ্যাত নেতাদের এই মিটিংয়ে আসবার জন্য অনুরোধ করল। দেখা গেল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ও ইউরোপের অনেক নেতাই উপস্থিত। উন্নত দেশগুলির কর্তব্য আছে অনুন্নত দেশগুলির সম্বন্ধে, এটাই মনে করিয়ে দেবার জন্য এই কনফারেন্স। যারা উন্নত দেশ তারা অনুন্নত সম্বন্ধে কিছুই করবে না এটা ইউনাইটেড নেশনস মানতে চায় না। 'সাহায্য' দেওয়া বিশ্বায়নের পরিপন্থী নয় এটা বোঝাবার জন্য এই কনফারেন্স।

বস্তুত সবাই এখন 'বিশ্বায়নে'র মানবিক মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় অনুন্নত দেশগুলি পেরে উঠছে না। দারিদ্র্যসীমার নিচে লোক কমানো যাচ্ছে না। চাকরি তৈরি হচ্ছে না। রপ্তানি বাড়ানো যাচ্ছে না। আয়ের বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। দেশের মধ্যেই একজন বড়লোক হচ্ছে আর অন্যদল দরিদ্রতর হচ্ছে। চাকরির সুযোগ-সুবিধা কমছে। প্রতিযোগিতায় দুর্বল

শ্রেণী সবল শ্রেণীর কাছে পর্যুদস্ত ও পরাজিত।

আফ্রিকার ঘানার কথাই ধরা যাক। আই এম এফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রায় বছর কুড়ি ধরে ঘানাকে সার্টিফিকেট দিয়ে আসছে 'আদর্শ' দেশ হিসেবে। বা 'মডেল' দেশ। এই মডেল দেশটির এখন কি অবস্থা?

এই মডেল দেশে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০-র অনেকটাই মিলিটারি ডিকটেটরের নিয়ন্ত্রণে। মিলিটারি ডিকটেটর থাকলেও মডেল দেশ হওয়া যায় বা আমেরিকার গুড কনডাক্ট সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, শুধু ঘানা নয়, প্রতিবেশী পাকিস্তানও তার উদাহরণ। ১৯৮৩ সালে আরেক মিলিটারি ডিকটেটর ক্ষমতায় এল অবশ্য পশ্চিমী দেশগুলির সহায়তায়। ডিকটেটরের নাম জেরি রলিং। দেখা গেল দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

রলিং-এর আমলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেল ৪০ শতাংশ। আর ঘানার মুদ্রা সেডি'র ক্রমশ অবমূল্যায়ন হল। ঘানার প্রধান উৎপন্ন বস্তু কোকার দাম অস্বাভাবিক ভাবে কমে গেল। রলিং দেশের ব্যুরোনেমিল খুশি রাখার জন্য এক বছরে তাদের বেতন ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে দিলেন। মিলিটারিদের বেতন তারও বেশি। সব অর্থই মিলিটারি পুষতে চলে গেল। ঘানাতে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা। দলে দলে লোক দেশ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করল। রলিং বিদেশী মাস্টারদের খুশি করবার জন্য সব সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি করে দিলেন। আবার ছাঁটাই আবার বেকারি। সরকারি ব্যাঙ্কিং এবং ইনস্যুরেন্স বিদেশীদের হাতে চলে গেল। রলিং অবশ্য এখন নেই, এসেছিলেন কুফুর। অবস্থার উন্নতি হবার বদলে ক্রমশ অধোগতি। কুফুর নাকি 'গণতন্ত্রে বিশ্বাসী'।

ঘানাকে 'মডেল' দেশ বলে এতদিন চালানো হয়েছিল। দেখা গেল এই মডেল দেশের ঋণ নেবার বা পরিশোধ করার কোনো ক্ষমতাই নেই। দেশটাকে বাঁচাতে গেলে 'সাহায্য' দিতে হবে। শুধু ঘানা নয়, ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ ঋণ শোধ করতে পারবে না। অথচ তাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। ইউনাইটেড নেশনস তাই মেক্সিকোতে কনফারেন্স ডাকল।

রাজনীতিবিদরা অনেকেই থিয়েটার পছন্দ করেন। প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন পপ গায়ক বানোকে। বুশ বক্তৃতা দেবার সঙ্গে বানো গান গেয়ে পৃথিবীতে কত দুঃখ তা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে ঘোষণা করলেন যে আমেরিকা ৫০০ কোটি ডলার সাহায্য হিসেবে অনুন্নত দেশগুলিকে দেবে। তবে অনুন্নত দেশ যদি আমেরিকার সাহায্য পেতে চায় তবে কয়েকটি শর্ত পালন করতে হবে। দেশে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। আর চতুর্থ শর্ত হল সমস্ত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি করে দিতে হবে। বুশ এই সাহায্যের গালভরা নামও দিলেন 'মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ অ্যাকাউন্ট'।

বুশের বক্তৃতায় ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষত জার্মানি ভয়ানক অসন্তুষ্ট।

কারণ তার আগের দিন ইউরোপীয়ানরা তাদের সাহায্য প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তারা অঙ্গীকারবদ্ধ যে বর্তমানে তারা তাদের মোট জাতীয় উৎপাদন জি এন পি'র ০.৩৩ শতাংশ সাহায্য দিচ্ছে। সেটা বাড়িয়ে তারা তাদের জি এন পি'র ০.৩৯ শতাংশ করবে। তার মানে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন 'সাহায্য' দেবে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার। সেটা আমেরিকার 'সাহায্য'র প্রায় পাঁচগুণ। অথচ ড্রামা করে বুশ এমনভাবে ঘোষণা করলেন যে এক পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক বলে ফেললেন 'বুশ বিরাট দার্শনিক' আর তাঁর ৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্য এক 'দার্শনিকের ভবিষ্যৎ দর্শন'। ইউরোপীয়ানরা খেপে গেল। তারা বেশি সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অথচ বুশকে নিয়ে যত লাফালাফি।

ইউরোপীয়ানরা সাহায্য GNP-র সঙ্গে যুক্ত করে আরও একধাপ এগিয়ে ছিল। যদি ইউরোপের GNP-প্রতি বছরে ১.৫ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ হারে বাড়ে তবে প্রত্যেক বছর তাদের সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার বাড়বে। অর্থাৎ ২৫ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ৩২ বিলিয়ন ডলার হবে। আর আমেরিকা মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলার ঘোষণা করেছে। আমেরিকা অবশ্য বলেছে তারা আরও 'সাহায্য' ভবিষ্যতে দেবে।

এখন 'সাহায্য' যারা আপাতত পাচ্ছে তারা কোন্ দেশ? তারা কি সবচেয়ে দরিদ্র দেশ? উত্তর হচ্ছে সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলি সাহায্য পাচ্ছে না বরং অনুন্নত দেশের মধ্যে যাদের অবস্থা ভালো তারাই সাহায্য পাচ্ছে।

অর্থ হিসেবে সবচেয়ে বেশি 'সাহায্য' পাচ্ছে চীন দেশ। ২০০০ সালে প্রায় ১৭ কোটি ডলার। চীনের পরে আছে ভিয়েতনাম। তারপরে রাশিয়া, ভারত সাহায্য পাচ্ছে তবে জি এন পি'র মাত্র ৩.৩ শতাংশ। আর বাকি অনুন্নত দেশগুলি প্রায় পাচ্ছে না। বা পেলেও সামান্য। অনুন্নত দেশের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে দু'টি দেশ প্রচুর সাহায্য পাচ্ছে একটি হল পাকিস্তান আর অন্যটি ইজরায়েল।

সমস্যাটা হচ্ছে কোন্ দেশ কত সাহায্য পাবে তা কি রাজনৈতিক কারণে নির্ধারিত হয়, না অর্থনৈতিক কারণে। উত্তরটা হচ্ছে আপাতত আমেরিকার ও ইউরোপের যে সাহায্য গুচ্ছ দেওয়া হচ্ছে তা মুখ্যত রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবে কে আমেরিকার বা ইউরোপের বশংবদ হবে তার ওপর সাহায্য পাওয়া নির্ভর করছে।

চীনকে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে 'Tied' বা এক ধরনের শর্তসাপেক্ষ। ইউরোপ ও আমেরিকা চীনকে বেশি সাহায্য দিচ্ছে তার কারণ তারা আশা করে চীন তাদের দেশের উৎপাদিত জিনিস কিনবে। অর্থাৎ জার্মান চীনকে সাহায্য দেবে যদি চীন জার্মান দ্রব্য কেনে। ফলে জার্মানির রপ্তানি বাড়বে।

ইদানীং আমেরিকা রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানে সাহায্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

তার শর্ত হল যে পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। পাকিস্তানে নাকি গত ১০ বছরে মাদ্রাসা ছাড়া নতুন কোনো স্কুলই প্রতিষ্ঠা হয়নি। আমেরিকা চায় পাকিস্তানে 'আধুনিক' স্কুল আর মাদ্রাসার জন্য 'আধুনিক' সিলেবাস। আমেরিকা এখন পাকিস্তানের স্কুল ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে চায়।

নিকারাগুয়া ল্যাটিন আমেরিকার একটি ছোট দেশ। তবে বহুদিন ধরে এই রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধর ফলে নিকারাগুয়া বিধ্বস্ত। উপরন্তু এই গৃহযুদ্ধের একটি জাতিগত দিকও আছে। ফলে সংঘর্ষ তীব্র। আমেরিকা বর্তমানে এই রাষ্ট্রে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তার কারণ নিকারাগুয়ার বর্তমান শাসক গোষ্ঠী আমেরিকার প্রিয়পাত্র। তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে খুব বেশি সুবিধা করতে পারছে না। আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য পাঠাতে পারছে না। তাই 'পরোক্ষ' ভাবে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ সাহায্যের কারণটা কোনো দার্শনিক তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়, একেবারে স্ট্র্যাটেজিক।

ভিয়েতনামের ঘটনা একটু অদ্ভুত। সবারই জানা। আমেরিকা ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি বরং হেরেই গেছিল। ভিয়েতনামে সমস্ত জমি সরকার অধিকৃত করেছিল। ভিয়েতনাম সরকারি জমির বদলে এখন কৃষিতে লিজিকরণ চায়। অর্থাৎ চাষীরা লিজ প্রথায় জমিতে চাষ করবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে চাষীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া সহজ পথ নয়। অতএব আমেরিকা এখন ভিয়েতনামকে কৃষিতে সাহায্য করতে চায়। ফলে 'সাহায্যর পরিমাণ' ক্রমাগত বাড়িয়ে চলছে। আমেরিকা বুঝতে পারছে যে অনেক দেশকে ঋণ দিয়ে লাভ নেই। শোধ করতে পারবে না। অতএব সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া যাক। অর্থাৎ সাহায্যর কারণ (বাড়া বা কমা) সব সময় রাজনৈতিক। ভারত যদি বশংবদ হয় তবে পশ্চিমী দেশ থেকে মোটা সাহায্য পাবে। নচেৎ নয়।

শতাব্দীর তেল সঙ্কট আর বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা ভারতে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করে সরকার

বর্তমানে সারা পৃথিবী তোলপাড়। পেট্রোলের দাম ক্রমশ বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে পেট্রোলের দাম যত বাড়ছে পৃথিবীব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। যত মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে তত বিশ্বব্যাপী মন্দা। একটার পর একটা শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেকারি সমস্ত পৃথিবীতে বাড়ছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও অন্যান্য দেশে শ্রমিক স্ট্রাইক। মূল্যমান যত বাড়ছে তারা তত বেশি মজুরি দাবি করছে। মজুরি বৃদ্ধি না হলেই ধর্মঘট। বস্তুত আজকে সমস্ত ইউরোপ অগ্নিগর্ভ। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে পেট্রোলের দামই আজকে মূল্যমান ঠিক করছে। পেট্রোলের দাম বাড়লেই সর্বনাশা মন্দা। পেট্রোলের দামের সঙ্গে পৃথিবীর অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বস্তুত একটি দ্রব্যই পৃথিবীব্যাপী অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে—সেই একটি দ্রব্যের নাম পেট্রোল। এই পেট্রোল বা তেলের দাম ব্াড়া মানেই জ্বালানির দাম বাড়া। আর জ্বালানির দাম বাড়া মানে মুদ্রাস্ফীতি।

পেট্রোলের দাম যে পৃথিবীর মূল্যমান ঠিক করে তার প্রমাণ হিসেবে ৭০ দশকের সঙ্কটের উল্লেখ করা হচ্ছে। উদাহরণ দেওয়া যাক।

সারণী-১

বছর	মূল্যমান পৃথিবীর গড় হিসেবে
১৮৭২	১০০
১৯৭২	৩০০
১৯৭৩	১০০
১৯৭৪	৩০০

উপরের সারণী থেকে বলা হচ্ছে যদি ১৮৭২ সালে মূল্যমান ১০০ থাকে তবে প্রায় ১০০ বছর লেগেছিল তিনগুণ হতে অর্থাৎ ৩০০ হতে। আবার ১৯৭৩ সালের মূল্যমান যদি ১০০ ধরি তবে এক বছরেই মূল্যমান তিনগুণ

হয়েছিল। আর এক বছরে মূল্যমান তিনগুণ (১৯৭৩-৭৪) হয়েছিল তার প্রধান কারণ এক লাফে এক বছরে পেট্রোলের দাম ২ ডলার প্রতি এক ব্যারেল থেকে লাফিয়ে ৬ ডলার এক ব্যারেল হয়। সেই পেট্রোলের দাম তিনগুণ বাড়ে পৃথিবীব্যাপী এক বছরেই মূল্যমান তিনগুণ বাড়ে। তেলের দাম বাড়তে বাড়তে ১৯৭৯ সালে ১০ ডলার তারপরে ১৯৮০ সালে ১২ ডলার পরে ১৫ ডলার বাড়ে। যত তেলের দাম বাড়ে তত পৃথিবীব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। তেলই একমাত্র জ্বালানি। তার বিকল্প খোঁজার চেষ্টা হয়। সৌর শক্তি, সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি, বায়ু শক্তি, আণবিক শক্তির ওপর পৃথিবীব্যাপী রিসার্চ হয়। তবে এখনও কোনো বিকল্প পাওয়া যায়নি। পেট্রোলই একমাত্র মুখ্য জ্বালানি। সীমিত পৃথিবীতে তেল ভাণ্ডারও সীমিত।

তেলের দাম এক বছরে তিনগুণ কেন বাড়ল এবং তার পরের থেকে পৃথিবীতে ঘন ঘন তেল-সঙ্কট কেন হচ্ছে তার মানে বোঝা দরকার। তেল পলিটিক্স আর অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তেল যদিও পৃথিবীতে এখনও মুখ্য জ্বালানি তবুও তেল পাওয়া যায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে। তেল পাওয়া যায় আরব দেশে। এই তেলই রপ্তানিযোগ্য। আরব দেশ ছাড়া অন্যত্র যেখানে তেল পাওয় যায় তা হল দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, আফ্রিকার নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া আর ব্রিটেনের উত্তরে সমুদ্রে। এছাড়া রাশিয়াতেও তেল পাওয়া যায়। আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তেল খরচ করে। আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলে তেল পাওয়া যায়। তবে আমেরিকা সাধারণত নিজের দেশের উৎপাদিত তেল ব্যবহার করে না। হ্রদ বা লেক করে তেল জমিয়ে রেখেছে। কারণ পৃথিবীর পলিটিক্স অনিশ্চিত। আরব দেশে কখন গণ্ডগোল হয়। তার জন্য তাদের বা আমেরিকান দেশের তেল মোটামুটি ভাবে ব্যবহার হয় না। আমেরিকা মুখ্যত আরব দেশের তেলই ব্যবহার করে। আমেরিকার মোটরগাড়ি, প্লেন, ফ্যাক্টরি শিল্প, ঘর গরম করার প্রথা সবাই আরব দেশের তেল। ভারতের তেল উৎপাদন যৎসামান্য। আমাদের বাৎসরিক প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র দুই মাস।

আর আরব দেশে যে তেল পাওয়া যায়, সেটা আরবরা বহুদিন ধরে জানত না। বা জানার জন্য যে টেকনোলজি থাকার কথা আরব দেশে ছিল না। তেল উৎপাদন করতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন টেকনোলজি লাগে। আর টেকনোলজির যোগান দিয়েছিল সাতটি বোন বা সেভেন সিস্টারস। এই সাত বোনের নাম স্ট্যান্ডার্ড অয়েল একসন, মোবিল, গালফ টেক্সাকো, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, অ্যাংলো ডাচ। আগে যে কোম্পানিগুলি ব্রিটিশ বা ডাচ ছিল পরে সেগুলি আমেরিকান কোম্পানি হয়ে যায়। আর এই সাত বোন তেল কোম্পানি মুখ্যত আমাদের ভাষায় অলিগপলি অর্থাৎ মনোপলির কাছাকাছি। একটি হল মনোপলি আর যেহেতু সাতটি তাই অলিগপলি।

এই সাতটি কোম্পানি পৃথিবী ভাগ করে নিয়েছিল। কোন্ কোম্পানি কোন্ জায়গায় কি দামে তেল বিক্রি করবে তার ঠিকঠাক এই সাত কোম্পানি করত। লিবিয়া একবার একটি নতুন কোম্পানি খুলতে গিয়ে এই সাত বোনের এমন বাধা পেয়েছিল যে কোনো নতুন কোম্পানি আর খোলা সম্ভব হয়নি। ইরানের মোসাফেক একবার তেল কোম্পানিগুলিকে জাতীয়করণ করতে গিয়ে বিদেশী দ্বারা নিয়োজিত গুপ্তচর দিয়ে খুন হয়েছিলেন। মোসাফেক তখন ইরানের প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ সমগ্র আরব দুনিয়ায় এই সাতটি তেল কোম্পানির দাপট।

তারা আপেক্ষিকভাবে সস্তা দরে তেল বিক্রি করত। কারণ যে আমেরিকান সরকারের এই তেল কোম্পানিগুলি পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছে তেলের দাম কম রাখবার পক্ষপাতী ছিল। কারণ আমেরিকান মোটর গাড়ি যদি ব্যবসা বৃদ্ধি করতে চায় তবে তেলের দাম কম রাখাই শ্রেয়। আরও বলা হত ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমেরিকা খুব বেশি মুদ্রাস্ফীতি অনুভব করেনি কারণ তেলের দাম কম থাকায় টেকনোলজির আমূল পরিবর্তন হয়েছিল আর পৃথিবীর বাণিজ্য আমেরিকান কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বজায় রাখতে পেরেছিল। খুব সংক্ষিপ্ত করে বলতে গেলে তেলের দাম কম রাখাই আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল। আরব দেশগুলি তেল কোম্পানি থেকে রয়্যালটি পেত এবং শেখরা তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। তারা সাত বোনের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করত না।

বিপদটা এল যখন আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ নতুন করে সত্তর দশকের প্রথমে আরম্ভ হল। আরব দেশগুলির সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধ যখন ক্রমাগত হচ্ছে, তখন আরব দেশের নেতারা একত্রিত হয়ে ঠিক করল যে তেলকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। কারণ আমেরিকা সহ পাশ্চাত্য দেশগুলি ইজরায়েলের পেছনে আর তারা আরব তেলের উপর নির্ভরশীল। আরব দেশে কোনোদিনই ঐক্য ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের পটভূমিকায় ইজরায়েলকে শাস্তি এবং পাশ্চাত্য দেশগুলিকে শায়েস্তা করার জন্য কার্টেল তৈরি করল। কথাটির মানে উৎপাদন দেশগুলি একত্রিত হয়ে একযোগে তেলের দাম ঠিক করল। অর্থাৎ সাত বোনের হাত থেকে দাম ঠিক করার দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হল এবং কত উৎপাদন করবে তার জন্য আরব দেশগুলি কোটা ঠিক করল। এই কার্টেলের নাম অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম একস্পোর্টিং কানট্রিস বা (OPEC)। প্রথমে ওপেকের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ যেমন ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনেজুয়েলা। পরে সদস্য সংখ্যা পাঁচ থেকে বেড়ে ১৩তে দাঁড়ায়। অবশ্য ওপেকের সদস্য সংখ্যা কখনও বাড়ে কখনও কমে। যদিও রাশিয়া কখনই ওপেনের সদস্য নয়।

৭০ দশকের গোড়ায় ওপেক প্রথম দফায় তেলের দাম তিনগুণ বাড়িয়েছিল। সাতবোন আপত্তি করল। সংঘর্ষ হল দুই দৈত্যের—একদিকে

অলগপলি আর অন্যদিকে কার্টেল। এই সংঘর্ষে কার্টেলই জিতল। সংক্ষেপে আরব দেশগুলি বুঝল তেল পৃথিবীতে বিরাট শক্তি—সামরিক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যায়। রক্তের স্বাদ একবার পেলে আরও রক্ত খেতে ইচ্ছা করে। সত্তর দশকে তেলের দাম বেড়ে হল ২ ডলার থেকে (৬) ডলার ব্যারেল প্রতি। ক্রমশ এরা দাম বাড়িয়ে চলল।

সারণী-২

সাল	তেলের দাম
১৯৭১-৭২	২ ডলার বা নিচে
১৯৯১-৯৭	১৫ থেকে ১৯ ডলার
১৯৯৯	১০ ডলার
২০০০ (মার্চ)	২৮ ডলার
২০০০ (সেপ্টেম্বর)	৩৪ ডলার থেকে ৩৮ ডলার

অর্থাৎ হঠাৎ পেট্রোলের দাম ২০০০ সালে বেড়ে গেল। প্রশ্ন উঠতে পারে ১৯৯৯ -এ কমেছিল কেন? উত্তরটা হচ্ছে সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুদ্রা সঙ্কট—বিশেষত জাপানে বাণিজ্য সঙ্কট থাকাতে তেলের দাম কম ছিল। আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যখনই অর্থনীতিতে চাঙা হয়ে উঠল তেলের দাম বেড়ে গেল। যা যোগান আর যা চাহিদা তার মধ্যে বিস্তর ফারাক। বলা হচ্ছে এই ফারাক প্রায় দিনে তিন মিলিয়ন ডলার। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে জানুয়ারি ২০০১ সালের মধ্যে ব্যারেল প্রতি দাম হবে ৪০ টাকা। এই সময়ে আমেরিকা ওপেক দেশগুলিকে অনুরোধ করে যদি তেলের দাম কম না করা হয় তবে বিশ্বব্যাপী মন্দা বা Recession আরম্ভ হয়ে যাবে। তাতে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি এখন পৃথিবীর ৪০ শতাংশ তেল উৎপন্ন করে। রাশিয়া, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নর্থসি অঞ্চল ইত্যাদিরা এখন ৬০ শতাংশ তেল নিয়ন্ত্রণ করে। আরব প্রভাবান্বিত কার্টেলকে অনুরোধ যেন তেলের উৎপাদন আরও বাড়ায়। ওপেক দেশগুলিকে দুই রকম সদস্য—যাদের বলা হয় HAWK বা বাজপাখির দল যারা দাম কমাতে চায় না যেমন ভেজুয়েলা, লিবিয়া, নাইজেরিয়া আর ইরাক। আর তাছাড়া আছে DOVE বা পায়রার দল যেমন সৌদি আরব, কুয়েত UAE। যা হোক ঠিক হয়েছে ওপেক দেশগুলি ৮০০,০০০ ব্যারেল অধিক উৎপাদন করে তেলের দাম কমিয়ে ব্যারেল প্রতি ২৮ থেকে ৩০ ডলার রাখবে। যদিও বিশ্বশুদ্ধ রাষ্ট্রগুলির অনুরোধ ব্যারেল প্রতি ২৮ ডলারের বেশি না হয়।

ভারতবর্ষের মুদ্রাস্ফীতি এবং বর্তমান রুপির অবমূল্যায়ন এই তেলের দামের ওপর নির্ভরশীল। গত বছর এই মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩ শতাংশ। এখন সেপ্টেম্বর মাসে ৬ শতাংশের ওপর। রুপির দাম ক্রমশ কমছে। ডলার প্রতি ৪৬ টাকার বেশি আরও নাকি কমছে। এই মুদ্রাস্ফীতি ও রুপির দাম

তেলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমরা যে দামে বিশ্ব থেকে তেল কিনি আর স্বদেশের বাজারে যে দামে বিক্রি করি তার মধ্যে তফাত থাকে। বিশ্বদাম বেশি কিন্তু স্বদেশের দাম কম তাহলে বলি অয়েলপুল ডেফিসিট। এই ঘাটতি আগস্ট মাসে (২০০০) ছিল ৯০০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বরের প্রথমে হয় ১৫০০০ কোটি টাকা। যত দাম বিশ্বে বাড়বে তত অয়েল পুল ডেফিসিট বাড়বে। এটাই বর্তমানে 'তেলের সঙ্কট'। এই সঙ্কট থেকে বাঁচবার কোনো উপায় আছে কি? চার্‌টি সুপারিশ করা হচ্ছে।

১) বিশ্বব্যাপী তেলের দাম যত কমবে আমাদের অয়েলপুল ডেফিসিট কমবে। ৮০০,০০০ ব্যারেল তেল বাড়াবার কথা বললেও তেলের দাম ক্রমশ বাড়ছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এখন ব্যারেল প্রতি ৩৬ থেকে ৩৮ ডলার। অর্থাৎ ঘাটতি বাড়বে কমবে না। ২) আমাদের দেশে তেলের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণে বাজারে ওঠা-নামার সঙ্গে সম্পর্কহীন। দ্বিতীয় সুপারিশ হচ্ছে স্বদেশে তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া। স্বদেশে তেলের দাম বাড়া মানেই মুদ্রাস্ফীতি। ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেশে বাড়বে। ৩) তৃতীয় সুপারিশ হচ্ছে তেলের উপর যত কর বা ট্যাক্স আছে তা তুলে দেওয়া। বর্তমানে তেলের উপর সরকারি ট্যাক্স আছে। ওপেক দেশগুলি এই ট্যাক্স কমানোর জন্য বিশ্বব্যাপী হুমকি দিচ্ছে। ট্যাক্স কমানো যায়—তাতে পেট্রোলের দাম কমবে কিন্তু সরকারি বাজেট ভয়ানক ভাবে বিপর্যস্ত হবে! তবুও বলা হচ্ছে ভারতে ট্যাক্সের বোঝা কমালে অয়েল পুল ডেফিসিট ১৫০০০ কোটি টাকা থেকে কমে ৩০০০ কোটিতে দাঁড়াবে বা তার কিছু কম। অর্থাৎ বাজেটে ট্যাক্স বাবদ ১২০০০ কোটি টাকা কম আদায় হবে। ৪) সরকার অয়েল কোম্পানিগুলির জন্য বাজারে ১৫০০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়তে অনুমতি দিতে পারে। বাজারে যদি বন্ড ছাড়া হয় তবে যারা তেল আমদানি করছে সেই সব কোম্পানিগুলি বাজারে কিছু টাকা উঠিয়ে তাদের ঘাটতি মেটাতে পারে।

কোন্‌টি সরকার গ্রহণ করবে বলা মুশকিল। তবে আকাশে-বাতাসে খবর যে তেলের দাম দেশে আবার বাড়ানো হবে। এটাই সহজ পন্থা। সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশে পেট্রোল পাওয়া যায় না। পেট্রোলের বিকল্প সৌরশক্তি বা অন্য কোনো জ্বালানি ব্যবহারের চেষ্টায় বিশেষ লাভ হয়নি। দেশের তেলের মজুত ভাণ্ডার খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে। সাফল্য আসেনি। তার মানে আরব দেশেগুলি ইচ্ছা করলেই ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। তেল কিন্তু এখন সামরিক উদ্দেশ্যেও ব্যবহার হয় এবং হয়েছে।

বিচার পদ্ধতিতে বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে

যে কোনো গণতন্ত্রে তিনটি ভাগ থাকে। একটি আইন তৈরি করে—নাম পার্লামেন্ট বা লেজিসলেটার। অন্যটি আইনের প্রয়োগ করে নাম এক্সিকিউটিভ বা শাসনতন্ত্র। অন্যটি বিচার ব্যবস্থা বা জুডিসিয়ারি—তারা দেখে আইন ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে কিনা, আইনের প্রয়োগ ঠিক হচ্ছে কিনা আর মানুষের অধিকার ব্যবস্থা সুরক্ষা করা যাচ্ছে কিনা। গণতন্ত্রে এই বিচার ব্যবস্থা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেট, মন্ত্রী বা পুলিশ কারোর অধীনে নয়। বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ।

গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কত্ব বা ডিকটেটরশিপের তফাত বিশেষ এক জায়গায়। ডিকটেটরশিপে বিচার ব্যবস্থাও ডিকটেটরের অধীনে এবং সেখানে মানুষের অধিকার বিচার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত বা প্রসারিত হয় না। গণতন্ত্রে মানুষ আশা করতে পারে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। বিচারকদের কেউ কোনোদিন প্রভাবিত করতে পারবে না। বস্তুত গণতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন করার জন্য পৃথিবীর মানুষ বহু আন্দোলন করেছে। প্রায় কয়েকশ' বছরের আন্দোলনের পর বিচার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়েছে। আগে রাজার মুখের কথাই আইন ছিল। রাজার বিচারই চূড়ান্ত ছিল। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দস্তুরমতো আন্দোলন করতে হয়েছে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ বা যাকে বলা হয় সেপারেশন অফ পাওয়ার তা ইতিহাসে এসেছে বড়জোর দু'শ বছর আগে। বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীন হবার যুদ্ধ মূলত বিচার ব্যবস্থাকে মানুষের অধিকারকে রক্ষাকবচ করেছে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ছাড়া স্বাধীনতা পূর্ণ হতে পারে না।

গণতন্ত্রে আশা করা যায় সুবিচার পাওয়া যাবে। আশা করা যায়, ন্যায় ও সত্য বিচারকরাই প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পুলিশ ঠিক কাজ করছে কিনা বা

পার্লামেন্ট ঠিক আইন পাশ করছে কিনা এটা বিচার বিভাগই দেখবে।

কিন্তু বিচার ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে কি মানুষের বা নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা করা যাবে? বিচার ব্যবস্থায় ত্রুটি নানান রকমই হতে পারে। তবে যেটা ভারতবাসীদের ভাবিয়ে তুলেছে যে সহজে কোর্ট কেস শেষ হচ্ছে না। বছরের পর বছর কোর্ট কেস চলছে। প্রত্যেক কোর্টে মামলার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সুপ্রিম কোর্টেই নাকি প্রায় কয়েক লক্ষ মামলা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। প্রত্যেক হাইকোর্টে মামলার পাহাড়। নিচু কোর্টগুলিতেও একই অবস্থা। বঙ্গ ল' কমিশন তৈরি হয়েছে, বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস যখন শপথ গ্রহণ করেন তখন দেশ ও জাতিকে অভয়বাণী শোনান যে, কোর্টের মামলার পাহাড় কমাবেন। প্রতিশ্রুতি পালন হয় না। এক-একেকটা কেস ২০ বছরেও শেষ হয় না।

এবারকার ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ভারতবর্ষের গণতন্ত্র সম্বন্ধে বলেছে ভারতে বিচার ব্যবস্থা এমনই যে সেখানে বহু বছর ধরে কোর্ট কেস চলে। আর তাদের বক্তব্য জাস্টিস ডিলেইড মিন্স জাস্টিস ডিনাইড বিচার পেতে দেরি হওয়া মানে গণতন্ত্রে বিরাট এক ফাটল। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট এই বছরের সংখ্যায় প্রশ্ন তুলেছে ভারতে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য কতটা ভালো।

তারা যে সংখ্যাতত্ত্ব বের করছে তা নিচের সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী-১

(১৯৯৯ সাল)

দেশ	প্রতি হাজার জনসংখ্যায় কত কেস পড়ে আছে	কত লোকের জন্য একটি জাজ বা বিচারক	বিচারক প্রতি ক'টি কেস পড়ে আছে
১) বাংলাদেশ	৫৩	৯৫০০০	৫১৫০
২) ভারতবর্ষ	২৩	৯১০০০	২১৫০
৩) পাকিস্তান	৫	৮৫০০০	৪৫০
৪) নেপাল	৪	৮৫০০০	৩০০

ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট যা জানাচ্ছে তাতে এটা পরিষ্কার, প্রতি বিচারক প্রতি কেসের সংখ্যা ভারতে বাংলাদেশ থেকে কম হলেও সংখ্যাটা বিরাট। আর আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও নেপালে বিচার ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে অনেকটাই চলে। অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় ভারতে এশীয় অনেক দেশের তুলনায় উন্নতি করতে গেলে হয় বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে অথবা যদি বর্তমান কাঠামোই বজায় রাখতে চাই তবে আরও বহু সংখ্যক বিচারক নিযুক্ত করতে হবে। যদি বিচারকের সংখ্যা না বাড়ানো যায় তবে বছরের পর বছর কোর্ট কেস চলবে আর মানুষ বিচার ব্যবস্থার প্রতি

শ্রদ্ধা হারাবে। এখনও বিচার ব্যবস্থার ওপর ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আছে।

বিচার ব্যবস্থায় ত্রুটি বলতে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০০ কতকগুলি তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ করেছে। প্রথমত, স্বাধীনতার পর আইনের যে পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। বহু আইনই ব্রিটিশ আমলের। বহু আইনের প্রয়োজন আর নেই। অর্থাৎ সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দ্রুত উন্নয়নশীল রাজ্যগুলি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেভাবে আইন তৈরি করেছে তা স্বচ্ছ ও আধুনিক। আমরা আইনকে সরল ও সোজা করতে সক্ষম হইনি। এমন সব আইন আছে যে যদিও জানি তার অনেক অর্থ বা কদর্য হতে পারে তবুও তাকে পরিবর্তন করিনি। ফলে মামলার নিষ্পত্তি আর হয় না, কেস চলে ধীরগতিতে।

দ্বিতীয়ত, মামলার কতকগুলি 'স্তর' থাকা উচিত। ধরা যাক, মামলা শিলিগুড়িতে আরম্ভ হল। যে হেরে গেল সে ডিস্ট্রিক্ট বা জেলা কোর্টে গেল। সেখান থেকে সে হাইকোর্টে গেল। আবার হাইকোর্টে অনেক স্তর পার হয়ে সে সুপ্রিম কোর্টে গেল। অর্থাৎ মামলার চার থেকে পাঁচ বা অবস্থা বুঝে আরও স্তর আছে। আর প্রত্যেক জায়গায় মামলা সময়সাপেক্ষ মানে অর্থসাপেক্ষ। আমেরিকাতে বা বর্তমানে ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে এক আন্দোলন চলছে তার প্রধান উদ্দেশ্য যে একটি মামলার নিষ্পত্তির জন্য এত 'স্তর' থাকা দরকার কিনা। তারা কেসের মেরিট বুঝে স্তর কমাবার চেষ্টা করছে। অনেক সময় মামলা নিষ্পত্তি হবার উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিচ্ছে। ইউরোপীয় অনেক দেশে এর উর্ধ্বসীমা মাত্র দু'বছর। অর্থাৎ মামলা আরম্ভ হলে যেনতেনপ্রকারেণ দু'বছরের মধ্যে শেষ করতেই হবে।

এই দুই বছরের সময়সীমা বর্তমানে ডব্লু টি ও গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ডব্লু টি ও-তে কোনো কেস আরম্ভ হলে তার মীমাংসা দু'বছরের মধ্যে করে ফেলতেই হবে। আমাদের দেশে মামলা নিষ্পত্তির উর্ধ্বসীমা বা কত বছর মামলা চলা উচিত তার নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই। এই সীমা নির্ধারণ করতে গেলে অনেক পরিবর্তন দরকার। অর্থাৎ কতবার একটি কেস 'স্থগিত' করার জন্য উকিলরা বিচারকদের কাছে আর্জি জানাতে পারে। 'স্থগিত প্রথা' ব্যতিক্রম হিসেবে অনেকেই চিন্তা করছে, আমাদের দেশে এমন চিন্তা-ভাবনা এখনও হয়নি। আমাদের দেশে মামলার তারিখের উপযুক্ত 'মনিটর' প্রথাও নেই— ফলে এটা হতেই পারে যে আগের করা কেস পরে আসছে পরের কেস আগে আসছে।

তৃতীয়ত, অনেক দেশে ভাবা হচ্ছে যে কেস আদৌ বিচারযোগ্য কিনা। অথবা যাকে অনেক সময় ফ্রিভোলাস বলা হয় সেই রকম কেস অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার পদ্ধতি আছে কিনা। আমেরিকাতে এই প্রথা বহুদিন ধরে চলে আসছে।

বস্তুত আমাদের দেশে যেমন আইনের পরিবর্তন জরুরি তেমন জরুরি অধিক সংখ্যায় বিচারক নিয়োগ। আর বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি এতই জটিল

যে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় কোর্টে উপযুক্ত সংখ্যায় বিচারক নিয়োগ হচ্ছে না। কোর্ট কতদিন খোলা থাকবে এবং কতদিন বন্ধ থাকবে এবং সেটা ব্রিটিশ পদ্ধতিতেই হবে কিনা সেটাও জানা দরকার। বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক কি ধরনের হবে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের জন্যই কেস বহু বছর ঝুলে আছে কিনা তাও স্থির করার পদ্ধতি বের করতে হবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিচার পদ্ধতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। যদি ঢিলেমি এক জায়গায় আরম্ভ হয় তবে সেটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে যাবে। যে দেশগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত দেশ বলে চিহ্নিত করা হয় যেমন নিউজিল্যান্ড বা সিঙ্গাপুর বা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলি, সেখানে পুলিশ ও বিচার পদ্ধতির সর্বসময় আলোচনা পর্যালোচনা সমালোচনা করা হয়।

যদি বিচার পদ্ধতি সহজ ও সরল না হয় আর মামলা বছরের পর বছর চলে তবে ভারতের গণতন্ত্রের ক্ষতি কি কি হতে পারে তার আলোচনা ভারতে না হোক বিশ্বে অনেক জায়গায় হচ্ছে।

আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে বহু রাজনীতিবিদ দুর্নীতিগ্রস্ত। এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, বড় বড় অফিসারও আছেন। আর এও দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা ক্ষমতাশীল তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি নিষ্পত্তি আর হয় না। এটি কার দোষ তা বলা মুশকিল। তবে এই অবস্থা দাঁড়ালে দেখা যাচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা শাস্তি পাচ্ছেন না। ওপরতলায় দুর্নীতি অনেক সময় নিচের তলায় চুঁইয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি হয় সর্বত্রগামী। বিচার পদ্ধতি যত ধীরে চলবে তত বেশি দুর্নীতি বাড়বে। আর দুর্নীতি বাড়া মানে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। ফলে দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলি সফল হবে না।

এ ছাড়া বিচার ব্যবস্থা যত ধীরে চলবে তত জনগণ তাদের হাতে আইন তুলে নেবে। কাগজ খুললেই দেখা যায় যে জনরোষে 'ডাকাত' মারা হয়েছে। ডাকাত বলে যাদের মারা হচ্ছে তারা হয়তো ডাকাত, কিংবা নয় কিন্তু 'জনরোষের' কবল থেকে আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করা মুশকিল। আর জনরোষ সংক্রামক ব্যাধির মতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শহর থেকে শহরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। কত শত লোক যে মারা হচ্ছে তার হিসেব নেই। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে পুলিশ তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে আর বিচার ব্যবস্থার প্রতি লোকের আস্থা কমে যাচ্ছে।

এই 'আস্থা' কমার ব্যাপারটি খুবই উদ্বেগের কারণ আইন হাতে তুলে নিচ্ছে জনগণ। ফলে মানুষের অধিকার বিপন্ন হচ্ছে কিনা তাও চিন্তার বিষয়।

বিচারে দেরি হয় বলে লোকের আস্থা যদি কমে যায় তবে জঙ্গলের আইন আমাদের গণতন্ত্রকে গ্রাস করবে। গণতন্ত্র বিপন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং আইনের শাসন কিভাবে আনা যায় তা নিয়ে সমস্ত বিচার পদ্ধতির পূর্ণ মূল্যায়ন দরকার। দেরি যত হবে তত সমস্যা গভীরতর হবে। জাস্টিস ডিলেইড মিন্‌স জাস্টিস ডিনাইড।

সরকারের ব্যর্থতা মানুষকে ক্রমে সুপ্রিম কোর্টমুখী করে তুলেছে

ভারতবর্ষে বর্তমানে সাধারণ বহু লোক আজকে রাজনীতিবিদদের উপর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক এখন এমনই গভীর যে সমাজবিজ্ঞানীরা বর্তমান গণতন্ত্রের নাম দিচ্ছে 'বিশেষ স্বার্থপরায়ণ লোকদের জন্যই সরকার' বা 'Govt for the Special interest Groups'.

এই বিশেষ স্বার্থপরায়ণ লোকদের সরকার সাধারণ মানুষের অধিকার সম্বন্ধে প্রায়শ সেই বাঁদরের মতো ব্যবহার করে, যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না, কথা বলে না। কোনো অত্যাচারের প্রতিকার রাজনীতিবিদ, ব্যুরোক্রাটরা, পুলিশ বা সরকারি কর্মচারীরা করছেন না। ববং আইনের যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক। ফলে ব্রিটিশ আমলের থার্ড ডিগ্রি প্রথায় পুলিশের 'কনফেসান' আদায়। ফলস এনকাউন্টারে শত শত লোককে বিলোপ করা। ক্রিমিনাল যদি পরাক্রমশালী হয় তার বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করা যায় না। পুলিশ 'উপরতলার' ফোন পেলে সমাজের মাফিয়াদের ছেড়ে দিচ্ছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা 'উপরতলার' নির্দেশ অনুযায়ী ৪০০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বের করে শেয়ার মার্কেটের দালালদের দিচ্ছে বা রাতের গভীর অন্ধকারে যখন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে 'উপরতলার' অনুরোধে ইউরিয়া কেসে ১৩৭ কোটি টাকা সুইস ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করছে। অর্থাৎ সাধারণ লোকদের উপকারের জন্য সরকারি কর্মচারীরা কাজ করছেন না—'উপরতলার' মানে অসাধু কিছু মন্ত্রী, নেতা ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পুলিশই হোক, সেক্রেটারি হোক, সরকারি অফিসারই হোক—সর্বত্রই এক অবস্থা। 'উপরতলার' নির্দেশ অনুযায়ী অন্যায় কাজ করা সরকারি ব্যবস্থা চলতে পারে না। আর সরকারি অফিসাররা যদি 'উপরতলা' দেখিয়ে পাপ কাজ করে সেটাও কোনো সভ্য

সমাজের রাষ্ট্রনীতি হতে পারে না। সরকারি অফিসাররা যার জন্য নিয়োজিত, আর যে ট্যাক্স পেয়ারের টাকায় বেতনভুক, তাদের অবহেলা করাই আজকে 'নিয়মের' মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আজকে সেই 'অদ্ভুত' নিয়মের বিরুদ্ধে সবাই প্রতিকার চায়। প্রতিকার পায় না। ফলে বিচারের বাণী 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

এই অবস্থায় সাধারণ লোক আজকে বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। সাধারণভাবে সুপ্রিম কোর্ট বিচার ব্যবস্থার শেষতম অধ্যায়। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষরা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে 'প্রথমেই', সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে সুবিচারের জন্য। যেখানে মন্ত্রীরা ধৃতরাষ্ট্র, যেখানে সরকারি কর্মচারীরা সাধারণ লোকদের সাধারণ একটা চিঠির উত্তর দেয় না, যেখানে পুলিশ মানে আইনভঙ্গ, সেখানে সাধারণ মানুষদের একমাত্র রক্ষাকর্তা কোর্ট বা জজ সাহেবরা। আর জজ সাহেবরা বর্তমানে নড়েচড়ে বসেছেন। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ থাকলে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যদি একটা পোস্টকার্ড়ও ছেড়ে দেয়, তবে জজ বা বিচারকরা তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই বিচারকদের সক্রিয়তাকে নাম দেওয়া হচ্ছে জুডিসিয়াল একটিভিজম। আর বিচারকরা জনস্বার্থে অনেক মামলাই গ্রহণ করছেন—আর শীঘ্রই তার রায় দিয়ে দিচ্ছেন। আর এর নাম পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা পিল।

ভারতে মানবাধিকার রক্ষায় সুপ্রিম কোর্ট সক্রিয় হয় আশির দশকের গোড়া থেকে। আর 'জনস্বার্থ সম্বন্ধে' বিচারকদের যে একটা কর্তব্য আছে—তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রায় দেন জাস্টিস ভাগবতী ও পরে জাস্টিস আয়ার। অর্থাৎ তাঁদের কল্যাণে আজকে সাধারণ মানুষরা তাদের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে পারছে। অর্থাৎ নির্বাচিত মন্ত্রীরা তাঁদের কাজ করেন না, পুলিশ মানবিক অধিকার সুরক্ষা করেন না, সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করেন না, এই অবস্থায় বিচারকরা একটার পর একটা নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তা পরিষ্কার করা থেকে অন্যায়ভাবে জেলে নিয়ে যাওয়া—সর্বত্রই 'পিল'-এ বিচারকরা একটার পর একটা নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। হাওলা কেস চাপা পড়ে যেত, কিন্তু চারজন ভদ্রলোক পিল-এ জজ সাহেবদের কাছে আবেদন জানাবার পর বিচারকদের নির্দেশে হাওলা সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধান করতে সি বি আই বাধ্য হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা এখন একটি পোস্টকার্ড বা সাদা কাগজের লেখাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন যদি তার মধ্যে অন্যায়ের প্রতিকার চাওয়া হয়। এর আরম্ভ হয় ১৯৮০ সালের গোড়া থেকে। কয়েকটি 'জনস্বার্থ', সুরক্ষা বিষয়ে ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

এক) ১৯৮০ সালে এক অল্পবয়সী মহিলা শ্রীমতী কমলেশ জৈন পাটনা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে একজন বোকা ঠাকুরের মুক্তি চান।

এই বোকা ঠাকুরকে প্রায় পঁচিশ বছর জেলে রাখা হয়েছে। কোনোদিনই তার বিচার হয়নি। কারণ সে গরিব। আর মার্ডার চার্জ প্রমাণিত হলেও তাকে পঁচিশ বছর জেলে কাটাতে হত না আর ঠাকুরের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগই ছিল না। পুলিশের অন্যায় গাফিলতির জন্য তাকে ২৫ বছর জেলে কাটাতে হয়। শ্রীমতী কমলেশ জৈনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তখনই বোকা ঠাকুরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দুই) এই ধরনের 'অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও জেলে থাকা' প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের নিত্য ঘটনা। জজ সাহেবরা এখন বহু জায়গায় নিরপরাধ ব্যক্তিদের মুক্তি দিয়েছেন। প্রথম দিকে এই অসহায় লোকদের যাঁদের বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে কাটাতে হয়েছে তাঁদের অনেককেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আর এই বিষয়ে পুলিশও কিছু করেনি, সরকারি কর্তৃপক্ষও কিছু করেনি। বরং তারা যেখানে সম্ভব বাধা দিয়েছে।

তিন) বন্ডেড শ্রমিক বা শৃঙ্খলায় আবদ্ধ শ্রমিকদের মুক্তির জন্য স্বামী অগ্নিবেশ যে পিল করেছিলেন তা কোর্ট নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অসহায় লোকদের মুক্তি দেন। এর পরেই দক্ষিণ ভারত থেকে আরম্ভ করে উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত বিভিন্ন জায়গায় একটার পর একটা রাজ্যে যেখানে খবর পাওয়া গেছে, কোর্ট এই শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রমিকদের মুক্তি দেন। জনস্বার্থের স্বার্থে।

চার) একটি বিখ্যাত কেসে জজ সাহেবরা আমাদের কনস্টিট্যুশনের ধারা ২১-এর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ায় ভারতীয়দের অধিকারের পরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফ্রান্সিস কোরালির অভিযোগে জজরা রায় দেন 'রাইট টু লাইফ' যে ধারা আমাদের শাসনতন্ত্র বা কনস্টিট্যুশনে আছে তার মানে হওয়া উচিত 'রাইট টু লাইভ উইথ ডিগনিটি'—মর্যাদার সঙ্গে বাঁচাই 'আমাদের অধিকার'। বাঁচাই শুধু নয় 'মর্যাদার' দরকার—এটাই পিল কেসে এক গুরুত্বপূর্ণ রায়।

পাঁচ) এই বিষয়ে বিহারের 'কেয়ার হোম' কেসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি তথাকথিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে অনেক লোককে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল। তাদের অপরাধ সরকারি তথ্য অনুযায়ী 'পাগল' কিন্তু ডাক্তারদের দিয়ে পরীক্ষা করার পর জানা গেছিল—তারা আদৌ পাগল নয়। জজ সাহেবরা রায় দেন এই ধরনের জঘন্য পরিবেশে এত লোক যারা সুস্থ তাদের রাখার অধিকার কোনো সরকারের নেই। এটা মানুষের 'মর্যাদা হানিকর'। অতএব তাদের শুধু যে মুক্তি দিতে হবে তাই নয়, তাদের উপযুক্ত অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করতে হবে। শ্রীমতী বীণা শেঠি ঠিক এইরকম অন্য একটি পিটিশন করেছিলেন। এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় 'পাগল' বলে সরকার বহু লোককে বিনা চিকিৎসায় এবং বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটকিয়ে রেখে দিয়েছে। জজ

সাহেবরা রায় দেন এদের 'মর্যাদা' ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রত্যেককেই অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

ছয়) পঞ্জাবে মিথ্যা মিথ্যা কেসে সহস্র সহস্র নিরপরাধ লোককে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। জজ সাহেবদের হিসাব অনুযায়ী পঞ্জাবে মিথ্যা মামলায় ধরা হয়েছিল প্রায় পঁচিশ হাজার শিখকে। যারা কোনো অবস্থায়ই খালিস্তানের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাছাড়া ফল্‌স এনকাউন্টারে অনেক লোককে মারা হয়। পঞ্জাবের একজন বিখ্যাত লোক যশবন্ত সিংথেরাকে এইভাবে মারা হয়। সুপ্রিম কোর্ট সি বি আইকে নির্দেশ দিয়েছিল সমস্ত মৃত্যুর পেছনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে 'এনকাউন্টারে' মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কম হয়।

সাত) কোনো আইনকে পরোয়া না করে ঘন জনবসতি এলাকায় এমন সব শিল্প দিল্লি ও কলকাতায় গড়ে উঠেছে যাতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অথচ সরকারি পলিউশন বোর্ড কিছুই দেখছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বহু শিল্পকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এখনও হচ্ছে।

আট) পেনশনভোগী যাঁরা তাঁদের পেনশনের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি হার যোগ করা হচ্ছে না। পেনশন যাঁরা পান তাঁদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়েছিল। এই পেনশনভোগীর তরফ থেকে জনস্বার্থ পিটিশন করেন বিখ্যাত এইচ ডি সুরী। সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে সমস্ত পেনশনভোগীদের মূল্যবৃদ্ধির অসুবিধা দূর করে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে উল্লেখ করা হয়েছে এই রায়ের ফলে এত লোক উপকৃত প্রত্যক্ষভাবে হয়েছে, যে পৃথিবীতে অন্য কোনো নীতি পরিবর্তনে তা হয়নি।

নয়) পণপ্রথা সমাজের অভিশাপ। বিয়ের সময় যৌতুক নেওয়া হয় পরেও চাওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যখনই চাওয়া হবে সেটাই পণ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। আর পণ চাওয়া আইনত অপরাধ।

দশ) এখন জনস্বার্থে বহু লোকই সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটি নোংরা পরিষ্কার করে না, সরকার রাস্তা সারায় না, পুলিশ থার্ড ডিগ্রি ছাড়া কিছু বোঝে না, রাজনীতিবিদরা উৎকোচ গ্রহণ করে, জেলগুলির অবস্থা ভয়াবহ, গঙ্গা-যমুনা জল পরিষ্কারের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ দেখানো সত্ত্বেও নদীগুলি নোংরা—এখন সব ব্যাপারেই লোকে একেবারেই সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাচ্ছে।

এর মানে সবাই ধরে নিচ্ছে যে সরকার ও পুলিশ সাধারণ লোকদের স্বার্থ দেখছে না। সরকারের প্রতি ক্রমশ অবিশ্বাস বাড়ছে। ফলে সরকারের যা করা উচিত ছিল তা এখন সুপ্রিম কোর্টকে করতে হচ্ছে। আইন ব্যবস্থা ধ্বংস, শাসন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের স্বার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে, পুলিশের কাছে সুবিচার আশা করা যাচ্ছে না। অতএব একমাত্র অগতির গতি, অনাথের নাথ এখন

বিচারকরা। কিন্তু এটা কি চলতে পারে?

কোর্টে বহু কেস ঝুলছে যেগুলি রুটিন কেস। একটা কেসের ফয়সালা হতে অনেক-অনেক বছর লেগে যাচ্ছে। যত বিচারক থাকা উচিত তা নেই। তার উপর ঘন ঘন 'জনস্বার্থমূলক' মামলা। কিন্তু সাধারণ লোকদের উপায়ও নেই। কোথায় তারা যাবে, কার কাছে অভিযোগ জানাবে। সমস্যা থাকত না যদি সরকারি পদ্ধতি ঠিকমতো চলত—কিন্তু তা চলে না। সরকার যত বিফল হচ্ছে তত আমজনতা বিচারকদের ওপর নির্ভর করছে। এটাই বর্তমান গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

সর্বকালেই সামাজিক পরিবর্তনের সময় কিছু অন্তরায় দেখা দেয়

মহিলাদের জন্য সংসদে এবং বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ কোটা বা সংরক্ষণ করার কথা উঠেছে। কথা ওঠা বলাটা ভুল কারণ কমন মিনিমাম প্রোগ্রামে এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আর প্রতিশ্রুতিটার মধ্যে কোনো 'কিন্তু' বা 'যদি' ছিল না। যারা ক্ষমতায় আছে তেমন ১৩টি পার্টি অন্তত এই বিষয়ে একমত ছিল। এরই জন্য সংসদে বিভিন্ন সাব কমিটি দিয়ে এটা পাস করাও হয়েছে। শ্রীমতী গীতা মুখার্জি এই সাব কমিটির চেয়ার পার্সন ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রায় আরও ত্রিশজন সদস্য বহু আলোচনা করে যখন মহিলা কোটার জন্য আইন এবং সংবিধান পরিবর্তন করার কথা বললেন তখন দেখা গেল একদল প্রচণ্ডভাবে এর বিরোধিতা করছে। বোঝা যাচ্ছে সহজে এই বিল পাস হবে না। আপত্তির ধরনটা বহু ধরনের হলেও অন্তত একটা প্যাটার্ন আছে। ১) একদলের মতে এই সংরক্ষণ করার দরকার নেই। মহিলাদের বাড়ি ঘর রান্নার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ২) দ্বিতীয় দল মনে করে সংরক্ষণ যদি দিতেই হয় তবে মুসলিম ওবিসিদের আগে সংরক্ষণ দিয়ে তবে মহিলাদের কথাটা বিবেচনা করতে হবে। ৩) তৃতীয় দল মনে করে ৩৩ শতাংশ মহিলাদের সংরক্ষণ দেবার আগে তাদের মধ্যেই আবার ওবিসি, মুসলিম, দলিত ইত্যাদি আনুপাতিক হারে সংরক্ষণ করে আইন পরিবর্তন করা জরুরি। যাঁরা আপত্তি জানাচ্ছেন তাঁরা নানারকম কল্পিত বিকল্পের কথা তুলছেন, লোকদের এমন কি প্রধানমন্ত্রীকেও শাসাচ্ছেন, 'রাস্তায় আইন তুলে নেওয়া হবে' বলে বিবৃতি দিচ্ছেন। অথচ এঁরাই যখন কমন মিনিমাম প্রোগ্রামে মহিলাদের কোটার কথা বলেছিলেন তখন কোনো আপত্তি তোলেননি। এখন এই আইনকে 'বন্ধ' বা 'ব্লক' করার জন্য নানা ধরনের নতুন নতুন ইস্যু তুলছেন যা কিছুটা ইচ্ছাকৃত, কিছুটা পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষদের দম্ভের প্রকাশ। যেমন একজন জনতা

দলের বিখ্যাত নেতা মেয়েরা আজকাল চুল কাটে কেন তা নিয়েও কুৎসিত মন্তব্য—কোটার যারা পক্ষপাতী তাদের নামকরণ করা হয়েছে 'বিবি ব্রিগেড'।

এই অবস্থায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন এই বিষয় নিয়ে দেশব্যাপী তর্ক হোক। তর্কটা আগে যে হয়নি তা নয়, তবে তর্ক যে হওয়া উচিত তা নিয়ে দ্বিমত থাকার কথা নয়। মহিলাদের সংরক্ষণের কোনো অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আছে কি? আজকে মেয়েদের কেন সংরক্ষণ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু কিছু অর্থনৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়েছে। কেন ভারতবর্ষে এর প্রয়োজনীয়তা তার সপক্ষে কিছু তথ্য অনেকেই দিয়েছে।

১) সুইডেন আর সাউথ আফ্রিকার মধ্যে কোনো মিল নেই। সুইডেন ইউরোপে আর দক্ষিণ আফ্রিকা পশ্চাৎপদ আফ্রিকায়। কিন্তু একটা বিষয়ে দুই দেশের অদ্ভুত মিল। পার্লামেন্ট সদস্যের মধ্যে বহু সংখ্যক মহিলাদের উপস্থিতি। সুইডেনে ৩৪৯ জন পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে বর্তমানে ১৫৪ জন মহিলা। বলা হচ্ছে এর জন্য সুইডেনে নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা বা সোসাল সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে যা ইউরোপেরও অন্য দেশ কল্পনা করে না। পৃথিবীর মধ্যে সুইডেনই অন্যতম একটি দেশ, যেখানে শিশু জন্মহার-মৃত্যুহার কম, শিক্ষার হার খুবই বেশি প্রায় ১০০ শতাংশ, চাকরির সুরক্ষা, পূর্ণ বেকারি দূরীকরণ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়ে এতই অগ্রসর তার প্রধানতম কারণ মেয়েরা জানে যে এই ধরনের 'র‍্যাডিকেল আইন' না থাকলে মেয়েদের সবচেয়ে সংসার চালানোর অসুবিধা। মেয়েরা দলবদ্ধ ভাবে একটার পর একটা সামাজিক কল্যাণের আইন পাস করে গেছে। আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম থেকেই মেয়েদের ৩৩ শতাংশ কোটা শুধু পার্লামেন্টেই নয়, সব পার্টির পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যেও ৩৩ শতাংশ কোটা আইন চালু করেছে। তার কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় মেয়েরা বর্ণবৈষম্যর বিরুদ্ধে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছে এবং তারা বিশ্বাস করে ৫০ শতাংশ লোকের মুক্তি ব্যতিরেকে (মানে লোকসংখ্যার ৫০ শতাংশই মহিলা) দেশের আসল স্বাধীনতা আসতে পারে না। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা যে ভাবে 'গ্রামীণ উন্নতি রূপায়ণে' এবং তার মনিটরিং-এ সাফল্য লাভ করেছে আফ্রিকার কোনো দেশই তার কাছে আসতে পারে না। অর্থাৎ একটার পর একটা 'র‍্যাডিকেল আইন' পাশ করে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করার চেষ্টা হচ্ছে। আর দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে প্রায় ৭৫০ জন এম পি-র মধ্যে ৩০ জনও মহিলা নেই। নেহরুর আমলে যা ছিল তা ক্রমশ কমছে। অর্থাৎ ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব এই মুষ্টিমেয় মহিলারা করতে পারছেন না। ফলে ভারতে উন্নতি এতই শ্লথ ও কম। উন্নতি হলেও তা বিশেষ বোধগম্য হচ্ছে না।

২) দেশের উন্নতির জন্যই ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার উন্নতি দরকার।

ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত তা হয়নি। উন্নতির সংজ্ঞাও আজকাল আলাদা। গড় উন্নতির কথা আজকাল বিশেষ কেউ বলছে না। নারীর উন্নতিও দেশের উন্নতির মাপকাঠি। ইউনাইটেড নেশনস এখন উন্নতির সংজ্ঞা দিচ্ছে তার অন্য নামকরণ GENDER RELATED DEVELOPMENT INDEX বা সংক্ষেপে GDI-I। এই GDI-যা ১৯৯৬ সালে মাপা হয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবীর ১৩৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৩ নম্বরে। ভারতের বর্তমান স্কোর হচ্ছে ০.৪১০ আর ভারতের নিচে আছে কিছু আরব দেশ ও আফ্রিকার দেশ। আর সেই জায়গায় ইউরোপের অনেক দেশেই এই স্কোর হচ্ছে ০.৯৬ থেকে ০.৮৬-র মধ্যে। ল্যাটিন আমেরিকার অবস্থাও ভারতের থেকে অনেকটাই ভালো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশই ভারত থেকে অনেকটা এগিয়ে যদিও বাংলাদেশ ব্যতিক্রম।

আরও আশ্চর্যের কথা, ভারতবর্ষে ১৬টি রাজ্যে GDI তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যেও অসাধারণ বৈষম্য। কেরলে GDI সবচেয়ে বেশি +০.৫৯৭—চীনের থেকেও বেশি। আর সবচেয়ে কম উত্তরপ্রদেশে আর তার স্কোর ০.৩১০। আর এই নিম্ন স্কোরের কাছাকাছি বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি। কেন এই প্রভেদ? কারণ একটাই। কেরলে স্ত্রী শিক্ষার হার বর্তমানে ৮১ শতাংশের বেশি আর অন্য অনেক রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষার হার ৩০ শতাংশর কাছাকাছি অথবা কম। ভারতবর্ষে সব রাজ্যেই স্ত্রী জাতির আয় রাজ্যের গড় আয়ের ১২ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে। মানে উত্তরপ্রদেশে যদি পুরুষরা ৮০ শতাংশ বা ৯০ শতাংশ আয়ের ফলভোগী তবে এই আয়ের ভাগ স্ত্রী জাতির মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে। অর্থাৎ শিক্ষা আর আয়ের বৈষম্য ভারতবর্ষে প্রকট। আর সর্বত্রই এর জন্য মেয়েদের বিশেষ 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের' কথা উঠেছে। তার ফল হচ্ছে পার্লামেন্টে ৩৩ শতাংশ কোটার দাবি।

৩) পৃথিবীতে সব উন্নত দেশে ১০০ জন পুরুষ প্রতি গড়ে ১০৫ জন স্ত্রীলোক। যে সাহারা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র সেখানেও ১০০ জন পুরুষ প্রতি ১০৬ জন স্ত্রীলোক। পূর্ব এশিয়াতেও প্রতি ১০০ জন পুরুষ প্রতি ১০১ জন স্ত্রীলোক। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি ১০০ জন পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯২ জন। আরও আশ্চর্যের কথা ১৯০১ সালে ভারতে প্রতি ১০০ জন পুরুষ প্রতি ৯৭ জন স্ত্রীলোক ছিল। যাকে আমরা বলি সেক্স রেসিও তা শুধু কমই নয়, ক্রমশ কমছে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে মেয়েদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা, অবহেলা ও অবিচার। যেমন মেয়েদের মৃত্যু হার বা যাকে ইনফেন্ট মরটালিটি রেট বলা হয় তা ছেলেদের থেকে অনেক বেশি। কয়েকটি রাজ্যে অবশ্য বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মৃত্যু হার প্রায় সমান—যেমন কেরল ও অসম। মেয়েদের প্রতি এক ধরনের অবহেলাই এর একমাত্র কারণ। পঞ্জাবে নাকি

সবুজ বিপ্লব। অথচ পঞ্জাবে একটি মেয়ের ৫ বছর আগেই মৃত্যু হবার আশঙ্কা একটি পাঁচ বছরের ছেলের থেকে ১০ শতাংশ বেশি। হরিয়ানায় আরও বেশি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় এই চিত্র ভয়াবহ। আর আরও আশ্চর্যের কথা আয় বাড়লেও মেয়েদের বাঁচবার অধিকার বাড়বে বা যাকে আমরা সারভাইভাল রেট বলি তা হচ্ছে না। অনেক রাজ্যে তথাকথিত আয় বাড়ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি অসম্মান আকাশ সমান।

৪) ভারতে পঞ্চাশ বৎসর স্বাধীনতার পরে ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৫২ জন আমরা যাকে বলি শিক্ষিত—অর্থাৎ কিছু লিখতে ও পড়তে পারে। কিন্তু এর মধ্যেও বৈষম্য। যেমন পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৬৩ শতাংশ আর মেয়েদের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশ। আবার রাজ্যে রাজ্যে ভয়ানক তফাত। যেমন রাজস্থানের স্ত্রী শিক্ষার হার মাত্র ১৭ শতাংশ আর কেরলে ৮১ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে ৭২টি জেলার মধ্যে অন্তত ৪০টি জেলায় স্ত্রীশিক্ষার হার ২০ শতাংশের নিচে।

মেয়েদের যে বয়সে প্রাইমারি স্কুলে যাবার কথা তার মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ যাচ্ছে আর বাকি ৬০ শতাংশ স্কুলেই যায় না। এখানেও বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের তফাত প্রকট। দক্ষিণ ভারতে এই তফাতটাই কম আর উত্তর ভারতে তফাতটা কমছে না বরং বাড়ছে। আরও একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রাইমারি স্কুল থেকে উচ্চতর স্কুলে যাবার সময় ড্রপ-আউট রেট মেয়েদের বড্ড বেশি। কোনো কোনো রাজ্যে তা প্রায় ৩৩ শতাংশ। এটা ঘটছে ৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে ড্রপ-আউট রেট মেয়েদের মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ। বলাবাহুল্য ছেলেদের বেলায় এটা অনেকাংশেই আপেক্ষিকভাবে ভালো—অর্থাৎ ড্রপ-আউট রেট ৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে মেয়েদের ছেলেদের থেকে প্রায় তিনগুণ।

৫) অথচ বলা হচ্ছে যে ভারতের অন্যতম সমস্যা জনসংখ্যার প্রভূত বৃদ্ধি। প্রতি মিনিটে ভারতবর্ষে ২০ জন শিশুর জন্ম হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে মেয়েদের আমরা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিনি। কেরলে জন্মহার ১৭.৫, তামিলনাড়ুতে ১৯.২ শতাংশ আর উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারে তা যথাক্রমে ৩৬.২, ৩৪.৭ এবং ৩২.২ শতাংশ। বলা হচ্ছে মেয়েদের শিক্ষার হার যেখানে বেশি সেইখানে জন্মহারও কম। মেয়েদের অধিকার ও শিক্ষা হার যত বেশি হবে তত আমরা আশা করতে পারি ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান হবে।

মেয়েদের অধিকার কিভাবে বাড়ানো যায় সেটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। কারণ পিকিং কনফারেন্সে একটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার বাংলা অনুবাদ কঠিন ENTITLEMENT অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক অধিকার মেয়েদের যত বাড়বে তত সমাজ ব্যবস্থার গতি বাড়বে।

এই রাজনৈতিক অধিকার বাড়াবার উপায় হিসাবে মেয়েদের জন্য 'কোটা' বা সংরক্ষণের কথা উঠেছে। অন্যান্য দেশে মেয়ে বলেই জন্মিয়েছে বলে ৫০ শতাংশ জনসংখ্যা প্রতি এত অবজ্ঞা অবহেলা নেই তাই সংরক্ষণের কথা ওঠে না অর্থাৎ ইউরোপে অবশ্য এই কোটা নেই। সেখানে মেয়ে-পুরুষ বৈষম্য থাকলেও সামান্য। অর্থাৎ Gender Related Development Index ইউরোপে অনেকটাই বেশি। কিন্তু অনেক দেশে তা কম। ভারতে এতই কম যে এখানে আমাদের মেয়েদের জন্য সংরক্ষণের কথা উঠেছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার। আর এই অধিকারের মাধ্যমে ক্রমশ শিক্ষার অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য একদল এর বিরুদ্ধে সোচ্চার—কারণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে ক্ষমতা বিন্যাসও পরিবর্তন হতে বাধ্য। আর এটাও প্রমাণ করা যায়, মেয়েদের এই অধিকার না দিলে আমাদের জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

সমাজ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন চাইলেই কিছু লোক আপত্তি তুলবেই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার চেয়েছিলেন তখন তাঁকে প্রচুর অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। তবে বিদ্যাসাগর তাতেও ক্ষান্ত হননি। তিনি যে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজকের দিনে তার ফল থেকে ভারত ছাড়াও অনেক দেশই উপকৃত হয়েছিল। আজকে এই সংরক্ষণ উচিত কিংবা অনুচিত এই বিতর্কে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা দরকার। আর মাপকাঠি বুদ্ধদেবই দিয়ে গিয়েছিলেন। পরিবর্তন দরকার যদি সেটা হয় 'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়'। আর এর নামই 'ন্যায় বিচার বা জাস্টিস (Justice)।

২০০১ সালের সেনসাস কিছু ভয় ও ভাবনার তথ্য দেবে

ভারতে সেনসাস ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ হচ্ছে। চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সাল পর্যন্ত। এটাই আমাদের ১৪তম সেনসাস। যেটা প্রথম আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭২ সালে। প্রত্যেক দশ বছর অন্তর এই সেনসাস করা হয়। ভারতের সৌভাগ্য যে এই দেশে অন্তত প্রত্যেক দশ বছরে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ ভয় বা ভীতি উপেক্ষা করেই করা হয়েছে।

সেনসাস, আর স্যাম্পেল (Sample) দু'টি পৃথক। সেনসাসে প্রত্যেক ঘর এবং প্রত্যেক পরিবারের তথ্য নেওয়া হয়—তাই একে বলা হয় Complete Enumeration, স্যাম্পেল দিয়েও আমরা এই তথ্য পেতে পারি—তবে তাতে কিছু নির্বাচিত লোক বা পরিবারের কাছে যাওয়া হয়। বলাই বাহুল্য ১০০ কোটি বা বেশি যেখানে জনসংখ্যা সেইখানে সেনসাস করতে ব্যয় হবে প্রচুর। তাই প্রত্যেক দশ বছরে এই সেনসাস বা জনগণনা। আর পৃথিবীব্যাপী এটাই নিয়ম। দশ বছর অন্তরই আদমশুমারি বা সেনসাস হয়।

ভারতের সৌভাগ্য আমরা ১৮৭২ সাল থেকেই প্রত্যেক দশ বছরেই সেনসাস করতে পেরেছি। ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও চীনে এটা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানে গত বছর একটা সেনসাস করার চেষ্টা হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। তবে সেটা খুব সাফল্য লাভ করেনি। তার অন্যতম প্রধান কারণ সিন্ধুপ্রদেশে হয়তো সিন্ধিভাষী থেকে মুজাহিদদের অথবা ভারত থেকে আগত হিন্দি বা উর্দুভাষীদের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছে। তাই যদি হয় তবে সিন্ধুপ্রদেশে জনসংখ্যার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে এটাকে বলা হচ্ছে Population Atom Bomb—অতএব পাকিস্তানে জনগণনা করবার চেষ্টা হয়েছে—আবার বন্ধ হয়েছে। আবার চেষ্টা আবার বন্ধ। চীনদেশে অবশ্য গত দুই বছর আগে বহুদিন বাদে জনগণনা করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। তবে যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে চীনে One Family one Child—নীতি সাফল্য লাভ করেনি। বহু পরিবারেই শিশু বা সন্তানের সংখ্যা একাধিক। তা ছাড়া আরও

জানা যাচ্ছে চীন দেশে রাজ্যে-রাজ্যে উন্নতির হার ভয়ানকভাবে আলাদা। গুটি কয়েক রাজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে—কিছু রাজ্য পশ্চাৎপদ।

ভারতের এইবার যে সেনসাস নেওয়া হচ্ছে তা বহুলাংশে আগেকার সেনসাস থেকে আলাদা। এইবার সবশুদ্ধ ২৩টি বা তার কম বেশি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে। ২৩টি প্রশ্ন কেন নেওয়া হবে তার অর্থ বোঝা দরকার। সেনসাস মানে ভারতবর্ষে শুধু জনগণনাই নয়—আর্থ-সামাজিক ছবিটাও আমরা চাচ্ছি। অর্থাৎ জনগণনা, সেক্স, বয়েস, আয় ছাড়াও আমাদের এইবারকার সেনসাসে কতকগুলি 'সম্পর্ক' বের করতে চায়। 'সম্পর্ক'র ইংরেজি ধরা হোক 'কো-রিলেশন (Co-relation)।

উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হতে পারে। যেমন ধরা যাক জমির আয়তন। লোক সংখ্যা যদি বাড়ে তবে জমির আয়তন বা ল্যান্ড হোল্ডিং কেমন হচ্ছে। এটাও হতে পারে যে জনসংখ্যা যত বাড়ছে কম লোক বেশি জমির মালিক হচ্ছে। আবার এটাও হতে পারে জনসংখ্যা যত বাড়ছে তত জমির আয়তন কমছে। যারা এক পুরুষ আগে বহু জমির মালিক ছিল এখন পরের পুরুষে তারা হয় প্রান্তিক চাষী অথবা জমিহীন কৃষক। আবার এই জমি কি হস্তান্তর হয়েছে? যারা তফসিলী তাদের কি জমি উচ্চবর্ণ লোকদের কাছে যাচ্ছে? আবার এটা কি সত্যি যে কৃষিতে এক আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যারা গ্রামে শিক্ষায় উন্নত তারাই বেশি ভালো কৃষিকাজ করছে এবং তারাই বা শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের হাত থেকে জমি নিচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে জমির মালিকদের 'সম্পর্ক' কি হতে পারে তাও এই সেনসাসে জানার চেষ্টা হচ্ছে। বলা বাহুল্য এক অঞ্চলে যা হয়েছে অন্য অঞ্চলে তা হয়নি। এক অঙ্গরাজ্যে যা হয়েছে অন্য রাজ্যে তা হচ্ছে না। কেন এই পার্থক্য? সেনসাস এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে। আগের সেনসাসে এটা করার চেষ্টা অন্তত হয়নি।

দ্বিতীয় উদাহরণ দেওয়া যাক। সবাই জানে যে আমাদের দেশে নগরায়ন বা যাকে বলা হয় আরবানাইজেশন (Urbanisation) অতি দ্রুত হারে বাড়ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ গ্রাম থেকে দলে দলে লোক শহরে আসছে। তাতে বস্তির আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন শহরে কারা ভিড় করছে আর কি আশায়? তাদের বয়েস কি, শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্যতা কি, নারী না পুরুষ, পরিবার শুদ্ধু আসছে না একাই আসছে—এই তথ্য এই সেনসাসে জানবার চেষ্টা হচ্ছে। এ ছাড়া বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব, কিভাবে যাতায়াত করে, কত সময় ব্যয় করে যাতায়াতে, সব তথ্য জানার চেষ্টা হচ্ছে। অর্থাৎ এবারকার সেনসাস অনেকটাই দেশের সামগ্রিক চিত্র পাবার চেষ্টা করছে। এ ছাড়া বিকলাঙ্গ বা অন্ধ বা শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরও একটা ছবি পাবার চেষ্টা হচ্ছে।

কি পাব তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে অর্থনীতিবিদরা নানান ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছেন। কি কি ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে তাও ধারণা থাকা দরকার।

১) **জনসংখ্যা কখন আর বাড়বে না** ঃ ধরা হচ্ছে যদি ফার্টিলিটি রেট (Fertility Rate) ২.১ হয় তবে ভারতে জনসংখ্যা আর বিশেষ বাড়বে না। অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় (Population Stabilisation) কেরল ও তামিলনাড়ু এই TFR-এ বা ফার্টিলেট রেটে পৌঁছিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এই রাজ্যে জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে স্থায়িত্ব পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং কর্নাটকে এই স্থায়িত্ব আসবে ২০০৯ সালে যদি বাংলাদেশ বা অন্য অঞ্চল থেকে মাইগ্রেশন আটকাতে পারি। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এই স্থায়িত্ব আসবে ২০৬০ সালে। অর্থাৎ হিন্দি ভাষী অঞ্চলে বা যাকে বলা হয় বিমারু (BIMARU) রাজ্য সেই রাজ্যগুলিই ভারতের জনসংখ্যার বিস্ফোরণের প্রধান কারণ। অর্থাৎ হিন্দিভাষী অঞ্চলে 'বিশেষ' ব্যবস্থা না নিলে ভারতের কপালে অশেষ দুর্গতি আছে।

২) **জনসংখ্যার বয়েস ক্রমাগত পরিবর্তন হবে** : এবারকার সেনসাসে আশ্চর্য একটা তথ্য পাব। পৃথিবীব্যাপী শিশুর সংখ্যা শতকরা হিসেবে কমবে আর বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়বে। যেমন পৃথিবীব্যাপী ১৫ বছরের নিচে শিশু ও কিশোরের সংখ্যা ১৯৯৫ সালে জনসংখ্যার ৩১.৩ শতাংশ, ২০৫০ সালে তা হবে জনসংখ্যার ১৭.৫ শতাংশ। ১৫ বছরের নিচে শিশু ও কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা শতাংশ হারে কমবে তার কারণ যত শিশুর বিস্তার হবে তত পরিবারে জন্মহার কমবে এবং শিশুদের সংখ্যা কমবে।

এখানে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার শতাংশ হিসেবে শিশুদের সংখ্যা কম হলেও অ্যাবসলিউট (Absolute) সংখ্যাটা ২০০১ সালে ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ ২০ কোটি শিশু-কিশোরের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

শিশু বা যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে শতাংশ হিসেবে কমলেও বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে। আগেকার সেনসাসের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের (বা যারা ৬০ বছরের উপর) তাদের সংখ্যা সামগ্রিক জনসংখ্যার ৩ থেকে ৫ শতাংশ। এই সেনসাসে আশা করা হচ্ছে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা হবে ৭.৬ শতাংশ বা ৮ শতাংশের কাছাকাছি। ২০৫০ সালে এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা সামগ্রিক জনসংখ্যার হবে ২১.৩ শতাংশ। অর্থাৎ অ্যাবসলিউট সংখ্যা হিসেবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা ৫ থেকে ৬ কোটি বর্তমানে। এটা ২০০১ সালে হবে ৮ কোটি থেকে ১০ কোটি।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়বে কারণ বর্তমান মানুষের আয়ু ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্বন্ধে কোনো জাতীয় নীতি নেই। সোসাল সিকিউরিটি অপর্যাপ্ত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বিশেষত বিধবাদের সম্বন্ধে নতুন তথ্য আমরা পাব। আশ্চর্য কথা ১৯৯১ সালের সেনসাসে দেখা যায় বিধবাদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি—সমগ্র ভারতের ৬৫ শতাংশ বিধবা পশ্চিমবঙ্গে। সবচেয়ে বেশি বিধবা বাঁকুড়া জেলায়। এইবার (২০০১)

হয়তো নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।

৩) **বেকারি বৃদ্ধি পাবে** : ১৫ থেকে ৫১ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা ২০০১ সালে আশা করা হচ্ছে ৬১৪ মিলিয়ন। অর্থাৎ ৬০ কোটির বেশি লোকদের চাকরি দিতে হবে। অথবা স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে ব্যবহৃত করতে হবে। ২০০১ সালে এদের সংখ্যা ৬১৪ মিলিয়ন। ২০৫০ সালে তা হবে ১০৯০ মিলিয়ন বা এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটির ওপর। অর্থাৎ শিল্প যদি অনুপাত হারে না বাড়ে বেকারি ক্রমশ বাড়বে।

এইবার সেনসাস অনেক নতুন তথ্য দেবে। তবে সবাই আশা বা দুরাশা করছে যে তথ্য পাব তা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। তবুও সংখ্যা এবং তথ্য জানলে কিছু করা সম্ভব হবে। এইবার স্পষ্ট হবে জনসংখ্যার 'বয়েস'-এর গুণগত পরিবর্তন। চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা যত বাড়বে তত দেশে আসবে অস্থিরতা।

২০০১ সালের সেনসাস ও ভারতবর্ষে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে গুণগত বিভাজন

২০০১ সালের সেনসাসের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এখনও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়নি। পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেতে গেলে আরও কয়েকমাস বা বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবুও প্রাথমিক রিপোর্টে যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এক বিভাজন ঘটে যাচ্ছে। ইংরেজিতে এর নামকরণ করা হচ্ছে "Great Divide"—অর্থাৎ দক্ষিণী রাজ্যগুলি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আর উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই পিছিয়ে যাচ্ছে। উত্তর ভারতে অবশ্য ব্যতিক্রম আছে যেমন হিমাচলপ্রদেশ—তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায় দক্ষিণী রাজ্যগুলি অগ্রসর আর উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি অনগ্রসর। সবচেয়ে অনগ্রসর আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য—বিহার।

প্রাথমিক রিপোর্টে জানা যাচ্ছে যে, ভারতের জনসংখ্যা ১০২ কোটি পার হয়ে গেছে। পৃথিবীতে জনসংখ্যার দিক থেকে আমাদের স্থান বর্তমানে দ্বিতীয়। চীনের পরেই ভারতবর্ষ। তবে চীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যতখানি সাফল্য লাভ করেছে ভারতবর্ষ করেনি। বিশেষত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি। উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী কয়েকটি রাজ্য অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এই চারটি রাজ্যই ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে প্রয় ৪০ শতাংশ আর বাকি ২৪টি রাজ্য বৃদ্ধি করছে ৬০ শতাংশ। ২০০১ সালের সেনসাসে বোঝা যাচ্ছে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে হিন্দি গো-বলয়ে অবস্থিত রাজ্যগুলির জন্য—যাকে বলা হয় কাউ বেল্ট (Cow belt)।

১৯৯১ সালে শেষ সেনসাস হয়েছিল। আর পরের সেনসাস ২০০১ সালে। এই দশ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা বেড়েছে ১৮১ মিলিয়ন বা ১৮ কোটির বেশি। ব্রাজিল ভারতের থেকে অন্তত চারগুণ বড়। ব্রাজিল পৃথিবীর জনসংখ্যা অনুযায়ী বর্তমানে পঞ্চম স্থানে—চীন, ভারত, আমেরিকা, রাশিয়া,

আর তারপরেই ব্রাজিল। বলা হচ্ছে ব্রাজিলে বর্তমানে যা লোকসংখ্যা ভারতবর্ষ ১০ বছরে তাই বাড়াচ্ছে। অন্তত তার কাছাকাছি। অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ভারতের তিন থেকে চারগুণ বেশি। আমরা এক বছরে যা জনসংখ্যা বাড়িয়েছি তা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান। অর্থাৎ এই বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি আতঙ্কের কারণ।

এই বিপুল জনসংখ্যা আতঙ্কের কারণ হলেও ২০০১ সালের সেনসাসে দেখা যাচ্ছে আমাদের জনসংখ্যার গ্রোথ রেট (Growth Rate) ২.৫২ শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়ছে তবে বৃদ্ধির হারটা কম।

যদি বৃদ্ধির হার কম হয় তবে ভারতের জনসংখ্যা বিশেষ আর বাড়বে না ২০৫০ সালের কাছাকাছি। অর্থাৎ আরও পঞ্চাশ বছর ভারতের' লাগবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হতে। চীন দেশে আগামী ২০ বছরেই জনসংখ্যার আয়তন নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ ২০ বছর বাদে বা তার কিছু আগেই আমাদের জনসংখ্যা চীনদেশকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বে অন্যত্র আমরা 'প্রথম' না হতে পারলেও জনসংখ্যায় 'প্রথম' হবই। সালটা ২০২১।

২০০১ সালের প্রাথমিক রিপোর্টে যেমন জানা যাচ্ছে জনসংখ্যা বাড়ছে তবে বৃদ্ধির হারটা কম—তেমনি জানা যাচ্ছে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে প্রতি হাজার পুরুষ প্রতি। যত হাজার পুরুষ প্রতি মেয়েদের সংখ্যা কম হবে তত ধরা যাবে সে আমাদের সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদের উপর নানান ধরনের 'অত্যাচার' বাড়ছে। গত ১৯৯১ সালের সেনসাসে প্রতি ১০০০ পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৯২৭ আর ২০০১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৩৩ অর্থাৎ ছয় পয়েন্ট বেড়েছে।

অবশ্য এতে পুলকিত হবার কিছু নেই। দিল্লি শহরে ১০০০ পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ৮২১, পঞ্জাবে ৮৭৪, চণ্ডীগড়ে ৮২১ অর্থাৎ সমগ্র হিন্দি বলয়ে পার্থক্যটা এতই বেশি যে আমরা ধারণা করতে পারি এই সব রাজ্যেই মেয়ে হত্যা, বধূহত্যা, ভ্রূণহত্যা অবহেলা বা বঞ্চনা বেশি। অথচ আফ্রিকার সাহারার নিচেও স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সামন—বরং স্ত্রীদের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ বর্তমানের ভাষায় বলা যায় আফ্রিকার পশ্চাৎপদ অঞ্চলে মেয়েদের যে 'সম্মান' আমরা দিই, ভারতে সবচেয়ে বেশি ধনী রাজ্য পঞ্জাবে তা দেওয়া হয় না।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে স্ত্রী-পুরুষদের সংখ্যা ভেদাভেদ হয়তো নেই বা খুবই কম। কেরলে ২০০১ সালের সেনসাসে ১০০০ পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০৫৮ অর্থাৎ মেয়েদের সংখ্যা বেশি। আর সমস্ত উন্নত দেশে সে রাশিয়াই হোক বা সুইডেনই হোক এটাই প্যাটার্ন। হয় স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যাটা প্রায় সমান সমান অথবা মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যতিক্রম ভারতবর্ষে।

উত্তর ভারতে বধূহত্যা নিত্য ঘটনা। আমাদের দেশে প্রতি ১০১ মিনিটে পণের বলি হচ্ছে একটি বধূ। ২০০১ সালের সেনসাসে এই জাতীয় লজ্জাই ধরা পড়েছে।

২০০১ সালের সেনসাসের একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে ভারতে শিক্ষার হার বাড়ছে। শিক্ষার হার এখন মাপা হচ্ছে সাত বছরের উপর থেকে। আগেকার ১৯৫৮-৮১ সালের সেনসাসে শিক্ষার হার মাপার জন্য কোনো বয়স ধরা হত না। ১৯৯১ সাল আর ২০০১ সালে শিক্ষার হারটা মাপা হয় একটা বয়সের ওপর থেকে অর্থাৎ ৭ বছরের উপরে। অনেক উন্নত দেশে এই বয়সের মাপকাঠি নিচের দিকে আবার কিছু দেশে আরও উপরে। ভারতবর্ষে বর্তমান সেনসাস অনুযায়ী পুরুষদের শিক্ষার হার ৭৫.৮৫ শতাংশ আর মেয়েদের ৫৪.১৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার হার ভারতে বর্তমানে (স্ত্রী-পুরুষ ধরে) প্রায় ৬৩.৩৮ শতাংশ।

শিক্ষার হারের দিক থেকে রাজ্যে রাজ্যে প্রভেদ বিস্তর। ২০০১ সালে কেরল এখনও প্রথমে ৯০.৯২ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে মিজোরাম ৮৮.৪৯ শতাংশ, লাক্ষাদ্বীপ তৃতীয় ৮৭.৩২ শতাংশ। শিক্ষার হারে সবচেয়ে পেছিয়ে বিহার মাত্র ৪৭.৫৩ শতাংশ। পঃ বঙ্গের স্থান ১৮তম।

অর্থাৎ রাজ্যগুলিকে শিক্ষার হারের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর রাজ্য যাদের শিক্ষার হার ৭৫ শতাংশর বেশি। তার মধ্যে প্রায় সব দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি আর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের যেমন মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর রাজ্যগুলি আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যগুলি হচ্ছে ভারতের গড় শিক্ষার হার থেকে বেশি কিন্তু ৭৫ শতাংশের কম। এর মধ্যে আমাদের পঃ বঙ্গ আছে। মহারাষ্ট্র এই শ্রেণীর রাজ্য।

আর তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য যার শিক্ষার হার ভারতের গড় থেকে কম তার মধ্যে অধিকাংশ হিন্দি রাজ্য ও উড়িষ্যা। বিহারে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম। আর জনসংখ্যার চাপও বিহারে ভয়ানক বেশি। বিহারে ২০০১ সালের সেনসাস অনুযায়ী ৮ শতাংশ ভারতের জনসংখ্যার। আর জনসংখ্যা কেন বাড়ে তার উত্তরটা সবাই একই দিচ্ছে যে যেখানে শিক্ষার হার কম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেখানেই সবচেয়ে বেশি।

এটা সবারই জানা যে পূর্বতন বিহার যার মধ্যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চল ছিল রিসোর্স বা প্রাকৃতিক সম্পদে সবচেয়ে ধনী, উড়িষ্যাতেও তাই। অথচ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিহারের শিক্ষার হার কম, উন্নতির হার কম এবং জনসংখ্যার চাপও বেশি। বিহার একটি ক্লাসিক কেস Poverty Amongst Plenty.

২০০১ সালের সেনসাস অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশে এখনও সবচেয়ে বেশি

জনসংখ্যা। উত্তরপ্রদেশে ভারতের জনসংখ্যার ১৬.১৭ শতাংশ। তারপরে স্থান মহারাষ্ট্রের ৯.৪২ শতাংশ তারপরে বিহারের ৮ শতাংশ। তারপরেই পঃ বঙ্গের স্থান ৭.৮ শতাংশ।

কেরলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম ৯.৪২ শতাংশ, তারপরে তামিলনাড়ু ১১.১৯ শতাংশ, তারপর অন্ধ্র ১৩.৮৬ শতাংশ। আর ফার্টিলিটি রেট সবচেয়ে কমছে অন্ধ্রে। বলা হচ্ছে মেয়েদের শিক্ষার হার সেখানে বেশি হারে বাড়ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং ফার্টিলিটি রেট কমছে।

জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে হিন্দি অঞ্চলে বিশেষত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান অঞ্চলে।

অর্থাৎ ভারতবর্ষ এখন দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগে শিক্ষার হার বেশি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত। এরা মুখ্যত দক্ষিণী রাজ্যগুলি। শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে।

এর মাঝামাঝি আছে পঃ বঙ্গ। সর্ব বিষয়ে মধ্যস্থানে। যদিও জনসংখ্যার ঘনত্বে বা ডেনসিটি অফ পপুলেশনে সবচেয়ে বেশি। ৯০৪ জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে পঃ বঙ্গে লোকসংখ্যা আর তার পরেই বিহার ৮৮০ জন। অর্থাৎ পঃ বঙ্গেও বিপুল জনসংখ্যা। ফলে চাকরির সুযোগ কম আর জমি নিয়ে সবচেয়ে গোলমাল। এই সেনসাস যেন বলছে দুটো ভারতবর্ষ আছে। একটি উন্নত দক্ষিণী রাজ্যগুলি আর অন্যটা অনুন্নত উত্তরের রাজ্যগুলি। একটি "Great Divide" হয়ে যাচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট

ভারতের জনসংখ্যা বিপুল হারে বাড়ছে। এই বৃদ্ধি উন্নতির সহায়ক কিনা তাই নিয়ে আজ বিতর্ক। আফ্রিকার অনেক দেশ আছে যেখানে উন্নতির হার খুবই কম। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে কম। এইসব আফ্রিকান দেশে জন্মহার যেমন বেশি, মৃত্যুহারও বেশি। ফলে জনসংখ্যা খুব বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে আবার ক্রেতার বৃদ্ধি। বাজারের বৃদ্ধি। আফ্রিকার অনেক দেশে বৃদ্ধির হার কম, কারণ ক্রেতার বৃদ্ধির হার কম বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম। অতএব এইসব দেশে উন্নতি খুব বেশি হারে হচ্ছে না।

সাধারণভাবে উল্টোটাই বলা হয়। জনসংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্য বাড়ে। ভারতের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বিপুল জনসংখ্যা। ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতার সময় ভারতের লোকসংখ্যা ছিল কমবেশি ৫০ কোটির মতো। ৫০ বছরে আমাদের জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে চলে গেল আর এইভাবে যদি চলতে থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই চীন দেশকে জনসংখ্যায় ছাড়িয়ে যাবে। ফলে বিপুল জনসংখ্যা আমাদের উন্নতির অন্তরায়। চতুর্দিকে দারিদ্র্য, চাকরি নেই, সুযোগ নেই, অনেকটাই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে।

যারা মনে করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে তাদের বলা হয় 'ম্যালথুসিয়ান' (Malthusian)। ১৭৯৮ সালে ম্যালথাস বলেছিলেন যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সেই হারে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে না। ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এমনকি, যুদ্ধবিগ্রহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হতে পারে। মূলত ম্যালথাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদের জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট বের করেছে। রিপোর্টটি বের হয়েছে এই মাসের জানুয়ারিতে, যদিও রিপোর্টটির নাম দেওয়া হয়েছে 'State of the World population 2002--poverty and possibility : Making Development work for the poor (UNFPA) এই রিপোর্টটি অনেক নতুন

তথ্য ও তত্ত্ব দিয়েছে। যে দুটি তত্ত্ব তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে তা মূলত ১) পৃথিবীব্যাপী দারিদ্র্যর কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই দারিদ্র্য বেশি বাড়ছে—আর দরিদ্র লোকেরা আরও দরিদ্র হচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী বৈষম্যর একটি অন্যতম কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ২) পৃথিবীব্যাপী দারিদ্র্য কমানো যেত যদি প্রতি হাজার স্ত্রীলোকদের প্রজনন ক্ষমতা (Fertility rate) আমরা যদি ৫ জন্মহার কমাতে পারতাম। যদি ১০০০ স্ত্রীলোকদের ৫ জন্মহার কমানো যেত তবে দারিদ্র্য পৃথিবীব্যাপী এক-তৃতীয়াংশ কমানো যেত। দারিদ্র্য দূরীকরণ তখনই সম্ভব যদি আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে পারতাম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি তত্ত্ব ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮০ সালে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৬০ সালে আমরা বিশ্বাস করতাম জন্মহার নিয়ন্ত্রণ না করলে আমাদের দারিদ্র্য কমানো যাবে না। গরিব লোকদের মধ্যেই পরিবারের আয়তন বেশি। তারা অনেকেই মনে করে যত বেশি পরিবারে লোক জন্মাবে তত বেশি শ্রমিক রোজগার করবে। যত বেশি পরিবারের শ্রমিক তত বেশি আয়। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে দরিদ্র দেশেই বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যার পরিবর্তন। কিন্তু পরিবারে লোকসংখ্যা বা শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি হলে পিতা-মাতারা উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেনি। তাদের সঞ্চয় কমে যাবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই অবস্থায় দরকার জন্মহারের নিয়ন্ত্রণ। তারজন্য সরকারি আনুকূল্যে নানান নীতি ও সংস্কার।

১৯৮০ সালে অবশ্য বিতর্কটি অন্যদিকে চলে যায়। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অর্থনীতিবিদরাই মুখ্যত জননীতি তৈরি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য উন্নতি তখনই সম্ভব যখন তিনটি জিনিস ঠিকমতো মিশ্রণ করতে পারি। সবচেয়ে প্রথমে আছে Human Capital বা মানব সম্পদ। দ্বিতীয় স্তরে আছে Technical Change বা প্রযুক্তির উন্নতি। আর তৃতীয় স্তরে আছে Physical Capital বা প্রাকৃতিক বা ভৌত ক্যাপিটাল। যদি মানবকে সম্পদ বলে গ্রহণ করা হয় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল এবং চাপে নানান পরিবর্তন আসতে বাধ্য। পরিবর্তন হবে প্রতিষ্ঠানগত, আইনগত, নীতিগত এবং প্রযুক্তিগত। মানুষের বা জনসংখ্যার চাপে ক্রমশ এই পরিবর্তন আসবে। মানুষকে যদি সম্পদ হিসেবে ভাবি তবে এর গুণগত পরিবর্তন আবশ্যক আর মানুষ ছাড়া কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। জনসংখ্যাই দারিদ্র্যর কারণ নয়, কারণ অন্যত্র। দেশে দুর্নীতি, রাজনীতিবিদদের চরিত্র, দেশের নীতি ও প্রথাই দারিদ্র্যর আসল কারণ। রাজনীতি বা দুষ্টু রাজনীতি যতটা দারিদ্র্যর কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ততটা কারণ নয়। দারিদ্র্যর কারণ অবশ্যই হতে পারে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব। তবে আসল কারণ রাজনীতিতে দুর্নীতি। এই দুর্নীতি থাকার ফলে মানব সম্পদ বিকাশ লাভ করতে পারছে না। দারিদ্র্য থেকেই যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান রিপোর্ট অবশ্য দারিদ্র্যর কারণ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই দায়ী করছে। তবে তাদের বক্তব্য একটু অন্য ধরনের। রাষ্ট্রপুঞ্জ বলতে চাইছে জনসংখ্যার গুণগত পরিবর্তন দারিদ্র্য বাড়াবে বা কমাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই একমাত্র কারণ নয়। জনসংখ্যার নানান পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে বয়সের ভিত্তিতে জনসংখ্যার পরিবর্তন। মা-বাবারা যদি বোঝে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে এবং শিশু মৃত্যুর হার ক্রমশ কমবে তখন দেখা যাবে পরিবারে জন্মহার ক্রমশ কমবে। যত শিশুর সংখ্যা কমবে ততই দেখা যাবে কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যত পরিবার ছোট হবে তত বেশি স্ত্রী শ্রমিকরা বাজারে কাজের জন্য আসবে। বয়সের পরিবর্তন জনসংখ্যায় আসার সঙ্গে শ্রমিক বাজারেও পরিবর্তন আসবে। যত স্ত্রীলোকদের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে তত স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মহারের পরিবর্তন হবে।

যদি বাজার বৃদ্ধি পায় তবে শ্রমিকরা উৎপাদন বেশি বাড়াবে বা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এটাকে রাষ্ট্রপুঞ্জ বলছে Demographic Dividend বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির লাভ। যেহেতু উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে সেইহেতু সঞ্চয় বাড়বে, আর বাড়বে বিনিয়োগ। যেসব পরিবারে শিশুর সংখ্যা ক্রমশ কমবে সেইসব পরিবারে শিক্ষার উপর বিনিয়োগ ক্রমশ বাড়বে। যত শিক্ষার প্রসার হবে তত মানব সম্পদের উন্নতি হবে।

জনসংখ্যার গুণগত পরিবর্তন ক্রমশ হবে। শিশুদের থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাবে। আগে মা-বাবাদের ছেলে-মেয়েদের বেশি নজর দিতে হত। এখন নজর দিতে হবে বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি। অর্থাৎ Dependency Ratio-র গুণগত পরিবর্তন ক্রমশ হবে। শিশুদের সংখ্যা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শিশুদের জন্মহার যত কমবে তত বেশি আয়ের বন্টন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে।

Demographic Dividend কল্যাণে আজ (রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত উন্নতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯৫০ সালে (গড়ে) ছ'টি সন্তান ছিল পরিবার পিছু। ২০০০ সালে তা কমে দাঁড়ায় দুটিতে। তার ফলে কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশ এবং যা লক্ষণীয় 'নির্ভরশীল' লোকের সংখ্যা থেকে কার্যক্ষম (Working Population) লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় চারগুণ। অর্থাৎ কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে নির্ভরশীল লোকের থেকে অনেক বেশি হারে। এটাকে মূলত Demographic Dividend বলছে রাষ্ট্রপুঞ্জ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে অনেক সময় কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি। অর্থাৎ বয়সের পরিবর্তন। ল্যাটিন আমেরিকায় জনসংখ্যার বয়সের পরিবর্তন ঠিক এইভাবে হয়নি। ফলে ১৯৭৫-১৯৯৫ সালে মাথা পিছু আয় ল্যাটিন

আমেরিকায় বেড়েছে মাত্র ০.৭৩ শতাংশ হারে আর পূর্ব এশিয়ায় বেড়েছে ৬.৮ শতাংশ হারে। জনসংখ্যার বয়স ঠিক কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করছে দারিদ্র্য দূরীকরণ কত সহজে করা যাবে।

তিনটি মডেল ভাবা যায়। নির্ভরশীল (Dependent) জনসংখ্যার হার কার্যক্ষম (Working Age Population) জনসংখ্যা থেকে হয় বেশি অথবা কম অথবা সমান সমান। যদি নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা থেকে কম হয় তবে দারিদ্র্য দূরীকরণ সহজতর হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকায় ঠিক তা হয়নি। ল্যাটিন আমেরিকায় 'নির্ভরশীল' লোকের সংখ্যা কার্যক্ষম লোক থেকে অনেকটাই বেশি অতএব উন্নতির হারও কম। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধিই দারিদ্র্যর একমাত্র কারণ নয়। Dependency Ratio অর্থাৎ কার্যক্ষম এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যাটা কি ধরনের তা জানা দরকার।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই দেশটিতে এখনও নির্ভরশীল লোকের বৃদ্ধির হার কার্যক্ষম লোকের থেকে বেশি। তার অন্যতম কারণ কয়েকটি রাজ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি সাফল্য লাভ করেনি। করেনি তার কারণ দুর্নীতি, শিক্ষা বিস্তারের হার কম এবং স্ত্রী স্বাধীনতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি। অর্থাৎ Demographic Dividend পেতে গেলে ভারতকে এখনও ২০-২৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণে আরও ২০-২৫ বছর লাগবে। ভারতের জননীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ থেকেই পিছিয়ে পড়া। জননীতির অসাফল্য ভারতের দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়াচ্ছে।

ভারতের জনসংখ্যার গঠনের ক্রম বিবর্তন : বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সমস্যা ক্রমশ বাড়বে

ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবার পর জনসংখ্যা সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক। সব বিতর্ক বিশদভাবে বলা সম্ভব নয় তবে কয়েকটি বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা যাক।

প্রথম বিতর্ক ভারতের এই বিপুল জনসংখ্যা আশীর্বাদ না অভিশাপ। সবাই ধরেই নিয়েছে এত জনসংখ্যা আমাদের বিরাট এক অভিশাপ—দেশে চাকরির অভাব, দারিদ্র্য, প্রচুর বস্তির বিস্ফোরণ ইত্যাদি। সাধারণভাবে এই অভিশাপের কথাই বলা হয়। কিন্তু অন্য একদল বলছে যে মানুষই আসল সম্পদ—আর মানুষকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারছি না বলে জনসংখ্যাকে অভিশাপ বলা হচ্ছে। আফ্রিকার কঙ্গো, সুদান ইত্যাদি বহু দেশই আছে আয়তনে বিশাল-বিরাট। যেখানে হটু তুৎসীরা থাকে তার আয়তন বর্তমান আমেরিকার সমান বা কাছাকাছি। এদের দেশে জনসংখ্যা যৎসামান্য অথচ সম্পদ প্রচুর। তার মানে জনসংখ্যা কম থাকলেই সহজে উন্নতি হয় এমন ধারণা ভিত্তিহীন। আবার বেলজিয়াম বা জাপানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বা যাকে Density of population বলা হয়, তা ভারত থেকে অনেকটাই বেশি। অথচ জাপান একটা উন্নত দেশ। বর্তমানে তর্কটা গভীরতর হয়েছে যখন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ভারতের আসল সমস্যা কি জনবিস্ফোরণ? অমর্ত্য সেন সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন বা যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল—আমাদের সরকারি বিফলতা ঢাকতে গিয়ে জনসংখ্যার আধিক্যর ওপর জোর দিচ্ছি যাতে 'আসল' সমস্যা সমাধান না করার কিছু ছুতো পাওয়া যায়। আসল সমস্যা শিক্ষা, বিনিয়োগ, স্ত্রী জাতির অবস্থার উন্নয়ন, আর সব বিষয়ে বিফলতা ঢাকতে গিয়ে আমরা জনবিস্ফোরণটাকেই আলাদা করে সব সমস্যার মূল বলে লোকদের বোঝাচ্ছি। অমর্ত্য সেনের উক্তির পর বিশাল এই তর্ক আরম্ভ হয়েছে—

জনসংখ্যা এই দ্রুত হারে বাড়ছে কেন? আর সর্বত্রই কি এক হারে তা বাড়ছে?

দ্বিতীয় বিতর্ক হচ্ছে যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হারে বাড়ছে। আর তফাতটা এমনই প্রকট যে আমরা তার কারণ সম্বন্ধে জানবার আদৌ চেষ্টা করছি না। আবার জনসংখ্যা বিস্ফোরণের অন্যতম কারণ যে কয়েকটি রাজ্য সম্পূর্ণ পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে রাজনীতিতে বিশেষত ভারতের ফেডারেল সিস্টেমে তারাই ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যে রাজ্যে কি বিরাট প্রভেদ আর তার কমাবার কোনো চেষ্টা না থাকাটাই যে কিছু নেতাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমন কথা অনেকেই বলছে। গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাতে 'বজায়' থাকে তার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের আদি ব্যবস্থাকে কিছু রাজ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। আদি ব্যবস্থা বলতে শিক্ষার প্রসার—বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, ভূমি সংস্কার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলি সফল রূপায়ণ। যেখানে এগুলি বিফল হয়েছে বা করবার চেষ্টা হয়নি সেখানে জনসংখ্যা বিপুল হারে বাড়ছে। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে ডেমোক্রেসি বা মাবোক্রেসির মধ্যে পার্থক্য উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্ষমতার লিপ্সার আবার বলা হচ্ছে যেখানে দুর্নীতি যত বেশি সেখানে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলি বিফল। ব্যাপারটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। প্ল্যানিং কমিশন গত মঙ্গলবার (৪ জুলাই) জানাচ্ছে যে পাঁচটি রাজ্য—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ওড়িশায় ভারতের ৪৪ শতাংশ জনসংখ্যা আছে আর ২০১৬ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ এই পাঁচটি রাজ্যে থাকবে। যেখানে এই পাঁচটি রাজ্যে ভারতের ৫৫ শতাংশ জনসংখ্যা সেখানে ২০১৬ সালে দক্ষিণী পাঁচটি রাজ্যে অর্থাৎ অন্ধ্র, কর্নাটক, তামিলনাড়ু মাত্র ১৪ শতাংশ জনসংখ্যা বাড়াবে। কেরলে জনসংখ্যা আমাদের ভাষায় স্থিতিশীল যা ইউরোপের অনেক দেশই এখন পারেনি। আমরা যাকে জন্মহার বলি অর্থাৎ প্রতি হাজারে কত জনসংখ্যা বাড়ছে তা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানে। প্রত্যেক রাজ্যেই পরিবারের সংখ্যা সীমিত হবে মোটামুটি বাবা মা আর দুই ছেলেমেয়ে। কিন্তু ব্যতিক্রম হবে এই চারটি 'বিমারু' রাজ্যে যেখানে পরিবারের সংখ্যা পাঁচের বেশি সব সময় থাকবে। অর্থাৎ জনসংখ্যার ভিত্তিতে যদি গণতন্ত্র পরিচালিত হয়, আর যত বেশি জনসংখ্যা তত বেশি পার্লামেন্টের মেম্বার ইত্যাদি তা হলে দেখা যাচ্ছে আমাদের ফেডারেল ব্যবস্থার ক্ষমতা থাকবে যাদের হাতে বা সেই সব রাজ্যে যারা অনুন্নত। যত অনুন্নত তত নাম্বারের খেলায় ক্ষমতার অধীশ্বর। প্রশ্ন থেকে যায় যে এটা কি ইচ্ছাকৃত? না ঘটনার চক্রে অনুন্নত থাকলেই গণতন্ত্রে সুবিধা। ভোটের বাজার যেখানে 'দখল করলে' অশেষ ক্ষমতা পাওয়া যায় সেখানে অনুন্নত বা অনগ্রসর হওয়া কি লাভজনক? অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলেছেন অনগ্রসর থাকলেই কি সুবিধা?

১৮৭১ সালে প্রথম সেনসাস হয়। সেখানে দেখানো যায় সংযুক্ত বঙ্গদেশে (অধুনা বাংলাদেশে আর পঃ বঙ্গে) হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে বেশি। কিন্তু ১৯৪১ সালের সেনসাসে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ ১৮৭১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার যে পরিবর্তন ধর্মগতভাবে হয়েছে তার ফলশ্রুতি বাংলা বিভাগ। নাম্বার গেমে যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ ঠিক হয় সেখানে নাম্বার বাড়ানোই রাজনৈতিকভাবে ফলপ্রসু।

তৃতীয় একটি বিতর্ক হচ্ছে। সেটা হচ্ছে আমরা জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে খুবই চিন্তান্বিত। কিন্তু জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ কম্পোজিশন বা বাহ্যিক ধরনটা কি ধরনের হচ্ছে? প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় জনসংখ্যার আকার পিরামিডের মতো। নিচে থাকে অসংখ্য শিশু, কিশোর, তারপরে থাকে যুবক-যুবতী আর তারপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। বেশি শিশু আর তার থেকে কম যুবক-যুবতী আর সবচেয়ে কম বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। ভবিষ্যতে এই পিরামিডই থাকবে তবে পিরামিডের গঠন পরিবর্তন হবে। বর্তমানে ১৪ বছরের নিচে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৩৮ শতাংশ। ২০৫১ সালে তা হবে জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ। ৬৫ বছরের উপরে বর্তমানে জনসংখ্যা ৫ শতাংশ। ২০৫১ সালে তা হয়ে দাঁড়াবে ১৫ শতাংশ। ১৫ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা বর্তমানে ৫৭ শতাংশ। তা বেড়ে ২০৫১ সালে হবে প্রায় ৬৩ শতাংশ। সংখ্যায় বলা যাক, বর্তমানে ভারতবর্ষে ৬৫ বছরের উপর লোকসংখ্যা ৭৫ মিলিয়ন। কিন্তু ২০২৫ সালে তা হবে ১৭৭ মিলিয়ন। আর ২০৫১ সালে তা হবে ২৪৩ মিলিয়ন বা ২৪ কোটির বেশি।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পাবে। তার অন্যতম কারণ ভারতবর্ষে আয়ু ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হবে। আমরা ইংরেজিতে বলি Life Expectancy বা বাংলায় হওয়া উচিত প্রত্যাশিত আয়ু। নিচে সারণী একটি দেওয়া হল, তাতে বোঝা যাবে, ভারতের জনগণের আয়ু কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-১

প্রত্যাশত আয়ু ১৮৭১ থেকে ১৯৯৪

সময়	পুরুষ	নারী
১৮৭১-৮১	২৩.৭	২৫.৬
১৮৯০-১৯০১	২৩.৬	২৪.০
১৯২৭-১৯৩১	২৬.৯	২৬.৮
১৯৩১-৪১	৩২.১	৩১.৪
১৯৪১-৫১	৩২.৪	৬১.৭
১৯৭১-৭৫	৫০.৫	৪৯.০
১৯৮১-৮৫	৫৫.৪	৫৫.৭
১৯৮৬-৯০	৫৭.৭	৫৮.৬
১৯৯৩-৯৪	৬০.৬	৬২.০

সারণী-১ থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ভারতে ১২০ বছরে পুরুষ ও মহিলা বা নারীর আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই একশ কুড়ি বছরে জীবনকাল বা আয়ু বেড়েছে প্রায় আড়াইগুণ। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়, আগে পুরুষদের আয়ু মোটামুটিভাবে নারীদের তুলনায় বেশি ছিল। পৃথিবীতে সর্বত্রই প্রায় নারীর আয়ু পুরুষদের তুলনায় বেশি। পৃথিবীর গড় হচ্ছে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অন্তত তিন বছর বেশি বাঁচে। বলা হয় এটা বাওলজিকাল।

ডাক্তারি-শাস্ত্রের অগাধ উন্নতি হয়েছে। টিকাদান এখন সময়ের অপরিহার্য অঙ্গ। হাসপাতালের সংখ্যাও বেড়েছে। ফলে আয়ু বেড়েছে। তবুও রাজ্যে রাজ্যে প্রভেদ আছে। যেমন অসম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে পুরুষ ও নারীর আয়ু ১৯৮৭-৯১ সালের ভারতীয় গড় থেকে নিচে। যেমন ১৯৮৭-৯১ সালে ভারতের পুরুষদের গড় আয়ু ছিল ৫৮.১ আর নারীদের ৫৮.৬ সেখানে উত্তরপ্রদেশের পুরুষদের গড় আয়ু ৫৫.৪ আর মেয়েদের ৫৩.৯ আবার একই সময়ে কেরলে পুরুষদের গড় আয়ু ৬৮ আর নারীদের ৭৩-র কাছাকাছি।

আয়ু বৃদ্ধির ফলে যে সমস্যা ভারতে নতুন করে আসছে তা হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। ভারতে এখন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের দেখা যাবে, যাদের বয়েস ৬৫ বছরের ওপর। এখন এদের দেখাশোনার দায়িত্ব কার? পৃথিবীব্যাপী এই সমস্যা। চীন দেশে এই সমস্যা একটু অদ্ভুত ধরনের। চীনের সরকারি নীতি অনুযায়ী একটি মাত্র ছেলে বা মেয়ে হতে হবে। ধরা গেল ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হল যার বাবা মারা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হলেন। এখন এই দুই জোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অর্থাৎ ছেলের মা-বাবা আর মেয়ের মা-বাবা তারা কি একই সঙ্গে একই বাড়িতে থাকবে? চীন দেশে এই সমস্যা এখন এতই প্রবল যে এর থেকে অন্য কোনো উপায় বের করা যায় কিনা তা নিয়ে অহরহ লেখালেখি চলছে।

সুইডেন, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াতে বৃদ্ধাদের স্বাবলম্বী করার জন্য সোসাল সিকিউরিটি সিস্টেমের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এদের ভার সরকারের উপর ন্যস্ত, অন্তত কিছুটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সোসাল সিকিউরিটি সিস্টেমে বাজেটের প্রায় ৩৩ শতাংশ বেরিয়ে যাচ্ছে। আরও অর্থের প্রয়োজন। বৃদ্ধাবাস বা ওই জাতীয় আবাসনে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের নিয়ে সমস্যা ভারতে নেই তা সত্য নয়। যতদিন আমাদের দেশের জয়েন্ট ফ্যামিলি প্রথা ছিল, ততদিন অন্তত এদের মাথার ওপর ছাদ ছিল আর অসুখে-বিসুখে দেখাশোনা হয়তো হত। কিন্তু কালের প্রবাহে ভারতে যৌথ পরিবার ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। আরও কমবে। বর্তমান যুগে 'একক' পরিবারই অন্তত শহরে চালু, গ্রামে যদিও যৌথ পরিবার কিছুটা আছে। এই একক পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভরণ-পোষণ দেখাশোনার দায়িত্ব ক্রমশ কমবে।

যেমন ইউরোপে বা আমেরিকায় হয়েছে।

ইউরোপ বা আমেরিকায় এখন এদের নিয়ে কি ধরনের সোসাল সিকিউরিটি করা যায় তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা। ভারতে এই আলোচনা এখনও শুরুই হয়নি। সোসাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা যা আছে তা না থাকারই শামিল। অর্থাৎ নব শতাব্দীতে ১৭ কোটি থেকে ২৪ কোটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কি হবে? এই সমস্যা নিয়ে এখনও তেমন কোনো আলোচনা নেই তবে হতে বাধ্য।

বেজিং অধিবেশন ভারতীয় মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা জানবে কি?

কিছুদিন বাদে চীনের রাজধানী বেজিং-এ পৃথিবীব্যাপী মহিলাদের অবস্থা সম্বন্ধে একটা কনফারেন্স হবে। মেয়েদের মর্যাদা কি এবং কিভাবে তা বাড়ানো যায় এই সম্বন্ধে এটাই বিশ্বের চতুর্থ অধিবেশন। এই অধিবেশন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এবার যত দেশ এই আন্তর্জাতিক অধিবেশনে যোগ দিচ্ছে এর আগে কোনো মিটিংয়ে এত দেশ যোগ দেয়নি। বস্তুতপক্ষে মেয়েদের জন্য আর মুখ্যত মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত পৃথিবীব্যাপী এই অধিবেশন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধিবেশনে ভারত সরকার একটি ভাষ্য তৈরি করেছে। এই ডকুমেন্ট ভারতের ৫০ শতাংশ আদিবাসীদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা কোনো মহিলা সংগঠনের পছন্দ নয়। চতুর্দিক থেকে বহু অভিযোগ আসছে। বলা হচ্ছে 'সরকারি মহিলারা' যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তা অসম্পূর্ণ, বিকৃত ও ইচ্ছাকৃত ত্রুটিতে ভরপুর। রিপোর্টে বলা হচ্ছে 'ভারতের মেয়েদের সমস্যা আছে তবে ভারত সরকার সমাধান করবার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।' ফলে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এই রিপোর্টে শুধুমাত্র মেয়েদের বিয়ের বয়েস, সন্তান গ্রহণের ক্ষমতা আর উর্বরতা সম্বন্ধে বলা আছে। অন্যান্য সব সমস্যা সম্বন্ধে একটিও কথা প্রায় বলা হয়নি। যে সব সমস্যার কথা প্রায় উল্লেখ করা হয়নি সেগুলো হল মেয়েদের আয়, চাকরির সুযোগ, খাদ্যগ্রহণ, স্বাস্থ্যগ্রহণ, আর পুরুষ শাসিত সমাজে প্রকৃত অবস্থা প্রায় অনুপস্থিত। অর্থাৎ ভারত সরকারের 'আমলা-মহিলারা' এই রিপোর্টে একটা 'ভুল' ধারণা তৈরি করেছে যে ভারতীয় মেয়েদের অবস্থা প্রভূত পরিমাণে উন্নতি হয়েছে, আরও উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে।

কথিত আছে বোম্বাই সিনেমার স্বনামধন্য অভিনেত্রী নার্গিস শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' সিনেমা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তা

হচ্ছে এই সিনেমায় ভারতীয় দারিদ্র্যের এক ছবি আছে। আন্তর্জাতিক মহলে এই ছবি দেখানো উচিত নয়। আমাদের আসল অবস্থা কি তা বিদেশীদের জানাবার দরকার কি? বরং বোম্বে সিনেমার প্রাচুর্য (মারামারি কাটাকাটি) গান-বাজনা দেখানো উচিত। এটাকে একদল লোক বলে 'Nargis Theory of Growth' অর্থাৎ আসল সত্য ঘটনা চেপে গিয়ে ভারতকে প্রগতিবাদী, ঐশ্বর্যশালী, সুখী ইত্যাদি আলোকে দেখানো উচিত। ভারত সরকারের বর্তমান ডকুমেন্টে মেয়েদের সম্বন্ধে যা বলা হয়ে থাকে তা হচ্ছে 'নার্গিস দর্শনের' বর্তমান রূপান্তর। বিদেশীদের কাছে কানাকে পদ্মলোচন বলে অভিহিত করলে ক্ষতি কি?

নানান প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের ভাষ্যর বিকল্প তৈরি করে আমাদের ভারতীয় নারীদের সত্যিকারের অবস্থা কি তা জানাতে উদ্‌গ্রীব। বিভিন্ন সংস্থা ভারতীয় নারীদের অবস্থার যা বর্ণনা করেছে তা সংক্ষেপে দেওয়া যাক।

প্রত্যেক বছরে ভারতে ১,৫০,০০০০০ বা প্রায় দেড় কোটি মেয়ে সন্তান জন্মেছে। তার মধ্যে ৫০ লক্ষ মেয়ে ১৫ বছরের বেশি বাঁচে না, আগেই মারা যাবে। মারা যাবার নানা কারণের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে অবহেলা ও অযত্ন। এই ৫০ লক্ষ মেয়ে যারা মারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জন্মের প্রথম এক বছরের মধ্যেই মারা যাচ্ছে। গড়ে ছ' জনের মধ্যে একজনের মৃত্যুর কারণ পারিবারিক অবহেলা আর ছেলেদের জন্য পক্ষপাতমূলক আচরণ বা Gender inequity. যে রাজ্যগুলিতে মেয়েদের মৃত্যু খুব বেশি শুধু অবহেলাজনিত কারণের জন্য সেইগুলি হল বিহার, হরিয়ানা, গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ।

বর্তমানে ভ্রূণহত্যা (বিশেষত মেয়ে হলে) এক অশুভ পর্যায়ে চলে গেছে। ভারতীয় জনসংখ্যায় যে কিছুদিনের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শুধু বোম্বাই শহরেই ১৯৮৪ সালে ভ্রূণহত্যা (মেয়ে হয়ে জন্মাবার জন্য) প্রায় ৪০,০০০ এবং একটি ক্লিনিকেই মেয়ে ভ্রূণহত্যা হয়েছে এক বছরে প্রায় ১৬ হাজার। মেয়ে ভ্রূণ হত্যার প্রধান কারণ পণপ্রথা। ভারতবর্ষে গড়ে পণপ্রথার জন্য হত্যা বা আত্মহত্যা করতে হচ্ছে অন্তত ২২টি বাড়ির বধূকে। শুধু পণপ্রথার জন্য ভ্রূণহত্যা করা হচ্ছে তাও সত্যি নয়, আমাদের জমি বা বাড়ি বা সম্পত্তির ওপর মেয়েদের কোনো অধিকার না থাকে, বা সম্পত্তি শুধু ছেলেই যাতে পায় তার জন্য এই মেয়ে ভ্রূণহত্যা প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে প্রতি হাজার পুরুষে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। বরং দেশ যত উন্নত হচ্ছে প্রতি হাজার পুরুষে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ হিসেবে উন্নত দেশে বলা হচ্ছে মেয়েরা 'Genetically and Bilogically stronger'। কিন্তু ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতে Sex

Ratio (প্রতি হাজার পুরুষে কত স্ত্রীলোক) শুধু যে কমছে তাও নয় ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালের সেনসাস অনুযায়ী প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ভারতে এখন ৯২৯ এবং ১৯০১ সাল থেকে প্রত্যেক সেনসাসে এটাই সবচেয়ে কম।

১৯৯১ সালের সেনসাসে শুধু কেরলে প্রতি এক হাজার পুরুষে ১০৪০ জন স্ত্রীলোক। এছাড়া সবচেয়ে ভালো Sex-Ratio যে আটটি রাজ্যে ও তিনটি ইউনিয়ন টেরিটরিতে সেখানে Sex-Ratio বড়জোর ৯৫০ বা তারও কম।

ভারতে সম্ভবত ৪৪টি জেলা আছে যেখানে Sex-Ratio ৮৫০-এর নিচে এবং এর অর্ধেকই উত্তরপ্রদেশে। এবং ৮৫০ Sex-Ratio শুধু যে অনুন্নত উত্তরপ্রদেশে সত্যি তাও নয় দিল্লির মতো রাজধানী শহরে একই অবস্থা। জয়সলমির আর ঝিন্দ জেলা বাদ দিলে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের অবস্থা অন্তত Sex-Ratio-র দিক থেকে শোচনীয়।

ভারতে মৃত্যুহার কমার ফলে Life Expectancy বেড়েছে। কথাটার অর্থ হল ভারতবাসী এখন কত বছর পর্যন্ত বাঁচবে? উত্তরপ্রদেশের একটি মেয়ে জন্মালে কেরলের একটি মেয়ের থেকে অন্তত কুড়ি বছর কম বাঁচবে। আর কোনো কোনো রাজ্যে ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ মৃত্যু হার বেশি হয় কারণ কিছু কিছু জায়গায় বাচ্চা হবার সময় তা মারা যাচ্ছে। এবং প্রসবকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা নেওয়া উচিত তা অসম্ভব কম আমাদের BIMARU রাজ্যে। BIMARU কথাটির মানে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশ।

উপযুক্ত খাদ্যও মা ও মেয়ে শিশু প্রায় পায় না। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক আচার-বিচার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এখনও পুরুষরাই বেশি পায়। একটা পরিবার বিশেষত BIMARU রাজ্যগুলিতে খাদ্যদ্রব্য বিতরণের একটি অলিখিত নিয়ম আছে। পুরুষরা আগে খাবে, যদি কিছু থাকে তবে বাড়ির মেয়েরা। তাছাড়া সামাজিক আচার-বিচার সবই প্রায় মেয়েদের স্বাস্থ্যকে রেখে তৈরি করা হয়নি। অমর্ত্য সেনের এক বিখ্যাত বইয়ে আছে, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে কিভাবে স্ত্রীলোকেরা বঞ্চিত হচ্ছে এবং এই ত্যাগটাকে আমরা অনেক সময় সামাজিক ও ধর্মীয় আচার বলে মেনে নেই। নানান সমীক্ষায় বলা হচ্ছে যে, একটি ছেলে বাড়িতে একটি মেয়ের থেকে বেশি খাচ্ছে এবং পাচ্ছে। অর্থাৎ 'Son-fixation' আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটি অংশ।

তামিলনাড়ু এবং পঞ্জাবের মধ্যে অনেক অমিল। কিন্তু একটা বিষয়ে অদ্ভুত একটি মিল (UNICEF) লক্ষ্য করেছে। একটি ছেলে বাচ্চা হলে মা তাকে বেশিদিন স্তন্যপান করাচ্ছে, একটি মেয়ে বাচ্চার থেকে। পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে একটি ছেলে বাচ্চা একটি মেয়ে বাচ্চা থেকে অন্তত পাঁচ মাস বেশি মায়ের দুধ পায়। এর নাম এক ধরনের 'কালচারাল ফিক্সেশন'।

বোম্বাই-এর একটি সংস্থা ইন্সটিটিউট অফ হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট সমীক্ষা করে জানাচ্ছে, মেয়েদের অবহেলা জিনিসটা অর্থ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ এই ঘটনা শুধু গরিব পরিবারেই হচ্ছে আর বড়লোক বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে হচ্ছে না সত্যি নয়। এই সমীক্ষা জানাচ্ছে যে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে পার্থক্য মহারাষ্ট্রে সবচয়ে বেশি করা হচ্ছে এক থেকে তিন বছরের মধ্যে।

আবার All India Market Information Survey জানাচ্ছে, মেয়েদের অসুখ করলে আমরা প্রায়শ চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত করি না। অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে অসুখ করলে চিকিৎসা খরচও পার্থক্য করা হয়। এই পার্থক্য বা Differential সবচেয়ে বেশি উড়িষ্যা, হরিয়ানা এবং পঞ্জাবে।

মেয়েদের শিক্ষার হার ছেলেদের থেকে এখনও গড়ে অনেক কম। রাজস্থানে বারমার জেলায় স্ত্রীশিক্ষার হার মাত্র আট ৮ শতাংশ, ভারতের অন্তত ৪৫টি জেলা আছে যেখানে স্ত্রীশিক্ষার হার মাত্র কুড়ি শতাংশের কম। আবার যে রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার হার বেশি সেখানে মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে এবং থাকছে। অর্থাৎ Drop-out-rate কম। এই রাজ্যগুলি হল কেরল, গোয়া, পণ্ডিচেরী। যাদের শিক্ষার হার মাঝামাঝি সেখানে স্কুলে ভর্তির হারও মাঝামাঝি আর Drop-out-rate মাঝামাঝি। যেমন পঃ বঙ্গ, তামিলনাডু, অন্ধ্র। আবার যেখানে শিক্ষার হার কম সেইখানে মেয়েরা স্কুলে ভর্তিও হচ্ছে কম আর Drop-out-rate বেশি। বর্তমানে রাজস্থানে Drop-out-rate বেশি। প্রায় ৬৫ শতাংশ।

Drop-out rate-এর অনেক কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে বাড়ির বাচ্চা মেয়ে অনেক সময় প্রক্সি মা বাচ্চার যে সময় স্কুলে যাবার কথা তখন সে সংসার সামলাচ্ছে।

আর মেয়েদের সংসার সামলানো কাজটা এমনই যে পুরুষের তুলনায় সাধারণভাবে তিন থেকে চারগুণ ঘণ্টা হিসেবে বেশি খাটে। আর সাংসারিক কাজটা 'Invisible' বা অদৃশ্য এর কোনো অর্থে মূল্যায়ন হয়নি বা হবেও না। আর অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়া এখনও প্রভূত পরিমাণে ঘটছে। এর কারণ মেয়েদের মা-বাবারা অনেক সময় মেয়েটিকে ভাবে একটি 'বোঝা' আর এই 'বোঝাকে' যত শীঘ্রই সম্ভব চালান করে দেওয়া যাক।

মেয়েদের প্রকৃত অবস্থা হয়তো আরও ভয়াবহ। তবে বেজিং কনফারেন্সে ভারত সরকার তা ঠিক স্বীকার করতে চাচ্ছে না। আসল সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া এইবার হয়তো নাও হতে পারে।

জনসংখ্যা নীতি ও মানুষের অধিকার

জনসংখ্যা সম্বন্ধে ভারতের কি নীতি হবে তা নিয়ে পপুলেশন কমিশনের সঙ্গে মানুষের অধিকার রক্ষা কমিটির এখন বিরাট ঝগড়া।

পপুলেশন কমিশন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েকটি নীতি গ্রহণ করবার সুপারিশ করেছে। সেই সুপারিশগুলি ভারতের পাঁচটি অঙ্গরাজ্য গ্রহণ করবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। আর এইসব নীতি ও সুপারিশের বিরুদ্ধে হিউম্যান রাইট কমিশন মামলা আনতে যাচ্ছে। হিউম্যান রাইট কমিশনের বক্তব্য প্রপুলেশন কমিশনের নীতি গ্রহণ করলে মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার বিপন্ন। পপুলেশন কমিশন কি বলছে আর তার বিরুদ্ধে মামলাই বা কেন তা জানা দরকার। ভারতের জনসংখ্যা নীতি বর্তমানে আরও কঠোর হতে যাচ্ছে। বর্তমানে আমরা যে নীতি নিতে যাচ্ছি সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেওয়া যাক।

১) প্রত্যেক পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর দুটি সন্তান বা তার কম থাকা 'বাধ্যতামূলক'। যদি 'দো বাচ্চার' বেশি হয় তবে পরিবারের উপর শাস্তির খড়দণ্ড নেমে আসবে।

২) যদি দু-এর বেশি তিনটি সন্তান হয় তবে তৃতীয় ছেলেটি কোনো সরকারি স্কুলে বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না।

৩) এই তৃতীয় সন্তানের জন্য কোনো রেশনকার্ড দেওয়া হবে না। প্রয়োজনমতো পরিবারের রেশনকার্ডও বাতিল হয়ে যেতে পারে।

৪) চাকরিক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সব সুযোগ-সুবিধা পায় তা তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৫) সরকার ইচ্ছা করলে যে পরিবারে (স্বামী ও স্ত্রীর) দু'টির বেশি বাচ্চা হয়েছে তার ওপর 'জরিমানা' ধার্য করতে পারে।

অর্থাৎ দু-এর বেশি তিন বা ততোধিক বাচ্চা থাকলে পরে এখন নানান শাস্তিমূলক নীতি গ্রহণ করা হবে। শাস্তির রূপ ক্রমশ কঠিন হবে। আশা করা

যাচ্ছে শাস্তি যত বাড়বে আমাদের জনসংখ্যা ততটাই কমবে। তবে এই ধরনের শাস্তি কি মানুষের অধিকারকে হরণ করছে? হিউম্যান রাইট কমিশন তাই মনে করছে। জননীতি আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। অতএব এই জননীতির বিরুদ্ধে তারা মামলা করবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এখানে একটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে বিপুল জনসংখ্যা। প্রত্যেক বছরে এক কোটি থেকে দেড় কোটি লোক আমাদের বাড়ছে। প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হাজার নতুন শিশু জন্মাচ্ছে। যত লোক জন্মাচ্ছে তত আহার, বাসস্থান ও চাকরির সমস্যা বাড়ছে। যত নতুন শিশু জন্মাচ্ছে তত পরিষেবা বাড়ছে না। এখন চতুর্দিকে পুষ্টির অভাব, স্কুলের অভাব, শিক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বহুদিন বহু চেষ্টা করেও আমরা সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারিনি। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে।

ব্যতিক্রম কেরল সহ অন্য অনেক রাজ্য যেখানে শিক্ষার হার বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার হার বেশি। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর-পূর্ব ভারতে জনসংখ্যা প্রায় 'অপরিবর্তনীয়' বা ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় 'Stable' অর্থাৎ জনসংখ্যা বিশেষ বাড়ছেও না বা কমছেও না।

আমাদের অঙ্গরাজ্য বর্তমানে ক'টি, কখনও বলা হয় ২৮টি কখনও ৩২টি। সংখ্যাটা নির্ভর করছে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় যে রাজ্যগুলি আছে সেগুলি ধরব কিনা। মোটামুটি বলা যায় আমাদের বৃহৎ রাজ্যের সংখ্যা ১৫টি। আর ১৫টি রাজ্যের মধ্যে মাত্র চারটি রাজ্য আছে যারা অনবরত জনসংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রতি বছরে এক কোটি থেকে দেড় কোটি লোকসংখ্যা বাড়ছে, তার প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ছে মাত্র চারটি রাজ্যের জন্য। অর্থাৎ ১ কোটি লোক যদি ভারতে প্রতি বছর বাড়ে তবে প্রায় ৫০ লক্ষ বাড়াচ্ছে চারটি রাজ্য আর বাকি ৫০ লক্ষ বাড়ছে বাকি ২৭ থেকে ২৮টি রাজ্যের জন্য। বা যদি ১৫টি বৃহৎ রাজ্য ধরি ১১টিতে খুব একটা বাড়ছে না বাড়ছে মাত্র চারটি রাজ্যের জন্য। আর এই চারটি রাজ্য হচ্ছে 'বিমারু' রাজ্য অর্থাৎ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ। বলা যেতে পারে আজকে জনসমস্যার সৃষ্টির মূলে আছে এই চারটি রাজ্য। এই চারটি রাজ্যে যদি কোনোরকমে জনসংখ্যা কমানো যায় তবে ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ একটি অদ্ভুত রাজ্য। ভারতের ১৫টি রাজ্যের মধ্যে পঃ বঙ্গের স্থান প্রায় ২০ বছর ধরে এই জায়গায়। যাকে আমরা 'মানব-বিকাশ সূচিকা' বলি অর্থাৎ Human Development Index তাতে আমাদের স্থান প্রায় একই জায়গায় অর্থাৎ অষ্টম স্থানে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে Natural rate of growth of Population বা প্রকৃতি নির্দিষ্ট যে জনবৃদ্ধির হার তা মোটামুটি অপরিবর্তনীয়। তবে পঃ বঙ্গের সমস্যা হচ্ছে পঃ বঙ্গে অন্যান্য

অঞ্চল থেকে আগত লোকসংখ্যা। এই 'অন্যান্য' অঞ্চল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও যেমন, তেমন ভারতের বাইরে যে সব দেশ আছে তার থেকেও তেমন। অর্থাৎ ১৫টি রাজ্যের মধ্যে যে দু'টি রাজ্য Migration বা Immigration সমস্যায় জর্জরিত তার একটি হচ্ছে পঃ বঙ্গ। অন্যটি অসম। সুতরাং আমাদের জনসমস্যা সবটাই ভিতরের ব্যাপার বা Endogenous তা নয়, অনেকটাই 'Exogenous' অর্থাৎ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমাদের রাজ্যে অবশ্যই শিক্ষার হার বেড়েছে যদিও যতটা বৃদ্ধি হবার ছিল ততটা হয়নি। তবুও আমাদের 'বিধি নির্দিষ্ট জন্মহার' বা Natural rate of growth of population ততটা বেশি নয়।

এখন যে সমস্ত রাজ্যে জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে অর্থাৎ 'বিমারু' রাজ্যগুলিতে যেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সব প্রচেষ্টাই প্রায় বিফল, সেখানে আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো 'জোর' খাটাতে পারিনি। ভাবা হয়েছিল বিজ্ঞাপন বা অর্থের লোভ দেখালে পরে সমস্যাটা আয়ত্তের মধ্যে আনা যাবে!

কেরল বা তামিলনাড়ুতে জোর দেওয়া হয়েছিল শিক্ষার হার বৃদ্ধির উপর। কারণ দেখা গিয়েছে শিক্ষার হার যত বৃদ্ধি পাবে, স্ত্রীশিক্ষার যত প্রসার হবে তত জন্মহার কমবে। বস্তুত অনেক রাজ্যে তাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু যে সব রাজ্যে শিক্ষার হার, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার হার ভারতীয় গড় থেকে অনেকটাই কম সেই সব রাজ্যে কি করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? বলা হচ্ছে 'জোর' ছাড়া শুধু মুখের কথায় নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। তবে সর্বভারতীয় নীতি তো শুধু বিহারের জন্য করা সম্ভব নয় অতএব 'দো বাচ্চা ব্যাস' তত্ত্ব সর্বভারতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার ও রাজস্থান সরকার যতটা আগ্রহী বিহার বা উত্তরপ্রদেশ আপাতত ততটা আগ্রহী নয়। বিহারের রাজনীতিবিদরা বর্তমানে 'গণতন্ত্র বিপন্ন' জাতীয় আওয়াজ তুলবার চেষ্টা করছে তবে জনসমর্থন এখনও খুব একটা নেই। সবারই ধারণা 'কিছু' একটা করা উচিত।

কিছুর মধ্যে অবশ্যই প্রথমে আছে শিক্ষার এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। কেরল বা তামিলনাড়ু বা উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এমনকি ত্রিপুরার শিক্ষার হার যতখানি সাফল্য লাভ করেছে হিন্দি রাজ্যগুলি তার কাছাকাছি আসেনি। যে সব রাজ্যে শিক্ষা 'অগ্রাধিকার' বা 'Priority' পেয়েছে সেখানে জনবিস্ফোরণ ঘটেনি। হিন্দি বলয়ে শিক্ষা বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার প্রসার খুব একটা বেশি হয়নি। আমরা যাকে বলি 'ক্রিটিকাল মিনিমাম' (Critical Minimum) তার দরজার গোড়াতেও এইসব বিমারু রাজ্যগুলি আসেনি। জনসংখ্যা স্ত্রীশিক্ষার উপর যেমন নির্ভরশীল তেমন আবার Empowerment বা স্ত্রীলোকদের ক্ষমতা প্রদান করলে—সর্ব বিষয়ে কিছু কিছু বৃহৎ রাজ্য আছে তাতে সম্পূর্ণ বিফল।

অতএব আমাদের দেশের যে সব নেতা পপুলেশন কমিশনের সদস্য তাঁরা

'জন্মনিয়ন্ত্রণে' চীনের দাওয়াই প্রয়োগ করতে চান। এখানে বলা দরকার, পপুলেশন কমিশনে 'বিমারু' রাজ্যগুলি থেকে কিছু মহিলা সদস্য 'চীনের দাওয়াই' এবং কঠিন শাস্তির পক্ষপাতী। বর্তমানে প্রায় ১৯৭৯ সাল থেকে চীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানান জোর প্রয়োগ করছে। চীনের প্রথম নীতিই হল একটি বাচ্চা। যার দুটি বাচ্চা বা বেশি হবে তার উপর নানান শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। শাস্তিমুলক ব্যবস্থার মধ্যে আছে রেশনকার্ড না দেওয়া, ভুমির ওপর লিজ বা কৃষিকাজ করতে না দেওয়া, জরিমানা আদায় করা এবং নানান বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করতে দেওয়া। অর্থাৎ 'একের বেশি' বাচ্চা হলে চীন দেশে সেই পরিবারকে ভাতে-কাপড়ে মারার বন্দোবস্ত করা হয়।

চীনের সমস্যা একদিকে যেমন কমেছে অন্যদিকে বেড়েছে। চীন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। যদিও চীনের সেনসাস নিয়ে বর্তমানে প্রচুর বিতর্ক। বিতর্কের বিষয় হল 'এক বাচ্চা' নীতি শহর অঞ্চলে সাফল্য লাভ করেছে, গ্রামাঞ্চলে হয়নি। আরও একটি সমস্যা চীন দেশে বর্তমানে তীব্র। আমাদের অনুন্নত এশীয় দেশে পুত্র জন্মালেই আমরা বেশি খুশি হই। 'Son Fixation' আমাদের কালচারের অঙ্গ। স্ত্রী-কন্যা অনেক পরিবারে অভিপ্রেত হয় না—কারণগুলি নির্বোধের মতো। চীন দেশে 'এক বাচ্চা' নীতিতে মেয়ে বাচ্চা জন্মালেই অনেক জায়গায় মেরে ফেলা হচ্ছে। ভ্রূণ হত্যা এবং শিশু কন্যা হত্যা চীন দেশে এক ব্যাধি।

তবুও বলা যায়, জোর প্রয়োগ করে চীন দেশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অন্তত কিছুটা। কিন্তু আমাদের মতো দেশে জোর খুব চলবে কি? এমারজেন্সি সময়ে জোর খাটাতে গিয়ে নানান সমস্যা—সরকারের ওলোট-পালোট, ডিগবাজি।

আমরাও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জোর খাটাবার কথা বলছি। চীন দেশ হবার চেষ্টা করছি। পরিবারের উপর জোর খাটালে সরকার হয়তো টিকবে না। সুতরাং রাজনীতিবিদরা আমাদের জোর নীতি কতটা গ্রহণ করবেন বলা মুশকিল। বলা যায় করবেন না। বলা যায় শিক্ষার উপর খরচ বাড়াবে না। অতএব প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার নতুন শিশু জন্মাবে। মানুষের অধিকার কোন্‌টা? জনসংখ্যা কমিয়ে সুযোগ বৃদ্ধি করা, না জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া। বিতর্ক এখনই শুরু হয়েছে। পরে আরও অনেক শোনা যাবে।

জনসংখ্যা সমস্যা বিশ্ব সভ্যতার এক বিরাট সঙ্কট

গত ১২ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হল। বিশ্বে এখন অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার বিস্ফোরণে নানান সমস্যা। সমস্যাটা আজকাল তিনভাগে ভাগ করে দেখা হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সারা বিশ্বের সম্পদ নষ্ট হবার সমস্যা। দ্বিতীয়ত, ভারতের নিজস্ব সমস্যা। আর তৃতীয়ত, স্থানীয় সমস্যা। অর্থাৎ গ্লোবাল বা বিশ্বজনীন সমস্যা, ভারতের উন্নয়নের সমস্যা আর স্থানীয় সমস্যা। বলা হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আদৌ মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবে কিনা তাই নিয়ে সঙ্কট। জনসংখ্যা সমস্যা তাই বিশ্ব সভ্যতার সঙ্কট। পৃথিবীতে এই ধরনের সঙ্কট আগে এসেছে কিনা সন্দেহ।

বিশ্ব সংস্থার অধীনে ক্লাব অফ রোম একটি রিপোর্ট কিছুদিন আগে তৈরি করেছিল। আর এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার ফলে প্রায় প্রত্যেক দেশেই নানান আতঙ্ক। ক্লাব অফ রোম রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে যাচ্ছে। যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার পর সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে। আবার দ্বিগুণ হয় ১৮৫০ সালে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার দ্বিগুণ হয় ২০০ বছর পরে। কিন্তু ১৯০০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা দু'বার দ্বিগুণ হয়। ২০০০ সালে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে প্রত্যেক ৩০ বছরে প্রথমে তারপরে ১৮ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে চলবে। অথচ নানান সরকারি ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না।

জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সেই হারে সম্পদ বাড়ছে না। বরং পৃথিবী সীমিত। তাই সম্পদও সীমিত। যথেচ্ছ সম্পদ ব্যবহার করার ফলে অরণ্য অনেকাংশে ধ্বংস, কয়লা বহু জায়গায় ফুরিয়ে যাচ্ছে, তেল ফুরোতে বড়জোর পঞ্চাশ বছর। অর্থাৎ পৃথিবীতে সভ্যতা যার উপর নির্ভরশীল, সেই কাঁচা মাল, জ্বালানি, অরণ্য, ভূমি সবই ক্ষয় হয়ে চলেছে। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা যত বাড়ছে কৃষির উপর চাপও বাড়বে। আর যত চাপ বাড়বে তত টপ সয়েল বা উপরের ভূমি ক্ষয় পাবে। ছয় ইঞ্চি উপরের উর্বরা ভূমি তৈরি হতে ন'বছর

লাগে, কিন্তু নষ্ট করলে তা অনায়াসেই করা যায়। এবং তাই হচ্ছে। যত সম্পদ কমছে তত মানুষের ভোগ লালসা বাড়ছে। ভোগ-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানাবিধ ক্ষতি হচ্ছে। শিল্পায়ন বাড়ার সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিমণ্ডল দূষিত হচ্ছে। অনেক সময় বলা হয় গ্রীন হাউস এফেক্ট (Green House Effect) অর্থাৎ নানাবিধ গ্যাস ও কেমিক্যালের যথেচ্ছ ব্যবহারে পৃথিবী ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। এই জুলাই মাসে ইউনাইটেড নেশনস-এর অধীনে ইন্টার গভর্নমেন্ট প্যানেল ক্লাইমেটিক চেঞ্জ বা আই পি সি সি তাদের রিপোর্ট বের করেছে। এই রিপোর্টে বলা আছে পৃথিবীতে এনার্জি ব্যালেন্স ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত উষ্ণতা বেড়েছে পৃথিবীর প্রায় ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই শতাব্দীতে তা বাড়ছে ০.৬ ডিগ্রি। অর্থাৎ পৃথিবী ক্রমশ গরম হচ্ছে। পৃথিবীর সমুদ্রের লেভেল বেড়ে গেছে প্রায় এই শতাব্দীতে ২.৫ সেন্টিমিটার। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তবে সমুদ্রের লেভেল বাড়বে আর আগামী পঁচিশ বছরে প্রায় ৯৫ সেন্টিমিটার। যদি ওজোন লেয়ার ক্রমশ ধ্বংস হয় তবে পৃথিবীর আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন হবে। বন্যা বাড়বে, মৌসুমী বায়ু পথ পরিবর্তন করবে, বহু জায়গায় মরুভূমি বাড়বে, আর বন ধ্বংস হবে। এই আকস্মিক পরিবর্তনে পৃথিবীর অনেকাংশ সমুদ্রের তলায় চলে যাবে—যেমন ঢাকা শহর বা চট্টগ্রাম-কলকাতা বন্দরের উপর নানান সমস্যা আসবে। এই গ্রীন হাউস এফেক্ট কমাবার জন্য যে বার্লিন ম্যানডেট তৈরি করা হয়েছিল তাতে উন্নত দেশগুলি এখনও সই করেনি। বার্লিন ম্যানডেটে (১৯৯৫) বলা হয়েছিল যে পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমাবার জন্য গাড়ির ব্যবহার ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০ শতাংশ কমানো দরকার। ধনী দেশগুলি এতে রাজি হয়নি বরং তাদের স্লোগান 'দরিদ্র দেশে দুই বাচ্চা' আর ধনী দেশে 'প্রত্যেক পরিবারে দুটি মোটর গাড়ি'। গ্রীন হাউস এফেক্ট মূলত শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির ভোগ্য বস্তুর যথেচ্ছ ব্যবহারে। পৃথিবীর উন্নত দেশেই বর্তমানে প্রায় ৮০ শতাংশ। এই শিল্পায়ন মানুষের সভ্যতাকে যে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিচ্ছে তাতে তাদের বিশেষ চিন্তা নেই। এবং সমাধান তারা যা চায় তা হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলি যেন বেশি শিল্প না করে। তাদের বলার কারণ অনুন্নত দেশেগুলি এখনও জনসংখ্যা স্থিতি বা 'স্টেবল' করতে পারেনি। তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এই সমস্যার কারণ।

১৯৯৫ সালের কথাই ধরা যাক। গত বছরেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০০ মিলিয়ন। তার মধ্যে ৩২ শতাংশ ১৫ বছরের কম। অর্থাৎ তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা এখনও আছে। আর ১০০ মিলিয়ন যা বেড়েছে তা মূলত অনুন্নত দেশে।

অনুন্নত দেশের মধ্যে ভারত এখনও জনসংখ্যা কমাতে পারেনি। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কল্যাণে জন্মহার কমেছে। তবে ওষুধের কল্যাণে মৃত্যু হারও কমেছে। মৃত্যু হার অনেক বেশি কমায় জন্মহার কমার কোনো উপযোগিতা

আমরা বুঝতে পারছি না। ভারতবর্ষ বর্তমান পৃথিবীর ভূতল দু'শতাংশ নিয়ে আছে—অথচ এই দুই শতাংশ ভূতলে পৃথিবীর ১৫ শতাংশ লোক। এদিকে চীন তার জনসংখ্যা অনেকটাই 'স্থিতি' করে ফেলেছে। ফলে আগামী শতাব্দীতে ভারতের ২ শতাংশ ভূতলে বোধহয় পৃথিবীর ২০ শতাংশ লোক বাড়বে। বলা হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে আমরা জনসংখ্যায় চীনকে ছাপিয়ে যাব। পৃথিবীতে আমরাই জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রণী প্রথম দেশ।

এর ফলে যে অজস্র সমস্যা দাঁড়াবে তা বলাই বাহুল্য। বেকারি ক্রমশ বাড়বে। মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলবে। গ্রামের লোক চাকরি না পেলে শহরে ভিড় করবে—ফলে নগরায়নের সঙ্গে বস্তি বেড়ে যাবে। স্কুল-কলেজ যা প্রয়োজনীয় তা হবে না। যা সমস্যা তা আরও দ্বিগুণ হবে। ক্লাব অফ রোম রিপোর্ট জানাচ্ছে, যদি লেখাপড়া বর্তমান হারেই বজায় রাখতে চাই এবং প্রত্যেক বছরে নতুন নতুন স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যদি তৈরি না করি তবে সমস্যা অসহনীয় হবে।

অথচ শিক্ষার হার না বাড়ালে জন্মহার বন্ধ করার কোনো উপায় নাই। পৃথিবীতে যে সব জায়গায় জন্মহার ও মৃত্যুহার হাজারে ১০ করা হয়েছে সেইখানে শিক্ষার হার বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার হার বেশি। জনসংখ্যা কমাবার দুটো পদ্ধতি খোলা আছে—প্রথমত. দ্রুত হারে উন্নতি করা আর দ্রুততর হারে শিক্ষার হারের প্রসার। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা জন্মহার বাড়ার প্রধানতম কারণ।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেরলই একমাত্র জন্মহার ও মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে পেরেছে। তার কারণ কেরলে শিক্ষার হার বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার হার প্রায় ১০০ শতাংশ। সেই জায়গায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে (যাকে বলা হয় বিমারু রাজ্য) স্ত্রীশিক্ষার হার খুবই কম। ফলে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা যা বাড়ছে তার ৬০ শতাংশই এই চার রাজ্যে। এইসব রাজ্যে শিক্ষার হারও কম আবার উন্নতির হারও কম।

উত্তরবঙ্গে এই শতাব্দীতে প্রায় তিনবার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। তার কারণ কিছুটা জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, আর কিছুটা অন্য দেশ থেকে লোকের আগমন। ফলে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে সেই হারে চাকরি, সুযোগ, সুবিধা, স্বাস্থ্যর খরচ ও শিক্ষা বাড়ছে না। বলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নতির জন্য ছুটছে অথচ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—রানিং ইন দি সেম প্লেস।

আর উন্নতির জন্য এমন সব বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়েছি তার কোনোটাই শেষ হচ্ছে না। তিস্তা প্রোজেক্ট কবে শেষ হবে কেউ জানে না। আবার 'বন সম্পদ ধ্বংস' আর পাহাড়ে ঘন ঘন ধস—সমস্ত উন্নতি এক বন্যায় বা ধসে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। উন্নতির জন্য আমরা যেভাবে কৃষি সেচের ব্যবস্থা করছি তাতে হাতির যাতায়াতের পথে বাধা পড়বে। অথচ উত্তরবঙ্গে যদি উন্নতির সঙ্গে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না রাখতে পারি সমগ্র ভারতবর্ষে তার প্রভাব

পড়তে বাধ্য। বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গে যদি বন ধ্বংস হয় তবে পঃ বঙ্গে সর্বত্রই তার প্রভাব পড়বে। আমরা জন্মহার কমাতে চাই—কিন্তু তার জন্য আমাদের উন্নতি করতেই হবে। উন্নতিই সবচেয়ে বড় কনট্রাসেপটিভ। অথচ উন্নতি করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে। আজ আমরা তা করতে সফল হচ্ছি না। যেহেতু শিল্পায়ন আমরা দেরিতে আরম্ভ করেছি তাই সমন্বয় ও সমতুল্য করা খুবই অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। যতখানি চিন্তা করে এগোতে হবে, ততখানি চিন্তা আমরা করছি না। চটজলদি সমাধান করলে সমস্যা বাড়বে, কমবে না।

উন্নত দেশ ও বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন

২০০২ সালে ১২ জুন অর্থাৎ মাত্র ক'দিন আগে ইতালির রোমে 'বিশ্ব খাদ্য শিখর সম্মেলন' শেষ হল। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল রাষ্ট্রসঙঘ। রাষ্ট্রসঙঘ এই সম্মেলনে পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নত দেশগুলিকে আসবার নিমন্ত্রণ করেছিল কারণ বিষয়বস্তু ছিল 'মানুষের খাদ্য পাবার অধিকারকে' স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ব আইন প্রণয়ন করা। 'বাঁচবার অধিকার' মানুষের মৌলিক অধিকার আর সেই অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। আশ্চর্য বিষয়, এই ধরনের বিশ্ব আইন তৈরি হতে যাচ্ছে জেনে উন্নত দেশগুলি বিশেষত যাদের খাদ্যভাণ্ডার পর্যাপ্ত তারা সম্মেলনে এল না। আরও সোজা কথায় আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মতো খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশগুলি হয় সম্মেলনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে পাঠাল না অথবা মিটিংয়ে অনুপস্থিত। তাদের ধারণা যদি 'বাঁচবার অধিকার' এবং 'খাদ্যের অধিকার' আইন বলে স্বীকৃতি লাভ করে তবে যেসব দেশে অনাহার, অপুষ্টি ও দুর্ভিক্ষ আছে তারা উন্নত দেশগুলির বিরুদ্ধে 'মামলা করার অধিকার' পাবে। ফলে আমেরিকা বা কানাডার মতো দেশগুলির নানান দেশে বিনি পয়সায় 'খাদ্য সাহায্য' পাঠাতে হতে পারে। তারা এই আইনের বিরুদ্ধে। আমেরিকা চাইল না তাই রোমে 'খাদ্য' পাবার অধিকার' স্বীকৃতি লাভ করল না। রোমে অনেক চিৎকার হল, আমেরিকার বিরুদ্ধে অনুন্নত দেশগুলি গরম গরম কথা বলল, লাভ কিছু হল না। 'খাদ্য পাবার অধিকার' অন্তত ২০০২ সালে বিশ্ব আইনের মর্যাদা পেল না।

এই সম্মেলনে আরও জানা গেল যে বর্তমান পৃথিবীতে তথাকথিত বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক ক্ষুধার্ত লোক পৃথিবীতে বর্তমানে ৮০ কোটি। তবে সংখ্যাতত্ত্ব এবং নানান উত্তপ্ত তর্ক থেকে এটাই মনে হতে পারে যে, ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা ৮০ কোটির অনেক বেশি। ৮০ কোটি সংখ্যাটি রাষ্ট্রসঙঘ দিচ্ছে। আর এটা কিছুটা মনগড়া। পৃথিবীতে অন্তত সাত থেকে দশটি দেশ আছে যেখানে দুর্ভিক্ষ নিত্যসঙ্গী। যেসব দেশ এককালে

সুজলা সুফলা ছিল যেমন ইথিওপিয়া সেখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছেই না। পৃথিবীর আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রে জাতিগত দাঙ্গায় চাষাবাদ কিছুই হচ্ছে না।

রাজনৈতিক নেতাদের দৌরাত্ম্যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ দুই কারণে এখনও একবিংশ শতাব্দীতে দূর হয়নি। তার একটি কারণ আবহাওয়া জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন আর অন্যটি গৃহযুদ্ধ, জাতিদাঙ্গা, জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি। অন্তত ৮০ কোটি ক্ষুধার্ত লোকের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়? এখানে অনুন্নত দেশ আর উন্নত দেশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, মনান্তর ও মতান্তর।

অনুন্নত দেশগুলি 'খাদ্য পাবার অধিকারকে' মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়ে একটি পৃথিবীব্যাপী খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে চায়। এই খাদ্যভাণ্ডারে খাদ্য মজুত থাকবে আর সেই খাদ্য নিয়ে পৃথিবীব্যাপী বন্টন করা হবে। যাদের নেই বা যেখানে দুর্ভিক্ষ সেইখানে খাদ্যভাণ্ডার থেকে খাদ্য যাবে। বাৎসরিক খরচ পড়বে ২৪ বিলিয়ন ডলার বা তার কিছু কম বেশি। আর উন্নত দেশগুলি এই খরচের অন্তত সিংহভাগ বহন করবে। আপত্তি ভয়ানক আমেরিকা এবং ইউরোপের। আর ইউরোপের আপত্তির নেতৃত্ব দিয়েছে তথাকথিত 'মানবতা'র কথা যারা প্রত্যেক দিন বলে তারা অর্থাৎ ফ্রান্স আর ব্রিটেন। ফ্রান্সের বক্তব্য মোটামুটি এই যে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আগেও ছিল এখনও আছে অতএব ফ্রান্সের করার কিছু নেই। দুর্ভিক্ষ নিরোধে ফ্রান্স একটি পয়সাও খরচ করতে রাজি নয়। মানেটা হচ্ছে ইথিওপিয়াতে লোক মরলে ফ্রান্সের কি যায় আসে।

আর আমেরিকার প্রতিনিধির বক্তব্য শুনে এন জি ও বা বেসরকারি সংস্থাগুলি হেসেছে। আমেরিকা গুরুগম্ভীর গলায় যা বলতে চায় তা হচ্ছে আমেরিকা যেভাবে কৃষিতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে অনুন্নত দেশগুলি তা করেনি। বিজ্ঞানকে কৃষির কাছে নিয়ে যেতে হবে আর কৃষিকে বিজ্ঞানের কাছাকাছি। আমেরিকা চায় বায়ো-টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, হেলিকপ্টার থেকে সার দেওয়া, ক্লোনিং ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করলেই অনুন্নত দেশে দুর্ভিক্ষ থাকবে না। অনুন্নত দেশগুলি মান্ধাতা পদ্ধতিতে চাষবাস করছে বলে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। আমেরিকা চায় অনুন্নত দেশগুলি বায়ো-টেকনোলজি ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। আমেরিকার এই নতুন ঈশ্বর 'বায়ো-টেকনোলজি' এবার মিটিং-এ হাসির খোরাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোট কথা আমেরিকা দুর্ভিক্ষ দমনে কোনো অর্থ সাহায্য করবে না আর রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি খাদ্যভাণ্ডার তৈরি করতে চায় তবে আমেরিকা তাতে একটি পয়সাও দেবে না।

সবচেয়ে সমস্যা দাঁড়ায় 'ফুড সিকিউরিটি' কথাটির অর্থ নিয়ে। উন্নত দেশগুলির মতে 'ফুড সিকিউরিটি' একমাত্র আসতে পারে উৎপাদন ব্যবস্থার

উন্নতিতে। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে যদি কৃষিতে ক্যাপিটালিস্টিক ফার্মিং এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা ক্যাপিটালিস্টিক প্রথায় উন্নতি হতে পারে এবং ছোট কৃষককে জমি থেকে উৎখাত না করলে এই ক্যাপিটালিস্টিক প্রথায় কৃষি সম্ভব নয়। অর্থাৎ 'জমির বন্টন ব্যবস্থা', 'ভূমিহীনকে জমি দেওয়া', 'কৃষি দ্রব্যর মূল্য বেঁধে দেওয়া' এবং রেশন ব্যবস্থা ক্রমশ তুলে দিতে হবে। অর্থাৎ ছোট কৃষক জমিতে আছে বলে অনুন্নত দেশে কৃষির প্রগতি সম্ভব হচ্ছে না। জমিতে সিলিং উঠিয়ে বড় বড় জমিতে আধুনিক প্রথায় চাষ করতে হবে।

অনুন্নত দেশগুলি এই প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। তার কারণ অনুন্নত দেশে যেখানে শিল্প গড়ে ওঠেনি, অসংখ্য ছোট কৃষক তাদের অল্প জমিতে চাষ করে এবং উৎপাদন করে অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে ধরে রেখেছে। জমির সুষম বন্টন ব্যবস্থায় একমাত্র উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপিটালিস্টিক ফার্মিং মানে অসংখ্য কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করা। অনুন্নত দেশগুলি বলতে চায় জমির সুষম বন্টন এবং দ্রব্যর ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ এবং রেশন ব্যবস্থার উন্নতি না হলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়।

অনুন্নত দেশগুলি ফুড সিকিউরিটির অর্থ করছে জমির বন্টন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন। 'লাঙল যার জমি তার' তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাদের মতে, ছোট কৃষকের কাছ থেকে জমি নিয়ে বড় বড় কৃষক তৈরি করতে যাওয়া আমাদের মতো দেশে মূর্খামি, সম্ভব নয়। জমি ছোট হলে উৎপাদন কম হবে এই তত্ত্বে অনুন্নত দেশগুলি বিশ্বাসী নয়। কারণ জমি ছোট হলে ছোট কৃষক যাকে বলে ইনটেনসিভ কালটিভেশন (Intensive Cultivation) বা 'নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ' তা করা সম্ভব এবং করে।

সমস্যাটা হচ্ছে আমরা অনেক সময়েই আমেরিকার তত্ত্বে বিশ্বাস করতে আগ্রহী হই। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জমি যত বিশাল হবে তত বেশি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হবে। কারণ বড় জমিতেই অধিক বিনিয়োগ সম্ভব এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশালাকায় জমিতেই করা যায়। অর্থাৎ যত ক্যাপিটালিস্টিক ফার্মিং হবে তত বেশি উৎপাদন বাড়বে।

অন্যদিকে অনুন্নত দেশে এই থিওরিতে বিশ্বাস করা হচ্ছে না। তারা মনে করে জমির সুষম বন্টন ব্যবস্থা দরকার। জমির মালিক ক্ষুদ্র চাষী হলেই উৎপাদন কমবে তা প্রমাণ করা যায় না। কারণ ছোট কৃষকের একমাত্র অবলম্বন একখণ্ড জমি। তাই তার সিকিউরিটির জন্য সে ছোট জমিতেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বেশি ফসল ফলাবে। জমি ছোট হলেই উৎপাদন একর প্রতি কম হচ্ছে তার প্রমাণ সংখ্যাতত্ত্বে করা যায় না। অনেক বিতর্কের পর এখন বলা হচ্ছে 'Agricultural production is neutral to scale' অর্থাৎ জমির আয়তনের সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভরশীল নয়। এটা আমেরিকানরা মানতে

চায় না। ভূমি সংস্কার বা ছোট কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়াই আমাদের মতো দেশের জাতীয় নীতি। সুতরাং এই বিতর্কে চিরকালই 'আমরা' ভারসেস 'তোমরা'। কোনো শেষ কথা বলা যায় না। এই রোম কনফারেন্সে তার ব্যতিক্রম হল না। যে যার নীতিগত স্থান আগলে বসে থাকল।

কনফারেন্সের সমস্যাটা হল শেষের দিকে। অর্থাৎ যখন উন্নত দেশগুলি একসুরে অনুন্নত দেশগুলি থেকে রেশন ব্যবস্থা ক্রমশ তুলে দিতে চাইল। 'বাজার অর্থনীতি'-তে রেশন ব্যবস্থা এবং ভর্তুকি ব্যবস্থার কোনো স্থান নেই। এটাই বড় বড় বড়লোক দেশগুলির বক্তব্য। আর গরিব দেশগুলি বললে, রেশন ব্যবস্থা তুলে দিলে 'ফুড সিকিউরিটি' কথাটির কোনো অর্থ থাকে না। অনুন্নত দেশে গরিবরা আরও গরিব হবে। রেশনিং ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে না এটাই সমস্বরে অনুন্নত দেশগুলি বলতে চাইল। আর ভর্তুকির বেলায় দেখা গেল আমেরিকা ও জাপান কৃষিতে যে ভর্তুকি দেয়, ভারতবর্ষ তা দেয় না।

যা হোক গত ১২ জুন খাদ্য সম্মেলন শেষ হল। গরিব দেশগুলি আর ধনী দেশগুলির মধ্যে আরেক দফা তর্কবিতর্ক। তবে আসল সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল না। দুর্ভিক্ষও দূর হবে না, অনাহারেও মৃত্যু সংবাদ বাড়বে। বলা হচ্ছে অনাহারে মৃত্যু কমবে পৃথিবীতে ২০২০ সালে। অর্থাৎ আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। শবরীর প্রতীক্ষা।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের পর কত মেয়ে হারিয়ে গেল

অর্থনীতিবিদরা আজকাল নানা ধরনের নতুন কথা ব্যবহার করছেন আর তার সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নতির কথা যুক্ত করছেন। যে কোনো সমাজ ব্যবস্থার জনসংখ্যার অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক স্ত্রীলোক। শুধু পুরুষ অর্ধাংশের উন্নতি হলেই দেশের বা জাতির উন্নতি হয় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই এই উন্নতির অংশীদার না হলে সমাজ ব্যবস্থা পঙ্গু হতে বাধ্য। একটা পাখি যদি আকাশে উড়তে চায় তবে দুটো ডানাই তার দরকার। একটি ডানা ভাঙা হলে পাখি আকাশে উড়তে পারবে না। প্রশ্ন উঠেছে আমাদের দুটো ডানাই (স্ত্রী ও পুরুষ) কি যথেষ্ট শক্তিশালী? আরও বলা হচ্ছে হাঁটতে গেলে দুটো পা লাগে। আমাদের কি দুটো পা আদৌ আছে? উন্নতির নাম করে ভারতবর্ষে আজ পঞ্চাশ বছরে যা পেলাম তা কি 'পঙ্গু' উন্নতি? কথাটি উঠেছে Missing Women বা যে স্ত্রীলোকেরা চিরকাল হারিয়ে গেল তাদের নিয়ে।

Missing Women তত্ত্বটি আজকাল সব বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা ব্যবহার করছেন। তার মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য—যেমন অমর্ত্য সেন, পাকিস্তানের মহবুব-উল-হক ও বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনিস প্রমুখ। এখানে বলা দরকার, যেমন অমর্ত্য সেনের নাম নোবেল প্রাইজের জন্য কয়েকবার মনোনীত করা হয়েছে। সেইভাবে এই বছর বাংলাদেশী মহম্মদ ইউনিসের নামও নোবেল প্রাইজ পেতে পারে তার জন্য মনোনীত হয়েছেন। এটা এক ধরনের সামগ্রিকভাবে এশিয়ার বিশেষত এই ভূখণ্ডের গর্বের বিষয়। যদিও বলা দরকার ঠিক এই একটা 'থিওরির' জন্য তাঁরা নোবেল প্রাইজ পেতে পারেন তা নয়। তাঁদের সামগ্রিক অবদানের কথা বিচার করেই তাঁরা যে নোবেল প্রাইজ পাবার উপযুক্ত সেই কথাই বলা হচ্ছে।

Missing Women তত্ত্বটি সরল ভাষায় বোঝানো দরকার। প্রাকৃতিক ও বায়োলজিকাল তত্ত্ব অনুযায়ী এটা আশা করা যায় যে, শিশুরা যখন জন্মায় তখন তার ৫০ শতাংশ ছেলে আর বাকি ৫০ শতাংশ মেয়ে। এটার ব্যতিক্রম খুব একটা আশা করা যায় না কারণ এটি হচ্ছে বিধিনির্দিষ্ট আইন বা প্রাকৃতিক

ভারসাম্যর আইন। একটি পরিবারে এই আইন সত্যি না হতে পারে তবে দেশের সমস্ত পরিবারকে যদি ধরি তবে এই আইন মোটামুটি সত্যি। জন্মের সময় অর্ধেক পুরুষ বা ছেলে এবং বাকি অর্ধেক মেয়ে বা স্ত্রীলোক। অর্থাৎ প্রতি ১০০০ ছেলে প্রতি ১০০০ মেয়ে জন্মলগ্নে আশা করা যায়।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই 'বিধি নির্দিষ্ট আইন' ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে, নেপালে বা পাকিস্তানে সত্যি হচ্ছে না। এইসব দেশে বা যাকে আজকাল দক্ষিণ এশিয়া বলা হচ্ছে তা এই বায়োলজিকাল আইনের উল্টো পথে হাঁটছে। আর পৃথিবীতে অন্যান্য অঞ্চলে এই বায়োলজিকাল আইন সিদ্ধ—কিন্তু ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে বা নেপালে এই আইনটি ব্যতিক্রম।

সমগ্র পৃথিবীতে ১০৬টি মেয়ের জন্য ১০০টি পুরুষ বা যাকে বলা হয় সেক্স রেসিও তাতে দেখা যাচ্ছে ১০০টি পুরুষের তুলনায় অন্তত ছয়টি মেয়ে বেশি। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্থাৎ ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে দেখা যাচ্ছে প্রতি ১০০টি পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৪টি। অর্থাৎ প্রকৃতির যা আইন তার বিপরীত এই অঞ্চলে ছেলেমেয়ের হার।

আমরা যাদের ভারতবর্ষ থেকেও অনুন্নত বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করি সেই সব দেশেও এই ভারতবর্ষের উপমহাদেশের আইনি ব্যতিক্রম প্রযোজ্য নয়।

উন্নত ইউরোপীয়ান দেশে প্রতি ১০৬ জন স্ত্রীলোক প্রতি ১০০ জন পুরুষ, আফ্রিকার সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল যাকে সাব সাহারা অঞ্চল বলা হয় সেইখানে ১০২ স্ত্রীলোক প্রতি ১০০ জন পুরুষ আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, লাওস, কাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, মায়ানমার ও অন্যান্য অঞ্চলে) এটি ১০৭ থেকে ১০১-এর মধ্যে। অর্থাৎ বায়োলজিকাল নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ১০০ জন পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি, কোথাও প্রায় সমান।

আবার ভারতবর্ষে এক বিশেষ ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। ১৯০১ সালের সেনসাসের প্রতি ১০০ জন পুরুষ প্রতি যত স্ত্রীলোক ছিল তার থেকে ১৯৯১ সালের সেনসাসের তা অনেকটাই কম। অর্থাৎ সেক্স রেসিও যা হওয়া উচিত তা ভারতে অন্তত হচ্ছে না। ভারতের অবস্থা ক্রমাবনতির পথে। অথচ ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে জন্মের সময় ১০০ জন ছেলের জন্য ১০০টি মেয়ে আছে। কিন্তু যত বয়েস বাড়ে তত স্ত্রীলোকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

যা হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না তখন বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক হয় মারা যাচ্ছে কিংবা 'হারিয়ে' যাচ্ছে। যদি ধরি ১০০ জন পুরুষ প্রতি ১০০ জন স্ত্রীলোক থাকা অন্তত উচিত ছিল তা হলে প্রায় প্রত্যেক বছরে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ স্ত্রীলোক এই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে 'হারিয়ে' যাচ্ছে। এই ৭ কোটি ৫০ লক্ষ হারানো এক অদ্ভুত ঘটনা। পৃথিবীতে অন্যত্র ঘটছে না বা এই বিপুল আকারে হারাচ্ছে না। অর্থাৎ স্ত্রী ও মেয়েদের প্রতি আমাদের যা অবহেলা তা অন্যান্য রাষ্ট্রে এই আকারে হচ্ছে না।

মেয়েদের প্রতি অবহেলা ও দুর্ব্যবহার অবশ্যই সবটাই মাপা যায় না—যদিও 'হারিয়ে' যাচ্ছে সেটা ঘটনা। কিছু তথ্যর উল্লেখ করা যেতে পারে।

১ থেকে ৪ বছরের মধ্যে পাকিস্তানে ছেলের তুলনায় মেয়েদের মৃত্যু হার অন্তত ১২ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ ও ভারতে ছেলেদের জন্য যা পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় তা মাত্র ৮০ শতাংশ মেয়েদের জন্য বরাদ্দ বাকি ২০ শতাংশ সমান পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। পঞ্জাব যা ভারতে সবচেয়ে ধনীতম রাজ্য সেখানে গ্রামীণ কন্যারা প্রায় ২১ শতাংশ পুরো খাবারই পায় না। ৮৮ শতাংশ মা ছেলেমেয়ে জন্মানোর আগে রক্তাল্পতা রোগে ভোগে। ফলে মা-মৃত্যু হার এই উপমহাদেশে এক বিরাট সংখ্যায়। এক-তৃতীয়াংশ বাচ্চা হবার সময় কোনো শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স বা ডাক্তারের পরামর্শ পায় না।

ভারতবর্ষে অন্তত ৮টি রাজ্যে মেয়ে-শিশু মৃত্যু হার ছেলে-শিশু মৃত্যু হারের থেকে বেশি। আর এই ৮টি রাজ্যে হল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও পঃ বঙ্গ। অবশ্য চারটি রাজ্যে মেয়ে-শিশু মৃত্যু হার ছেলে-শিশু মৃত্যু হারের সমান—আর রাজ্যগুলি হল অন্ধ্র, আসাম, হিমাচলপ্রদেশ ও কেরল।

দারিদ্র্যই কি এর একমাত্র কারণ? তা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। পঞ্জাবের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি আর প্রতি ১০০ জন পুরুষ প্রতি মেয়েদের সংখ্যা ৮৭, হরিয়ানায় ৮৮। আর এই দুই ধনী রাজ্যে মেয়েদের মরবার হার ছেলেদের তুলনায় অন্তত ১০ শতাংশ বেশি।

যেখানে ধনী পঞ্জাব-হরিয়ানার মেয়েদের বাঁচবার সম্ভাবনা ছেলেদের থেকে অনেকটাই কম সেখানে দরিদ্র আদিবাসী সমাজে ছেলে-মেয়ে বাঁচবার সম্ভাবনা একই। অর্থাৎ পঞ্জাব ধনী রাজ্য হতে পারে, সবুজ বিপ্লব আসতে পারে তবে সামাজিক বিপ্লব এখনও আসেনি এবং নারীর প্রতি ব্যবহারে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে।

দেখা যাচ্ছে মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হলে যত উঁচু শ্রেণীতে ওঠে তত বেশি স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাকে বলা হয় Drop-out তা সবচেয়ে বেশি রাজস্থানে আর তৃতীয় স্থানে পঃ বঙ্গ। আর অন্তত ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মেয়ে কোনোদিনই স্কুলে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে না।

অর্থাৎ মেয়েদের যত বয়স বাড়ে তত বেশি সংখ্যায় মরছে। অবহেলা, অশিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়া, সামাজিক অন্যায়, অর্থনৈতিক বৈষম্য—নানা কারণে এটা ঘটছে। ফলে বছরে এই উপমহাদেশে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মেয়েরা 'হারিয়ে' যাচ্ছে।

এই হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের নিয়ে আজকাল চিন্তা-ভাবনা চলছে। সহজ সমাধান নেই। উন্নতির জন্য যে সামাজিক বিপ্লব সর্বস্তরে ও সর্বরাজ্যে আসার কথা ছিল তা আসেনি। আর যতক্ষণ তা না হচ্ছে কয়েক কোটি মেয়ে আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাবে ও যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস আর ভারতে নারীদের ক্ষমতায়ন

প্রত্যেক মার্চ মাসের ৮ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। নারী দিবসের তাৎপর্য সবাই যে বোঝে তা নয়-- কারণ কিছুদিন আগে দিল্লির বস্তিতে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই বস্তিতে নারী দিবস কেন এবং কি মানে তার অর্থ কেউ বোঝেও না বা জানেও না। অর্থাৎ আমরা বাৎসরিক নারী দিবস নিয়ে যে সেমিনার মিটিং মিছিল করি সাধারণ খেটে খাওয়া নারীদের তাতে অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। ভারতের নারী দিবসে অন্তত আমাদের মনে করার দিন যে ভারতে নারীদের অবস্থার উন্নতি হল কিনা। 'নারীদের অবস্থার' উন্নতি না হলে যে আমাদের জনসংখ্যা সীমিত করার সমস্যার সমাধান হবে না অন্তত এই কথাটি আজকে সবাই মানে।

ইউনাইটেড নেশনস বাৎসরিক ভাবে প্রত্যেক দেশের নারীর অবস্থা পুরুষদের তুলনায় কেমন তার সংখ্যা বের করে। নারীরা পুরুষদের 'সমকক্ষ' এখনও যে হয়নি এবং কবে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। নিচে একটি সারণী দেওয়া হল। সারণীটি তৈরি করেছে ইউনাইটেড নেশন্সের আনুকূল্যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। সারণীটি পড়তে হবে যদি পুরুষদের ১০০ হয় তবে ভারতে নারীরা কত নম্বর পাবে। আমরা অনেক সময় বলি কত স্কোর পাবে।

সারণী-১

(Gender) জেন্ডার ভেদ, ১০০ হলে সমান সমান বা পুরুষদের ১০০ হলে নারীদের স্কোর কত?

ভারতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ঃ ছেলেরা যখন ১০০

শিক্ষার হার	৫৬
স্কুলে কত বছর শিক্ষা	৩৪
স্কুলে ভর্তি	৮১
চাকরির সুযোগ	৩৪
আয়ের কত অংশে মেয়েদের অধিকার	৩৩
অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাওয়ার সুযোগ	২
আইনসভায় বা পার্লামেন্টে যাবার সুযোগ	৮

উপরের সারণী থেকে এটা পরিষ্কার, সর্বত্রই Disparity বা জেন্ডার (Gender) ভেদ আছে। আর বিশেষ সংখ্যা তত্ত্বর মধ্যে না গিয়েও বলা যায় দেশের উন্নতি হওয়া মানে জেন্ডার ভেদ কমবে বা Gender Disparity কমবে এমন তথ্য আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ Gender Disparity-র খুব পরিবর্তন হচ্ছে না। হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। আবার অন্য একটি উৎপাত দেখা যাচ্ছে। ভারতের পার্লামেন্টে এবং লেজিসলেচারে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এই নিয়ে এখন কথা উঠেছে যে মেয়েদের জন্য রিজার্ভেশন পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভায় করা হোক। ছেলেদের আপত্তি থাকবেই যেমন মুলায়ম, লালু প্রমুখের। আশ্চর্যের কথা, মায়াবতী ও জয়ললিতারও এতে আপত্তি। কেন এতে আপত্তি তা বোঝা সহজ নয়—তবে রিজার্ভেশন বিল প্রত্যেক পার্লামেন্টে আসে আবার ফেরত যায়। দেখা যায়, মেয়েদের মধ্যেও এই নিয়ে আপত্তি।

নতুন একটা কথা অর্থনীতিতে প্রাধান্য পাচ্ছে—কথাটি হচ্ছে Missing Women অর্থাৎ যে মেয়েরা 'হারিয়ে গেল'। হারিয়ে যাওয়া কথাটির মানে সামান্য হোক বোঝা দরকার।

পৃথিবীতে সামগ্রিক হিসেবে প্রতি ১০০টি পুরুষ মানুষের তুলনায় ১০৬টি নারী। দক্ষিণ এশিয়ায় কয়েকটি দেশে তা সত্য নয়। এখানে ১০০টি পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা ৯৪—ভারতবর্ষে ১৯০১ সালের সেনসাস থেকে প্রত্যেক বছরেই মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। কত মেয়ে হওয়া উচিত ছিল আর কত মেয়ে হারিয়ে গেল—বলা হচ্ছে ৭৪ মিলিয়ন নারীরা হারিয়ে গেছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে। পঞ্জাবের কথাই ধরা যাক। যেখানে পঞ্জাবে ৩ শতাংশ ছেলে উপযুক্ত খাবার পায় না সেখানে মেয়েরা পায় না ২১ শতাংশ। ১ থেকে ৪ বছরের মধ্যে মেয়ে মৃত্যুর হার ছেলের তুলনায় অন্তত ১২ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি।

হারিয়ে যাওয়ার কারণ মেয়েদের যথার্থ খাদ্য দেওয়া হয় না, শিক্ষা দেওয়া হয় না। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয় মা। মেয়েরা যত বড় হয় তত বেশি মৃত্যু হার। বধূহত্যা আমাদের দেশের দৈনিক ঘটনা। এটাকে আমরা বলি মেয়েরা 'অবহেলিত'। মেয়েরা হারিয়ে যাচ্ছে তার কারণ মেয়েরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় 'অবহেলিত'। অবহেলিত কথাটির মানে কি, তা মাপা যায় কি না তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা নানান চেষ্টা করেছেন। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "The missing Women are a telling indictment of the neglect of the basic rights of Women in this region. South Asia stands alone in this hall of shame. In no other region do men outnumber Women." আফ্রিকাতেও না। এই হারানো মেয়ে তত্ত্ব দেশের সামগ্রিক লজ্জা।

ইউনাইটেড নেশনস্ বর্তমানে দু'টি সূচক তৈরি করছে, ভারতে মেয়েদের

অবস্থা তা থেকে কিছুটা জানা যায়। একটি নাম GDI বা Gender Development Index আর অন্যটি GEM বা Gender Empowrment Measure. দুটি সূচকের তফাত আছে। একটিতে আমরা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যের সুযোগ এবং চাকরির সুযোগ কি ধরনের তা মাপি। অন্যান্য অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের GDI অন্তত ২৫ শতাংশ কম। আবার GEM-এ আমরা মাপি সমাজব্যবস্থায়, অর্থনীতিতে এবং রাজনীতিতে মেয়েরা কেমন অধিকার পাচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে যারা সবচেয়ে কম নম্বর পাচ্ছে ভারতবর্ষ তাদের অন্যতম। বর্তমানে GEM-ভারতবর্ষ ০.২৩ আর অনেক উন্নত দেশে ০.৭০ এর উপরে আর অনেক অনুন্নত দেশে ০.৪০-এর কাছাকাছি। অর্থাৎ ক্ষমতার বিন্যাসে ভারতীয় নারীরা বহু পেছনে। বলা হচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 'ক্ষমতায়ন' মেয়েদের এখনও হয়নি। এই ক্ষমতায়ন ছাড়া সামগ্রিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে না তা সবাই স্বীকার করে।

'ক্ষমতায়ন' কেন দরকার তা নিয়ে অসংখ্য তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে আছে নারীদের ক্ষমতায়ন মানে জীবনযাত্রার মানের গুণগত পরিবর্তন। যেখানে এই ক্ষমতায়ন বেশি সেখানে পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানের গুণগত মানেরও পরিবর্তন হয়েছে।

অবশ্য বর্তমানে সেনসাসের আগে নারীদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপরও সম্পর্ক খুঁজে বার করার চেষ্টা হচ্ছে। নারীদের অবস্থার যেখানে উন্নতি হয়েছে সেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে—আর যেখানে সামগ্রিক উন্নতি হয়নি সেখানে জনসংখ্যা বাড়ছে।

ভারতের বোধহয় সর্বপ্রধান সমস্যা জনসংখ্যার স্ফীতি। এত জনসংখ্যা যে তাদের চাকরির সুযোগ, শিক্ষার সুযোগ অথবা স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো কোনো সরকারই দিতে পারছে না।

কিন্তু জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়ছে মাত্র কয়েকটি রাজ্যে সেখানে নারীরা শিক্ষায় এবং ক্ষমতায়নে পিছিয়ে আছে। বর্তমানে ভারতে ২৭টি বা ২৮টি রাজ্য। সব রাজ্যেই সমপরিমাণ লোকসংখ্যা বাড়ছে না। ভারতের জনসংখ্যা বিপুল হারে বাড়ছে তার কারণ 'সাত বোনের' অবস্থা পরিবর্তন হয়নি এবং নারীদের ক্ষমতায়ন এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। এই সাত বোন হল উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা। এই সাতটি রাজ্যই ভারতের ৪৮ শতাংশ বা ৫০ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। তার মানে ভারতে জনসংখ্যা যদি ১০০ বাড়ে তবে বাকি ২১টি রাজ্য বাড়াচ্ছে ৫০ শতাংশ আর শুধু সাতটি রাজ্যই বাড়াচ্ছে ৫০ শতাংশ। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের দিক থেকে ৭টি রাজ্য পিছিয়ে আছে।

এই সাতটি রাজ্যের মধ্যে নারীর অবস্থা কয়েকটি জেলায় ভয়াবহ—আমরা ভদ্রভাবে বলি নারীরা এখানে 'পশ্চাৎপদ'। উত্তরপ্রদেশে এমন জেলার সংখ্যা ৩৭টি, বিহারে ৩১, মধ্যপ্রদেশে ১৮টি, ঝাড়খণ্ডে ১৩টি, রাজস্থানে ১২টি। রাজস্থানে এমন কয়েকটি জেলা আছে যেখানে স্ত্রীশিক্ষার হার ১০ শতাংশের কিছু উপরে। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ স্ত্রীলোক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আর জনসংখ্যা বাড়ার মূল কারণ এই কয়েকটি জেলা এবং কয়েকটি রাজ্য। এই সাতটি বোন পশ্চাৎপদ বলে ভারতের জনসংখ্যার এই স্ফীতি।

মার্চ মাসে নারী দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। অনেক তত্ত্ব কথা মিটিং-মিছিল-সেমিনারে আলোচিত হবে। অথচ আলোচনাটাই শেষ নয়, দ্রুত পরিবর্তন দরকার তা আর হয়ে উঠছে না। অবস্থার পরিবর্তন হত যদি নারী-পুরুষ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ ও সুবিধা ভেদাভেদ অন্তত দূর হত। তা হয়নি। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে হারে হবে তা অকল্পনীয়। এই সাধারণ কথাটি সবাই বোঝে, কেন জানি অনেক রাজনীতিবিদ নেতারা বোঝেন না। বা বুঝেও বুঝতে চান না। আইনি ব্যবস্থা শম্বুক গতিতে চলে। ফলে কোনো প্রতিকার ভারতের বিশেষ কয়েকটি অংশে আসছে না। আপাতত বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

আড়ালে অবস্থিত অসংখ্য স্ত্রীলোক

অর্থশাস্ত্রে নতুন একটা কথা আজকাল প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে—কথাটি ইংরেজিতে ইনভিজিবেল উইমেন (Invisible Women) বা পর্দার আড়ালে অসংখ্য নারী। যাঁদের কথা কাগজে ওঠে না, টিভিতে দেখানো হয় না, সেই সব নারী ভারতের আসল ভাগ্যবিধাতা। এই ভারতের ভাগ্যবিধাতা যাঁরা তাঁদের অবস্থার উন্নতি না হলে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হবে না। এটাই 'ইনভিজিবেল উইমেন' তত্ত্বের আদি কথা। মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঢাকঢোল পিটিয়ে সর্বত্র পালন করা হয়। কিন্তু যাঁরা পালন করেন তাঁরা প্রায়শ ভিজিবেল উইমেন। যাঁদের আমরা দেখি, যাঁরা সর্বত্রই বক্তৃতা দেন, তাঁরা কিন্তু ইনভিজিবেল উইমেনের অবস্থা নিয়ে অশ্রুপাত করেন, কাজের কাজ কিছু করেন না।

ভিজিবেল উইমেন ও ইনভিজিবেল উইমেন ভেদাভেদটা তৈরি হয়েছে ইউনাইটেড নেশনস-এর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায় দেখা যাচ্ছে ক্ষমতায় এবং চূড়ায় বসে আছেন নারী প্রধানমন্ত্রী। নারী প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সাধারণ অসংখ্য নারীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। রিপোর্টের সারাংশ অথবা চুম্বক দেওয়া যাক। থিওরিটার নাম হচ্ছে 'It is not enough to have woman Prime Minister.'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যা ঘটেছে অন্যত্র ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ঘটেনি। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নারী। বস্তুত, শ্রীলঙ্কায় শুধু প্রধানমন্ত্রী স্ত্রীলোক ছাড়াও দেশের প্রেসিডেন্টও এক সময়ে ছিলেন নারী। ভারতবর্ষে এককালে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মহিলা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন প্রায় ১৫ বছর। পাকিস্তানেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেনজির ভুট্টো, প্রায় পাঁচ বছর।

যে সব দেশে প্রধানমন্ত্রী মহিলা, সেই সব দেশে দেখা যাচ্ছে সাধারণ স্ত্রীলোকদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। সার্ক দেশগুলিতে এখনও এক-

তৃতীয়াংশ মহিলা অশিক্ষিত। অর্ধেক স্ত্রীলোক স্কুলে নাম লেখায় না। কিছুদিন বাদে ছেড়ে চলে যায়। সার্ক দেশগুলিতে দেখা যাচ্ছে, মেয়েরা গড়ে ১৪ মাসের বেশি স্কুলে থাকে না। স্কুল ছাড়া বা যাকে বলা হচ্ছে ড্রপ-আউট মেয়েদের মধ্যে বেশি এবং সংখ্যাটা আতঙ্কজনক। প্রায় প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে ৬০ শতাংশ।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তাও নয়, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে আছে। মাত্র ৩৯ শতাংশ বিবাহিত স্ত্রীলোক ফ্যামিলি প্ল্যানিং গ্রহণ করেছে। ফার্টিলিটি রেট অশিক্ষার কারণে খুব বেশি। প্রায় ৪.২ প্রত্যেক বিবাহিত স্ত্রীলোক প্রতি।

কর্মক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে আছে। মাত্র ৩৬ শতাংশ স্ত্রীলোক কোনো অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত। অর্থনীতিতে যুক্ত উন্নত দেশে যেখানে ৫০ শতাংশ।

দেশের যে জাতীয় আয় তার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মেয়েদের দান। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ৪/৫ অংশ পুরুষরা করে আর ১/৫ করে স্ত্রীলোকরা। ৩ শতাংশ স্ত্রীলোক অফিস, কোর্টকাছারিতে দেখা যায়, যেখানে পুরুষদের সংখ্যা ৯৭ শতাংশ। অথচ আফ্রিকার সাহারার নিচে যেটা সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল, সেখানে ফর্মাল সেক্টরে মেয়েদের অনুপাত ১০ শতাংশ, লাতিন আমেরিকায় ২০ শতাংশ, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ২৭ শতাংশ।

আরও সবচেয়ে আশ্চর্য, যেখানে মেয়েরা প্রধানমন্ত্রী সেখানে পার্লামেন্ট ও লেজিস্‌লাচারে মেয়েদের সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশ অথচ স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশে অর্থাৎ সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়েতে মেয়েদের অনুপাত আইন পরিষদে ৩৬ শতাংশ। ভারতের থেকে পাকিস্তানের অবস্থা আরও খারাপ। মাত্র ১.৬ শতাংশ আইন পরিষদে পাকিস্তানে মহিলা।

এইসব তথ্য থেকে একটি তত্ত্ব বের করা হচ্ছে। তত্ত্বটি হচ্ছে মেয়েরা প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হলেও সামগ্রিকভাবে মেয়েদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। উপরতলায় পরিবর্তন হলেই নিচের তলায় কোনো পরিবর্তন সহজে আসে না। এর কারণ কি? এটা হতে পারে, স্ত্রীলোকরা প্রধানমন্ত্রী হলেও তাঁরা মেয়েদের জন্য কিছু করতে পারেন না। কারণ, তাঁরা 'পুরুষ কালচার' গ্রহণ করে ফেলেছেন। আবার এটাও হতে পারে, মেয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেই মেয়েদের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা কোনো নেতৃত্ব দিতে পারেন না বা নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। আবার এটাও হতে পারে ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে 'পুরুষালী কালচার' তাঁরা গ্রহণ করেন। আবার নিচু স্তরে পঞ্চায়েত ইত্যাদিতে দেখা যাচ্ছে যে, এক-তৃতীয়াংশ সিট মেয়েদের জন্য রিজার্ভ করা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের পেছনের পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত। বিহারের রাবড়ি দেবীকে বলা হয় 'প্রক্সি' মুখ্যমন্ত্রী। রাবড়ির আড়ালে তাঁর স্বামীই আসল মুখ্যমন্ত্রী। তত্ত্বটি হচ্ছে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় মেয়েদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করলে কিছু Visible Women পাব। কিন্তু

Visible Women যাঁরা তাঁরা Invisible Women-দের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করছেন না বা হয়তো করতে পারছেন না। এটি বর্তমানে বাস্তব। ভবিষ্যতে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হতেই পারে।

ভারতে যেটা সমস্যা সেটা মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। গত ১০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ৬০০০ মিলিয়ন হয়ে গিয়েছে। আর গত ১০০ বছরে ভারতের জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়ন থেকে ১০০০ মিলিয়ন হয়েছে। অর্থাৎ গত ১০০ বছরে পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যা যেখানে তিনগুণ বেড়েছে, ভারতে বেড়েছে পাঁচগুণ। মেয়েদের মধ্যে যত বর্তমানে অশিক্ষিত আছেন তা ১৯৪৭ সালের ভারতের জনসংখ্যার প্রায় সমান।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের জনসংখ্যা ২০০১ সালে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। প্রত্যেক বছরে আমরা ১৮ মিলিয়ন জনসংখ্যা ভারতে বাড়াচ্ছি। অস্ট্রেলিয়া ভারতের আয়তনের তুলনায় অন্তত তিনগুণ বেশি। অস্ট্রেলিয়ার যা জনসংখ্যা বর্তমানে আছে তা প্রত্যেক বছরে ভারতে বাড়ছে।

মূলত এই ১৮ মিলিয়ন বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান বেশি বাড়ছে না। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমাদের গড় উন্নতি কোনো সময়ে ৩.৫ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ বেশি বাড়েনি। রসিকতা করে বলা হয়, 'এটাই হিন্দু রেট অব গ্রোথ'। অর্থাৎ যেখানে হিন্দুরা থাকে, সেখানে রেট অব গ্রোথ হবার সম্ভাবনা নেই। উন্নতি একটা হারের বেশি বাড়াতে পারছি না। যতদিন 'হিন্দু রেট' বজায় থাকবে ততদিন দেশে দারিদ্র ও বেকারি দূর হবার সম্ভাবনা নেই। যেখানে কোরিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলির উন্নতির হার ১০ থেকে ১২ শতাংশ, সেখানে জনসংখ্যা বিস্ফোরণে আমাদের উন্নতির হার ৩ থেকে ৪ শতাংশ—অর্থাৎ 'হিন্দু রেট অব গ্রোথ'।

এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের নানা সমস্যা। শত সহস্র সমস্যার মধ্যে একটি হচ্ছে ইকোলজিক্যাল (Ecological) বা পরিবেশ দুর্দশা। যত জনসংখ্যা বাড়ছে, তত বনভূমি ছোট হচ্ছে। ১৯৯০ সালে বনভূমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল ৬০ শতাংশ। ২০০০ সালে তা বড়জোর ২০ শতাংশ। কারোর মতে, আরও কম, ১২ শতাংশ। অর্থাৎ জনসংখ্যা যত বাড়বে, কৃষি ও বাসের প্রয়োজনে জমির চাহিদা বাড়বে। জমি যেহেতু সীমিত তাই বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। বনাঞ্চল যত ধ্বংস হচ্ছে, তত বৃষ্টির আকস্মিকতা, ভূমিক্ষয়, সাইক্লোন, বন্যা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ঘন ঘন হতে বাধ্য। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়? নানান মুনির নানান মত—তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, মেয়েদের শিক্ষার হার যদি না বাড়াতে পারি তবে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কোনো সমাধান নেই।

জনসংখ্যা কমানো সম্ভব হবে যদি মেয়েদের শিক্ষার প্রসার হয়। ধর্মের

সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের কোনো সম্পর্ক নেই। মালয়েশিয়া মুসলিম প্রধান এবং টিউনিশিয়াও তাই। এই দু'দেশে স্ত্রীশিক্ষার হার যেহেতু বেশি তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম।

অসংখ্য Invisible Women বা পর্দার আড়ালে যাঁরা আছেন, তাঁরাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা যদি পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত করেন তবেই ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফ্যামিলি প্ল্যানিং কোথাও সাফল্য লাভ করেনি। যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার কম সেখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সাফল্য লাভ করেনি। জার্মানিতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং জাতীয় সরকারি কোনো প্রকল্প নেই অথচ জার্মানিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত বা আমরা যাকে বলি Stable অর্থাৎ বাড়ছে না। তার কারণ স্ত্রীশিক্ষার হার জার্মানিতে প্রায় ১০০ শতাংশ।

যে নারীরা ভারতে গ্রামগঞ্জে, শহরে বাস করেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 'লোকদেখানো' বা চোখ ভোলানো কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনও স্বাধীনতার পরে ১০০টি মেয়ের মধ্যে ৫০ জন তথাকথিত শিক্ষিত। অর্থাৎ ৫০ জন বা শতাংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

যত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে তত নানান ধরনের পুরনো প্রথা বা যাকে বলে রক্ষণশীলতা প্রাধান্য পাবে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্ক একটি অদ্ভুত তত্ত্ব দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়ালে শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই সম্ভব হবে না, কৃষির উৎপাদিকা শক্তিও বাড়বে। অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা বা যাকে বলা হয় প্রডাক্টিভিটি তা রক্ষণশীল সমাজে বাড়তে পারে না। কারণ, নতুন টেকনোলজি তারা গ্রহণ করতে পারে না। নারীরা যদি শিক্ষার আলো পান, তবে নতুন নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হবেন। কৃষির উৎপাদন শক্তি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। অর্থাৎ যাকে আমরা 'হিন্দু রেট অব গ্রোথ' বলছি তা সম্পূর্ণ দূর হবে যদি গ্রামে মেয়েদের আমরা শিক্ষিত করতে পারি। শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, উৎপাদন ক্ষমতাও মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অথচ এই ৫০ কোটি স্ত্রীলোকদের প্রতি আমরা যোজনায় বা প্ল্যানিংয়ে তেমন একটা নজর দিইনি। পর্দার আড়ালে অসংখ্য স্ত্রীলোক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যেহেতু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সেইহেতু ভারতের সামগ্রিক সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। শুধু বিনিয়োগ বা অর্থ ঢাললেই উন্নতি হয় না। ভারতবর্ষে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও আমরা অর্থনীতিতে দুর্বল। দরকার ছিল Invisible Women-দের অবস্থার উন্নতি করা। সেই প্রতিজ্ঞা যদি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে না নিতে পারি, তবেই এই দিবসটি বাৎসরিক উৎসব মাত্র—যাঁরা মুখ্যত Visible তাঁরাই করবেন।

সেনসাস প্রমাণ করছে 'নারীমুক্তি' এখনও বহুদূরে

দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে, নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে মেয়েদের অবস্থার যা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সুযোগ-সুবিধা বিশেষ বাড়ছে না, তাই এই সেনসাসে আবার প্রমাণিত হয়েছে।

প্রমাণ নানাভাবে হতে পারে তবে যে প্রমাণ সর্বজনগ্রাহ্য তা হচ্ছে সেনসাসে স্ত্রী-পুরুষ হার বা যাকে বলা হচ্ছে কি ধরনের সেক্স রেসিও। পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীদের সংখ্যা যত কম হবে তত ধারণা করা যেতে পারে স্ত্রীলোকদের অবস্থার পরিবর্তন বিশেষ হচ্ছে না।

সেক্স রেসিও বা স্ত্রী-পুরুষ হার কেমন তা জানবার জন্য একটি সারণি দেওয়া হলো।

সারণী-১

প্রতি হাজার পুরুষ প্রতি কত স্ত্রীলোক ভারতে বিভিন্ন সেনসাসে—

সাল	স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষ প্রতি
১৯১১	৯৬৪
১৯২১	৯৫৫
১৯৩১	৯৫০
১৯৪১	৯৪৫
১৯৫১	৯৪৬
১৯৬১	৯৪১
১৯৭১	৯৩০
১৯৮১	৯৩৪
১৯৯১	৯২৭
২০০১	৯৩৩

অর্থাৎ ওপরের সারণী থেকে এটা বলা যায়, প্রতি হাজার পুরুষ প্রতি

স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ১৯১১ সালে যা ছিল ২০০১ সালে তা হয়নি। হয়তো এটা বলা যেতে পারে, ২০০১ সালে অবস্থা ১৯৯১ সালের তুলনায় সামান্য উন্নতি হয়েছে। তবু আগেকার অবস্থায় আমরা পৌঁছাতে পারিনি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের দেশে ১০০০ প্রতি মেয়েদের সংখ্যা কম কেন? আর ক্রমশ কমছেই বা কেন? উত্তর হচ্ছে মেয়েদের প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনা ক্রমশ বাড়ছে। আরও বিশদভাবে বলা যায় যে, ভারতে উন্নতি যত হচ্ছে পণপ্রথা, জাতীয় কুসংস্কার কমার বদলে বাড়ছে। যেহেতু মেয়ের বিয়েতে পণ দিতে হবে অতএব জন্মলগ্নেই ভ্রূণ হত্যা, শিশু মেয়ে হত্যা, বালিকা হত্যা এবং বধূ হত্যা নিত্য ঘটনা। আর পণপ্রথা কি কমছে? আইন আছে পণ নেওয়া অপরাধ। কিন্তু সেই আইন কোনোদিনই বলবৎ হয় না—পণ দিতে হবে বলে ভ্রূণ হত্যা নিত্য ঘটনা। প্রতি ১০১ মিনিটে একটি বধূ হত্যা।

নতুন টেকনোলজিকে অনেক Woman Friendly বলে ভাবেন। তার উল্টো পিঠও আছে। টেকনোলজি যত উন্নত হচ্ছে ততই আগের থেকে জানা যাবে যে, শিশু পুত্র হবে, না কন্যা হবে। নতুন টেকনোলজি এমনিওসেনটিস, আলট্রা-সাউন্ড এবং অন্যান্য টেকনোলজির কল্যাণে জানা যায় যে, মেয়ে হবে বা ছেলে হবে। যদি মেয়ে হয় তবে ভ্রূণ হত্যা খুবই সাধারণ। বলা হচ্ছে সমগ্র হিন্দি বলয়ে, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে অসংখ্য ক্লিনিক। এই ক্লিনিক ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। আইনসিদ্ধ না হলেও মেয়ে হত্যা বছরে কয়েক কোটি নাকি হচ্ছে।

হরিয়ানা ও পঞ্জাব দু'টি উন্নত রাজ্য। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় এই রাজ্যে ভারতের প্রায় সব রাজ্য থেকে বেশি। অর্থাৎ উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এই উন্নতি মেয়েদের সপক্ষে যায়নি। হরিয়ানা প্রতি ১০০০ পুরুষ প্রতি মেয়েদের সংখ্যা ৮৬৯ আর পঞ্জাবে ৮৮৬, দিল্লিতে ৮১৩, চণ্ডীগড়ে মাত্র ৭৬৩ স্ত্রীলোক। সমগ্র হিন্দি বলয়ে একই অবস্থা। তথাকথিত উন্নতি হচ্ছে অথচ মেয়েদের সংখ্যা কমছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে ভারতে সবচেয়ে 'উন্নত' রাজ্য কোন্‌টি। কেরলে প্রতি হাজার পুরুষ প্রতি মেয়েদের সংখ্যা ১০৫৪ আর মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি এটাই সমস্ত উন্নত দেশের নিয়ম। আমেরিকা, জাপান ও রাশিয়ায় প্রতি হাজার পুরুষে মেয়েদের সংখ্যা বেশি ১০৫০ থেকে ১০৭০ পর্যন্ত। কারণ বলা হয় বায়োলজিক্যালি মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় গড়ে অন্তত তিন বছর বেশি বাঁচে।অর্থাৎ পৃথিবীতে ধরেই নেওয়া হয় Life Expentary ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেশি। ভারতে তার ব্যতিক্রম। ভারতে মেয়েদের সংখ্যা দ্রুতহারে কমছে। চীন, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশেও স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যা অনেকটা কাছাকাছি। এর থেকে আমরা এক

ধরনের বিচারে আসতে পারি, তা হচ্ছে ভারতবর্ষে মেয়েদের প্রতি আমাদের 'দৃষ্টিভঙ্গি' এখনও অনেক জায়গায় মধ্যযুগীয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সেখানে পুরুষদের শিক্ষার হার ২০০১ সালে প্রায় ৭৫ শতাংশের কিছু বেশি আর মেয়েদের শিক্ষার হার ৫৪ শতাংশ। অর্থাৎ মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক কম শিক্ষিত। আশ্চর্য কথা কেরল, মিজোরাম, মণিপুরে বা তামিলনাড়ুতে মেয়েদের শিক্ষার হার আর পুরুষদের শিক্ষার হার প্রায় সমান। যা প্রভেদ দেখা যাচ্ছে তা নিতান্তই প্রান্তিক।

অথচ ভারতের উত্তরাঞ্চলে তা সত্যি নয়। বিহারে স্ত্রীশিক্ষার হার মাত্র ৩৫ শতাংশ—অর্থাৎ সর্বভারতীয় গড় থেকে বিহারের পুরুষ শিক্ষার হার থেকে অন্তত ২০ পয়েন্ট কম। ২০০১ সালে সেনসাসে জানা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে স্ত্রীশিক্ষার হার ৫০ শতাংশ জেলায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে। অর্থাৎ ৮০ শতাংশ স্ত্রীলোক এখনও অশিক্ষিত।

ওড়িশায় জানা যায় যে, বাড়িতে ছেলে বা মেয়ের অসুখ হলে ছেলেকে ডাক্তার দেখানো হয়, মেয়েকে দেখানো হয় না। ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠতে গেলে প্রায় ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ মেয়ে স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

সংখ্যাতত্ত্বর উল্লেখ না করেও বলা যায় যে, ভারতে মেয়েদের মৃত্যুর হার, শিশু বিশেষত মেয়ে শিশু মৃত্যু হার পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে বেশি।

এখন অর্থনীতিবিদরা নতুন একটি জিনিসের ওপর জোর দিচ্ছেন। তাঁদের মতে, ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ধারণা ছিল উন্নতি মানে বিনিয়োগ করা। অর্থাৎ যত টাকা ঢালা হবে তত উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। এখন এই থিওরি লোকেরা আর বিশেষ বিশ্বাস করে না।

দুর্গাপুরে উন্নতির জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল। অথচ পাশের পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ায় সেই উন্নতি পৌঁছাল না। তার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে উন্নতি বিনিয়োগ করলে হচ্ছে না। উন্নতির জন্য 'X-factor' দরকার, অর্থাৎ এমন কিছু আগে যা ভাবা হয়নি। সেই উপাদানটা হচ্ছে স্ত্রীদের অবস্থার উন্নয়ন। যে রাজ্যে বা রাষ্ট্রে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি হয়নি শত-সহস্র অর্থ ঢাললেও সেই জায়গার উন্নতি হচ্ছে না, লোকসংখ্যা সীমিত করা যাচ্ছে না। শুধু টাকা ঢাললেই উন্নতি হয় না। স্ত্রীদের অবস্থার উন্নতি মানে অর্থনৈতিক উন্নতি। এবং এর সপক্ষে বহু তথ্য ও তত্ত্ব আজ তৈরি করছেন অমর্ত্য সেন, মহবুল হক হিকস্ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদরা। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এখন সব ছেড়ে ছুড়ে নতুন তত্ত্ব দিচ্ছে যে, মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ছাড়া Trickle-Down থিওরি কার্যকরী হচ্ছে না। অর্থাৎ উপরতলায় বা Creamy Layer-এর উন্নতি নিচুতলায় চুঁইয়ে পড়ছে না।

ভারতবর্ষেও উন্নতির খাতে শত-সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে—

অথচ দারিদ্র দূর হয়নি। তার কারণ আমরা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ অর্থাৎ স্ত্রী লোকদের অবস্থার উন্নতি তেমন একটা করিনি।

২০০১ সালে সেনসাস প্রমাণ করছে আমাদের উন্নতির মডেল এবং টেকনোলজি মেয়েদের সপক্ষে প্রযোজ্য হয়নি। ২০০১ সালের সেনসাসের নামকরণ করা হচ্ছে Anti-Female বা মহিলাদের পরিপন্থী। উন্নতির নতুন মডেল যা ভাবা হচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে ভারতের মতো দেশে স্ত্রীদের অবস্থার উন্নতি ছাড়া সামগ্রিক উন্নতি হতে পারে না।

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বিশ্বায়ন

১ এপ্রিল ২০০2২ সাল থেকে ভারতের দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হবে। ১ এপ্রিল আবার অন্যকে বোকা বানাবার দিন। তাই মনে হতেই পারে যে এই দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশকে আবার বোকা না বানায়।

দেখতে দেখতে ১০টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হয়ে গেল। দেশের উন্নতি কতখানি সত্যি হয়েছে তা নিয়ে অনেকে চিন্তিত। রাশিয়া মাত্র তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপার পাওয়ার হয়ে যায়। চীন দেশও সুপার পাওয়ার হবার দোরগোড়ায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দ্রুত উন্নতি হয়েছিল বা হয়েছে তা অনেকে মনে করে। যদিও চীন বা তৎকালীন রাশিয়ায় ঘনঘন নির্বাচন, বহু পার্টি আমাদের জাতীয় জোট প্রথা ছিল না। ভারতে এগুলো থাকাতে অসুবিধা হয়েছে তা মানতে অনেকের আপত্তি। মোট কথা ভারতে উন্নতি হচ্ছে না এটা সত্যি নয়, তবে খুব দ্রুত উন্নতি হয়নি বা হচ্ছে না। খুব স্পষ্ট করে বললে বলা উচিত যা উন্নতি হবার কথা তা আমরা লক্ষ্য করছি না।

অথচ রাশিয়া বা চীন দেশ বাদ দিয়েও বলা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যা উন্নতি হয়েছে আমরা তাও করে উঠতে পারিনি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দঃ কোরিয়া ২০ বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করেছে। ব্রিটেনের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হতে ১০০ বছরের উপর সময় লেগেছিল। আর ভারতে ১৯৫১ সালে যোজনার প্রথম যুগে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে ৩০ বছরে মাথাপিছু আয় ভারতে দ্বিগুণ করা হবে এবং বেকারি সমস্যার সমাধান ১৯৭১ সালের মধ্যেই করা হবে। কিন্তু মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ তো হয়নি বরং সামান্য ইনইক্যুয়ালিটি অফ্ ইনকাম ভারতে ক্রমশ বাড়ছে। বেকারি সমস্যা তীব্র। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, হেরফের হয়েছে আর আয়ের সমতা বাড়ার বদলে কমেছে। অর্থাৎ যোজনাতে সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়নি। প্রশ্ন আসতেই পারে, এটি কি যোজনার দোষ; না যোজনা যারা কার্যকর

করছে তাদের নির্বুদ্ধিতা। প্রশ্ন উঠতে পারে, দশটি যোজনা করার পরে কেন ভারতে ৩৬ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে আসবে আর ৫ কোটি লোক অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটাবে। কোথায় যেন গোলমাল।

পরিকল্পনায় আমাদের বর্তমানে প্রচুর গলদ। গলদ থাকলে তার সমাধান সূত্র বের করা উচিত ছিল। কিন্তু যোজনায় কোনো গলদ দূর করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ ১০টি যোজনার পরেও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নিরক্ষর ভারতে। পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু হারে আমরা অবশ্য প্রথম নই তবে খুব গর্ব করার কিছু নয়। অর্থাৎ গলদগুলো আছেই।

এই অবস্থায় ১০ম পরিকল্পনাতে অনেকের আশা। ভাবা হচ্ছে অতীতের ভুলত্রুটি দূর করে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আবার নতুন করে উন্নতির পরিকল্পনা করব। তবে আশ্চর্য এই যে ১০ম পরিকল্পনাটা যে কি তা ভালো করে জানা যাচ্ছে না। একবার একটি ড্রাফ্ট বের করা হচ্ছে পরমুহূর্তেই তার আমুল পরিবর্তন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে 'খাঁটি যোজনা' শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। হয়তো ১ এপ্রিল কিছু একটা বের করে লোকদের জানানো হবে। ১০ম পরিকল্পনা নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব। স্বচ্ছতা এই বিষয়ে কেন আনা হচ্ছে না তাই নিয়ে নানান মুনির নানান মত।

ধারণা করা হচ্ছে বিশ্বায়নের চাপে যোজনা হবে একটি নখ-দন্তহীন ডক্যুমেন্ট। বিশ্বায়নের সঙ্গে যোজনা খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। বিশ্বায়ন যত বাড়বে যোজনার উপকারিতা ততই কমবে। আর যারা বিশ্বায়ন চায় তারা যোজনা ভারতে বন্ধ করে দিতে চায়। বর্তমানে যোজনা কোনো সমাধান নয় এমন অভিমত প্রায়শ প্রকাশ করা হচ্ছে। বস্তুত যোজনা কমিশনের সদস্য যারা তারা অনেকেই দেশে কোনো যোজনাই পছন্দ করছে না। তারা যোজনা কমিশনের সদস্য হয়েই বলছে ১ এপ্রিলই দেশের যোজনা ও পরিকল্পনার শেষ তা সাধারণ লোকদের জানিয়ে দেওয়া হোক।

১ এপ্রিল যোজনা শেষ অবশ্যই হবে না কারণ যোজনা ও পরিকল্পনা নিয়ে এখনও লোকেরা আশা রাখে। তারা বিশ্বায়ন ও যোজনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখতে চায়।

বিশ্বায়ন ও যোজনা কেন পরস্পরবিরোধী তার মানেটা বোঝা উচিত। যোজনা ও পরিকল্পনা মানে রাষ্ট্র দেশের উদ্দেশ্য ঠিক করে দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে পরিকল্পনায় টার্গেট ঠিক করা হয়। আর টার্গেট যাতে সিদ্ধ হয় তার জন্য রাষ্ট্র একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। কোথায় বিনিয়োগ করা উচিত এবং কতটা বিনিয়োগ করা উচিত তা জনগণের তরফ থেকে রাষ্ট্র এবং রাজ্যই ঠিক করে দেয়। এখানে মুনাফা একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। টার্গেট তৈরি করা হয় দেশের সামগ্রিক স্বার্থ মাথায় রেখে। গণতন্ত্রে দেশের স্বার্থ কি তা ঠিক করবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বা তাদের প্রতিভূরা। যোজনা মানে সব

অর্থনীতির কেন্দ্রে রাষ্ট্রই প্রধান নায়ক।

বর্তমানে বিশ্বায়ন ও উদারনীতি যা আমরা বর্তমানে গ্রহণ করেছি তাতে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ খর্ব করার কথা। রাষ্ট্র দেশের উদ্দেশ্য ঠিক করবে না। রাষ্ট্র বিনিয়োগ করবে না। রাষ্ট্র বেকারি দূর করবে না। রাষ্ট্র হবে বড়জোর রেফারি। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মুনাফার জন্য লড়াই করছে এবং করবে। রাষ্ট্র হবে নিরপেক্ষ এবং আইন মেনে চলবার জন্য রেফারিগিরি করবে। উদ্দেশ্য ঠিক হবে বাজারে। বাজার হবে মুক্ত। মূল্য ওঠানামায় বোঝা যাবে কোন্ জিনিসটা দরকারি আর কোন্ জিনিসটা নয়। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে প্রাইস মেকানিজম।

'পরিকল্পনায় যেহেতু রাষ্ট্রকে শিল্প নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই হেতু দেশের স্বার্থে বিদেশী দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র টেরিফ ইত্যাদি কমাবে। নিজের দেশের শিল্পকে বাঁচাবার জন্য যোজনায় রাষ্ট্রকে হতে হবে প্রোটেকশনিস্ট অর্থাৎ বিদেশী শিল্পদ্রব্য আমদানি করে আমাদের দেশীয় শিল্প যদি ধ্বংস হবার উপক্রম হয় তবে রাষ্ট্র হবে 'প্রোটেকশনিস্ট'। বস্তুত প্রোটেকশনিস্ট হওয়াই যোজনার একটি মূল লক্ষ্য।

কিন্তু বিশ্বায়ন মানে মুক্ত বাণিজ্য অথবা যাকে বলি ফ্রি ট্রেড। বিদেশীদের দেশে আসতে দিতে হবে। তাতে দেশীয় শিল্প নষ্ট হলেও করার কিছু নেই। বাঁচতে গেলে দেশীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকতে হবে। প্রতিযোগিতা এবং আরও প্রতিযোগিতা বিশ্বায়নের মূলমন্ত্র।

কিন্তু যোজনার মূল কথাই যে নানান ঐতিহাসিক কারণে অনুন্নত দেশে প্রতিযোগিতা সমানে সমানে হয় না। এই প্রতিযোগিতা হয় অসম। এই অসম প্রতিযোগিতা থেকে দেশকে বাঁচাতে গেলে বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ হবার কথা। যোজনা কমিশন তাই নানাভাবে দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে তা আমরা করতে পারব না।

তা হলে ২০০২ সালে যোজনা কমিশন ঠিক কি করবে আর ১০ম পরিকল্পনাই বা কি হবে? হওয়াটা যে সোজা নয় তা বর্তমানে যোজনা কমিশনের মেম্বারদের তর্কবিতর্ক থেকে পরিষ্কার।

২০০২ সালে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য নয়। জাতীয় উদ্দেশ্য 'ধনতন্ত্র' এবং 'প্রতিযোগিতা'। তাই ১০ম যোজনা হতে চলেছে ধনতন্ত্রের জন্য যোজনা। যাকে বলা হচ্ছে প্ল্যানিং ফর দ্য ক্যাপিটালিস্ট।

খোলসা করে বলতে গেলে বলতে হয় এখন বেকারি দূরীকরণ এমনকি দারিদ্র্য দূরীকরণও আমাদের যোজনার লক্ষ্য নয়। যোজনাটা এমন হবে যাতে বেসরকারি শিল্প মহল বারবার সুযোগ পায়। অর্থাৎ যোজনায় 'সামগ্রিক' প্ল্যানিং বাদ দিয়ে ক্রমশ আমরা 'সিগন্যাল' প্ল্যানিং-এর দিকে যাচ্ছি। অর্থাৎ

আমরা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানদের জন্য কিছু নির্দেশিকা বা সিগন্যাল পাঠাব। কি তাদের করা উচিত এবং কোন্‌টা করা উচিত নয়। ডু'স এবং ডোন্ট ডু'স (Do's and Don't do's) তবে সব সিগন্যাল বেসরকারি শিল্প মানবে কিনা সন্দেহ। আর যদি না মানে তবে রাষ্ট্রের বা যোজনা কমিশনের কিছু করার নেই। অর্থাৎ আগে ছিল টোটাল প্ল্যানিং এখন হবে ফরাসি কায়দা— ইনডিকেটিভ প্ল্যানিং।

মন্দের ভালো। লোকেরা ভেবেছিল যোজনা বুঝি এবার উঠে যাবে। এখনও উঠে যায়নি তবে পরিকল্পনা হবে একেবারে অন্য ধরনের, অন্য মানের। বিশ্বায়নের যুগে এটা আমাদের মানতে হবে।

যোজনা মানে রাষ্ট্রের অধিকার সর্বত্র। আর বিশ্বায়ন মানে উল্টোটা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। যোজনা একটা সাইকোলজি আর বিশ্বায়ন বিপরীত সাইকোলজি। এই দুয়ের মিলনে যে দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তা হবে হাতি আর তিমির সন্ধি অথবা হাতিমি। কিংবা হাঁস আর সজারুর মিলন বা হাঁসজারু।

দারিদ্র্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা থাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ কথাটি তর্কবহুল

দেশের পরিকল্পনাগুলো সাফল্য লাভ করছে কিনা তা জানার অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে কতটা দারিদ্র্য আমরা কমাতে পেরেছি। এইবার নবম পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নে বলা হচ্ছে যে, দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা অনবরত কমছে। প্রত্যেক যোজনায় প্রায় ২ থেকে ৩ শতাংশ। সরকারিভাবে বলা হচ্ছে, ১৮ থেকে ২০ শতাংশ লোক ভারতবর্ষে দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনাগুলো সফল হয়েছে।

দারিদ্র্য ক্রমশ কমছে সরকারি এই সংবাদ অনেকেই গ্রহণ করতে রাজি নয়। উল্টোটাই আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হয় এবং বেসরকারি মতে ভারতবর্ষে দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়ছে। বেসরকারি মতেও দেখা যাচ্ছে, দেশে কত দারিদ্র্য আছে তাই নিয়ে বিস্তর মতভেদ। গত দুই-তিন বছরে কয়েকটি সমীক্ষা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, একজনের সংখ্যা থেকে অন্যজন সম্পূর্ণ পৃথক।

সাম্প্রতিককালে যে কয়েকটি সমীক্ষা হয়েছে তার বিবরণ দিলেই সমস্যাটা বোঝা যাবে। বিখ্যাত অধ্যাপক ভাল্লা হিসেব করে দেখাচ্ছেন যে, ভারতবর্ষে দারিদ্র্যসীমার নিচে বর্তমানে ১২ শতাংশ লোক আছে। ডঃ মনমোহন সিং তিনিও বিখ্যাত একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি সরকারি তথ্য দেখে বলছেন, দারিদ্র্যসীমার নিচে ভারতবর্ষে বর্তমানে ১৯ শতাংশ লোক আছে। অন্য একজন অর্থনীতিবিদ পারভিন ভিখারিয়া বলছেন যে, উপরের দু'টি সমীক্ষা ভুল—আসলে দারিদ্র্যসীমার নিচে ৩৬ শতাংশ লোক এখনও আছে। আবার খুব সাম্প্রতিককালে সুন্দরম ও টেন্ডুলকর তাঁদের বিবরণে জানাচ্ছেন, দারিদ্র্যসীমার নিচে কত লোক ভারতবর্ষে আছে তাই নিয়ে এতই মতান্তর যে, সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে না এত প্রভেদ কেন? একজন বিখ্যাত লেখক বলছেন, ১২ শতাংশ আর অন্য আরেকজন বলছেন ৩৬ শতাংশ। এই

তারতম্যের কারণ কি?

এই তারতম্যের মুখ্য কারণ হল দারিদ্র্য কাকে বলে তার সংজ্ঞা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা একমত পোষণ করেন না। প্রত্যেকের কাছে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা আলাদা, মাপকাঠি আলাদা, দারিদ্র্যের স্ট্যাটিসটিক্যাল মানার পদ্ধতি আলাদা, সমীক্ষা পদ্ধতি আলাদা, সংখ্যাতত্ত্ব আলাদা, কেউ সরকারি তথ্য নেয়, কেউ নেয় না। অর্থাৎ দারিদ্র্য বলতে কি বোঝা যায় তাই নিয়ে মতান্তর।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বর্তমানে তিন ধরনের দারিদ্র্যের সংজ্ঞা ও মাপকাঠি আছে। প্রথমটার নাম অ্যাবসলিউট পোভার্টি বা বাংলায় বলা যাক 'বিশুদ্ধ দারিদ্র্য'। হয়তো বাংলা তর্জমা ঠিক হল না, তবুও বলা দরকার এই বিশুদ্ধ দারিদ্র্য সংজ্ঞায় একটা কাল্পনিক সীমা খোঁজা হচ্ছে। এই সীমার নিচে যারা থাকবে তারাই দারিদ্র্যসীমার নিচে বা বি পি এল বা বিলো দ্য পোভার্টি লাইন—এখন এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হচ্ছে সীমা কীভাবে নির্ধারিত হবে এবং কোন্ সীমারেখা সর্বজনগ্রাহ্য। সরকারি ভাষ্যে এই সীমারেখার নিচে রাখা হয় তাই দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা কম থাকে আর বেসরকারি মতে, সীমাটা উপরের দিকে রাখা হয় তাই দারিদ্র্যসীমার নিচে বেশি লোক থাকে। কে কেমন সীমারেখা টানবে তার ওপর দরিদ্র জনসাধারণের সংখ্যা নির্ভর করবে। এখানে বলা দরকার, এই পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে লোক মাপা হয়েছে। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত এটাই চালু পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দারিদ্র্য মাপা হয় তার নাম রিলেটিভ পোভার্টি বা আপেক্ষিক দারিদ্র্য। এই পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে বা অন্য অনুন্নত দেশে দারিদ্র্য খুব একটা মাপা হয় না। এই পদ্ধতি ইউরোপ বিশেষত পূর্ব ইউরোপ বা রাশিয়াতে খুব জনপ্রিয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আয়ের বন্টন যে সমান নয় তা সবারই জানা। প্রথম ১০ শতাংশ অত্যধিক বড়লোক এবং তাদের মাথাপিছু আয় খুবই বেশি। আর শেষ ১০ শতাংশ জনসংখ্যা অত্যন্ত গরিব। প্রথম দশমাংশের মাথাপিছু আয় যদি শেষ ১০ শতাংশ লোকের থেকে একটা ক্রিটিক্যাল মিনিমাম-এর ওপরে হয় তবে শেষ দশমাংশের লোকেরা দারিদ্র্যসীমার নিচে। অর্থাৎ তুলনাটা হয় প্রথম দশমাংশের সঙ্গে শেষ দশমাংসের মধ্যে অবস্থিত সেইসব জনসংখ্যার, যারা ক্রিটিকাল মিনিমামের নিচে। এখানে বলা দরকার, ভারতবর্ষেও এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য মাপার চেষ্টা হয়েছে। অনেকের মতে, আপেক্ষিক দারিদ্র্য একটা দেশে বিশুদ্ধ দারিদ্র্য থেকে অনেক উপযোগী। আমাদের দেশেও অনেকে এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্য মাপার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ অ্যাবসলিউট পোভার্টি বা বিশুদ্ধ দারিদ্র্যই মেপেছেন। আপেক্ষিক দারিদ্র্য মাপা বেশ কঠিন ব্যাপার।

তৃতীয় পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমার কাল্পনিক রেখা বের করার চেষ্টা হয় না।

বর্তমানে 'বঞ্চনার সূচক' তৈরি করা হচ্ছে। এর নাম ইনডেক্স অফ ডিপ্রাইভেশন। এই পদ্ধতিতে আয় ছাড়া অন্য অনেক জিনিসই নেওয়া হয়। যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমন বা আয়ু দেশের লোকদের কেমন, স্কুলে কত ছাত্রছাত্রী পড়ে এবং কত ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত স্কুলে থাকে বা স্কুল ছেড়ে চলে যায় ইত্যাদি বহু জিনিস নিয়ে সূচক তৈরি হয়। অর্থাৎ আয় ছাড়াও স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। এইভাবে দারিদ্র্য মাপার চেষ্টা প্রথমে করেছেন মহবুল-হক, অমর্ত্য সেন প্রমুখ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদরা এবং ইউ এন ও'র বিশেষজ্ঞরা। এই বঞ্চনার সূচক নানা ভিন্ন রূপে মাপা হয়—যেমন সি পি এম ইনডেক্স বা ক্যাপাবিলিটি পোভার্টি মেজার এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স। এগুলো বিশ্ব সংস্থাগুলো যতটা ব্যবহার করছে অন্য দেশগুলো ততটা ব্যবহার করে না। যদিও এই তিনটি পদ্ধতি দারিদ্র্যকে বিভিন্নভাবে মাপার চেষ্টা করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, 'দারিদ্র্য' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে বলে কত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে তাই নিয়ে এত তর্ক, বিতর্ক ও মতান্তর। সংজ্ঞা এতগুলো থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে মুখ্যত অ্যাবসলিউট পোভার্টি বা যাকে আমরা বলছি 'বিশুদ্ধ দারিদ্র্য' তাই নিয়ে তর্কটা বেশি। কেন এই তর্ক তা সংক্ষেপে বলা যাক।

দারিদ্র্যসীমা প্রথম না হোক আদিকালে মাপেন ওঝা বলে অর্থনীতিবিদ এবং প্রায়ই একইসঙ্গে রথ ও ডান্ডেকার দারিদ্র্যসীমা মাপার চেষ্টা করেন। ওঝা একটি দারিদ্র্যসীমা তৈরি করতে চান মানুষের 'ন্যূনতম চাহিদাকে' জোর দিয়ে। তাঁর বক্তব্য, ন্যূনতম চাহিদা গ্রামে আর শহরে এক নয়। অতএব দুই ধরনের দারিদ্র্যসীমা বা কাল্পনিক রেখা তৈরি করা যায়। ওঝা দারিদ্র্যসীমা দু'বার মাপেন। একবার ১৯৬০-৬১ সালে আর অন্যবার ১৯৬৭-৬৮ সালে। তাঁর মতে, গ্রামে ক্রমাগত দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা বাড়ছে। ১৯৬০-৬১ সালে ৫১.৮ শতাংশ আর ১৯৬৭-৬৮ সালে ৭০ শতাংশ। যদিও শহর এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা অনেকটাই কম।

রথ ও ডান্ডেকার ওঝার দুটো বক্তব্য মানলেন না। তাঁদের মতে, শহর ও গ্রামের জন্য আলাদা করে দারিদ্র্যসীমা মাপাটা কৃত্রিম। তাছাড়া ওঝা 'ন্যূনতম চাহিদা' বলতে শুধু খাবারের সামগ্রী নিয়েছেন। মানুষের ন্যূনতম চাহিদা শুধু খাবার নয়, বস্ত্র, বাড়ি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিরও দরকার। অর্থাৎ তাঁরা 'ন্যূনতম চাহিদা' কথাটির বিস্তারিত করেন। তাঁদের মতে, সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে ৪১ শতাংশ লোক আছে আর এই সংখ্যা বা শতাংশের পরিবর্তন কোনো যোজনায় বিশেষ হচ্ছে না।

প্রণব বর্ধন দেখাতে চাইলেন যে, রথ ও ডান্ডেকার দারিদ্র্যসীমা মাপতে গিয়ে যে মূল্য বা দাম ধরেছেন তা ঠিক নয়। গরিব মানুষেরা খাদ্যদ্রব্যের দাম

নিয়ে যতটা চিন্তিত শিল্পদ্রব্যের দামের হেরফের নিয়ে অতটা চিন্তিত নয়। প্রণব বর্ধন যে দামে ন্যূনতম চাহিদা বের করতে চাইলেন তা রথ ও ডান্ডেকার থেকে আলাদা। তাঁর মত অনুযায়ী ক্রমাগত দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ রথ ও ডান্ডেকার বলতে চান খুব একটা বাড়ছে না, প্রণব বর্ধন তা স্বীকার করছেন না। তাঁর মতে, ১৯৬০-৬১ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল ৩৮ শতাংশ লোক তা ১৯৬৮-৬৯ সালে হয়েছে ৫৪ শতাংশ। প্রথম যুগে অমর্ত্য সেন এই ধরনের দারিদ্র্যসীমা মাপাতে সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতামত সংক্ষেপে বলা যাক। ধরা যাক দারিদ্র্যসীমা আমরা ধরেছি ৩০০ টাকা। ৩০০ টাকার নিচে যারা আছে তারাই দারিদ্র্যসীমার নিচে। অমর্ত্য সেন বলতে চান, এইভাবে দারিদ্র্যসীমা মাপাটা অন্যায়। কারণ, দারিদ্র্যসীমার নিচে কেউ আয় করে ২৯৯ টাকা আর কেউ বা ১৫০ টাকা আর কেউ বা (ধরা যাক) ১০০ টাকা। সবাই দারিদ্র্যসীমার নিচে হলেও কেউ দরিদ্র, কেউ বেশি দরিদ্র আবার কেউ বা ভীষণভাবে দরিদ্র। ভারতবর্ষে 'ভীষণভাবে দরিদ্র' সংখ্যাটি এতই বেশি যে বা কেন্দ্রীভূত যে ঠিক দরিদ্র বলে সমস্যাটা বোঝানো যায় না। অতি দরিদ্র কিভাবে মাপা যায় তাই নিয়ে অমর্ত্য সেন যে সূচিকা তৈরি করেছেন তার নাম 'পি' সূচিকা।

এটি অবশ্য অমর্ত্য সেন নাম্বার ওয়ান বা প্রথম যুগের থিওরি। দ্বিতীয় যুগে তিনি এবং মহবুল হক মিলে যে সূচিকা তৈরি করেছেন তার নাম ক্যাপাবিলিটি পোভার্টি মেজারস বা সংক্ষেপে সি পি এম এবং অন্যটি হিউম্যান ডিপ্রাইভেশন মেজার বা বঞ্চনার সূচিকা। যেহেতু বর্তমানে এইচ ডি এম বা বঞ্চনার সূচিকাটি খুবই প্রচলিত। তাই সংক্ষেপে সূচিকাটি কি তার আলোচনা করছি।

সেন ও হক্ মনে করেন, মানুষের বঞ্চনা আসে বিবিধ উপায়ে। প্রথমত, স্বাস্থ্যের পরিষেবার অভাব—যথা খাবার জলের অভাব, শিশুদের জন্মের সময়ে ওজন কম ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার অভাব—যথা পুরুষ বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয় না, স্কুলে নাম লিখে ছেড়ে চলে যায় বা যাকে বলে ড্রপ-আউট। আর তৃতীয়ত, আয়েব অভাব—যার ফলে ক্ষুধা, বুভুক্ষা, অনাহার নিত্যকারের সঙ্গী। এই তিনটি (অর্থাৎ স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর আয়ের অভাব) যদি আমরা মাপতে পারি তবে দারিদ্র্যের আসল রূপ আমরা বুঝতে পারব।

সেন ও হক যা সূচিকা তৈরি করেছেন তা বাস্তবে মাপা বড্ড কঠিন ব্যাপার। তাই ইউ এন ও একটি সহজ পদ্ধতি নিয়েছে। সেটি হল মাথাপিছু প্রতিদিন আয় যদি ১ ডলারের নিচে হয় তবে সে দরিদ্র। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কও এই সংজ্ঞাই নিয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে ভারতবর্ষে অন্তত ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে।

আলোচনা থেকে একটা ধারণা আসতে পারে যে, দরিদ্র এবং দারিদ্র্যের

সংজ্ঞা বিবিধ এবং বিভিন্ন। ফলে নানা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই দরিদ্র কথাটির ব্যবহার বা অপব্যবহার হতে পারে। কোনো রাজনৈতিক দল যদি বলে তাদের আমলে দারিদ্র্য কমেছে তা হলে জানতে হবে কীভাবে দারিদ্র্য কথাটি ব্যবহার হচ্ছে।

নবম পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নে বলা আছে, ভারতে দারিদ্র্য কমছে। কথাটি সত্য বা মিথ্যা তা বোঝা যাবে কীভাবে দারিদ্র্য মাপা হচ্ছে তার ওপর। যতক্ষণ না পর্যন্ত 'দারিদ্র্য' কথাটির পূর্ণ ব্যাখ্যা না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বক্তব্য গ্রহণও করতে পারি বা বর্জনও করতে পারি।

সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়ালেই কি গরিবের কাছে পৌঁছুবে?

আমাদের দেশের বাজেটে চিরকালই এক সমস্যা আছে। তা হচ্ছে সরকারি নানান খরচ আমরা কমাতে পারিনি বলে, সামাজিক উন্নতির খরচ ক্রমশ কম হয়ে গেছে। সামাজিক উন্নতি মানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ উন্নতির খরচ এতটাই কম যে কোনো দেশের সঙ্গে তুলনা করা হাস্যকর। এবারকার বাজেটে অন্তত দাবি করা হয়েছে যে সামাজিক উন্নতির দিকে আমরা কিছুটা নজর দিতে সমর্থ হয়েছি। এই দাবি যথার্থ কিনা তাই নিয়েই নানান প্রশ্ন উঠেছে।

কিছু সত্য জানা দরকার। আগেকার বছরের বাজেটগুলিতে সামাজিক ন্যায় ও সামাজিক কল্যাণের জন্য আমরা যে অর্থ খরচ করেছি যা আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৫ শতাংশ বা তার কাছাকাছি। বিশ্ব সংস্থা গত বছর যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে জানাচ্ছে যে মাথাপিছু আয় হিসেবে পৃথিবীর ১০১টি দেশের মধ্যে ভারতের বর্তমান স্থান ৮৯তম। তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে সামাজিক কল্যাণের দিকটা আমরা ক্রমাগত উপেক্ষা করে এসেছি। ফলে দারিদ্র্য, অবহেলা, শিক্ষার অভাব, বেকারি এতই তীব্র যে প্রায় ৬১.৫ শতাংশ লোক ভারতে এখনও দরিদ্র বা 'অভাবগ্রস্ত'। বিশ্ব সংস্থার হিসেবের সঙ্গে ভারত সরকারের হিসেব অবশ্য মেলে না। ভারত সরকারের মতে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা ক্রমাগত কমছে। আর বর্তমানে তা ৪০ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ বিশ্ব সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ৬১.৫ শতাংশ ভারতের লোক দরিদ্র। কিন্তু ভারতের সরকারি হিসেব অনুযায়ী তা অন্তত ২০ শতাংশ কম। কোন্ হিসাব সত্য তা জানবার প্রয়োজন থাকলেও বিনা দ্বিধায় বলা যায় বহু লক্ষ বা কোটি লোক ভারতে দরিদ্র ও 'অভাবগ্রস্ত'। সেই সংখ্যাটা ৩৬ কোটি বা ৩৮ কোটি, না ৪৫ কোটি তা নিয়ে তর্ক অবাস্তব। প্রচণ্ড দারিদ্র্য আর অসহনীয় ক্ষুধা মাপবার জন্য আজ পর্যন্ত কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি।

অনেক সময়ে বলা হয় সামাজিক উন্নতির দিকে আমরা তেমন লক্ষ্য দিতে পারিনি তার কারণ সরকারি অমিতব্যয়িতা বা যথেচ্ছ খরচ। সরকারি কর্মচারীদের সব সুখ ও সুবিধা দেখতে গিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ ও স্বাস্থ্যের মানবিক পরিকাঠামো থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হচ্ছে।

সরকারি যথেচ্ছচারিতার অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ ডেফিসিট ক্রমাগত বাড়ছে। সরকারি আয় বা তার তুলনায় পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচ অনেক বেশি। আমরা বিভিন্ন ট্যাক্স এক্সাইজ ডিউটি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ থেকে যা 'আয়' করি সরকারি কর্মচারীদের মাইনা, বোনাস, গাড়ি চালাবার খরচ, ফার্নিচার কিনবার খরচ, ফোনের বিল, অফিস সাজাবার খরচ ইত্যাদি 'ব্যয়' তা অনেকটাই বেশি। এরই অর্থনৈতিক নামকরণ 'রেভিনিউ ডেফিসিট'।

এই রেভিনিউ ডেফিসিট গত বছর পর্যন্ত ছিল জাতীয় আয়ের প্রায় ৪ শতাংশ। আরও আশ্চর্যের কথা, এই বছর আমাদের বাজেটে রেভিনিউ ডেফিসিট কমেনি বরং বেড়েছে—সামান্য বেড়েছে। অর্থাৎ সরকারি সব আয়ই যদি সরকারি কর্মচারীদের জন্য খরচ করি তবে সামাজিক উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না বা থাকবার কথা নয়। আরও আশ্চর্যের কথা, ভারতের সঙ্গে আমরা যদি অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনা করি তবে দেখব তাদের তুলনায় রেভিনিউ ডেফিসিট আমাদের দেশের অনেক বেশি। যেমন ইন্দোনেশিয়ায় এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় রেভিনিউ সারপ্লাস এবং তা জাতীয় আয়ের ০.৩ ও ০.৬ শতাংশ। চীনে অবশ্য রেভিনিউ ডেফিসিট আছে এবং তা জাতীয় আয়ের ২ শতাংশ। জার্মানিতে ২.৫ শতাংশ। অর্থাৎ আমাদের যা ক্ষমতা তার তুলনায় সরকারি খরচ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছি—ডান, বাম, মধ্য বা প্রায় ডান সব সরকারই তার নিজের সুবিধার জন্য সরকারি আয় ক্রমাগত খরচ করে যাচ্ছে। আর এই খরচ কোনোমতই উৎপাদনমুখী নয়, সৃজনশীল নয় ও সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণমুখী নয়। 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' যে অর্থনীতি তাতে সরকারি ফোনের বিলের সামগ্রিক খরচ নাকি ভারতে উচ্চশিক্ষার খাতের খরচ থেকে অনেক বেশি। এই প্রশ্নটা তোলা দরকার কারণ দেশের লোকদের জানবার অধিকার আছে জাতীয় স্বার্থে কোন্‌টা জরুরি—সরকারি ফোনের ও গাড়ির যথেচ্ছ ব্যবহার, না উচ্চ শিক্ষা?

যেহেতু আমরা আমাদের যা ক্ষমতা তার থেকে অনেক বেশি খরচ করছি তাই আমাদের ঘাটতি পূরণের জন্য লাগে ঋণ অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটের মুদ্রণ। দেশের লোকদের কাছে ধার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে—এই বছর বাজেটে তা ৬০,০০০ কোটি টাকা আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটের মুদ্রণ কমছে না—বেড়েই চলছে। চিদাম্বরম তাঁর 'সামাজিক ন্যায় বিচার যুক্ত' বাজেটে অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। আগের অবস্থাই চলছে। বাক্য

যে কর্ম নয় এই বাজেটে তা পরিস্ফুট। শুধু বাক্যই।

এই বছরের বাজেটে সামাজিক উন্নয়নের খাতে ২৪৬৬ কোটি টাকা অবশ্য বাড়ানো হয়েছে। এই নিয়ে নানান লাফালাফি। সামাজিক উন্নতি এইবার নাকি সম্ভব। যদি সব খুঁটিয়ে বিচার করা হয় তবে দাবির অসারতা প্রমাণ করা যায়। যথা সামাজিক উন্নতির প্রধান যে দুটি স্তম্ভ—গ্রামীণ বেকারি দূরীকরণ আর গ্রামীণ উন্নতির খাতে অর্থের বরাদ্দ সামান্যই আছে—অর্থাৎ ৬৪৩৭ কোটি আর ২২১৫ কোটি টাকা। এর থেকেও খারাপ হচ্ছে এই দুটো গ্রামীণ উন্নতির টার্গেট কমানো হয়েছে। যেমন আই আর ডি পি প্রোগ্রামে ১৯৯৩-৯৪ সালে ২৫.৪ লক্ষ লোককে সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল—এই বছর বাজেটে মাত্র ১৬.৪ লক্ষ লোককে সুবিধা দেওয়ার কথা। আর ৬০ কোটির বেশি লোক গ্রামে বাস করে। তাদের মধ্যে ১৬.৪ লক্ষ সমুদ্রের একটি বুদবুদ। গ্রামীণ বেকারদের জন্য খরচ গত বছরের বাজেটেও ছিল জাতীয় আয়ের ০.৪৯ শতাংশ—এই বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ০.৩১ শতাংশ। খাদ্যে ভর্তুকিও কমেছে। গত বছর খাদ্যে ভরতুকি ছিল জাতীয় আয়ের ০.৬৫ শতাংশ এইবার তা দাঁড়িয়েছে ০.৪৭ শতাংশ। আর খাদ্যের ভর্তুকি গরিব লোকরা বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে না—কারণ CAG বা অডিট রিপোর্টে বলা আছে খাদ্যের ভর্তুকি সিংহভাগ চলে যাচ্ছে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার নানান শাসনতান্ত্রিক খরচে। (CAG রিপোর্ট ১৭ নম্বর)

পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম নাকি উন্নত করা হবে। আসল কথা উন্নতির জন্য যে খরচ করা দরকার তা আমরা আপাতত করতে সম্ভব হচ্ছি না। আর এই বছর পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের খরচ খুব একটা বাড়েনি। যা বেড়েছে তা প্রান্তিক। বর্তমানে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে আমাদের মাথাপিছু খরচ .৯২ ডলার। সেইখানে পাকিস্তান খরচ করছে ১.৫১ ডলার, ব্রাজিল ২.৩৮ ডলার আর শ্রীলঙ্কা ৪.৩২ ডলার। সমস্ত রিপোর্টই বলেছে যে, রেশনিং সিস্টেম যদি ভালোভাবে চালাতেই হয় তবে মাথাপিছু খরচ বাড়ানো দরকার অন্তত বর্তমানের তিনগুণ। ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল একটি 'মানদণ্ড' প্রস্তুত করেছে। তাতে বলা আছে প্রাণধারণের জন্য আজ দ্রব্যর মান দরকার, তার থেকে আমরা ক্রমাগত বিচ্যুত হয়ে চলেছি। রেশনে যা দেওয়া হয় বা দেবার কথা হচ্ছে তা এই মানদণ্ড থেকে এতটাই কম যে তাতে 'জীবন ধারণ করা' কথাটা মূল্যহীন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একই কথা। যে অর্থ ধরা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এতটাই কম যে তাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থার কোনো সামগ্রিক উন্নতি আশা করা যায় না। এশিয়াতে সব দেশেই সরকারি মাথাপিছু শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের খরচ ভারত থেকে অনেকটাই বেশি।

সামাজিক খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হলেই গরিব লোকদের কাছে পৌঁছুবে সেই রকম আশা করা অন্তত ভারতবর্ষে সম্ভব নয়। কারণ নানান ধরনের

দুর্নীতির আর বর্তমান শাসন ব্যবস্থার কাঠামো। আমাদের যোজনা কমিশন ১৯৯৫ সালে জানাচ্ছে যদি '১০০ টাকা আমরা সামাজিক উন্নয়নে খরচ করি তবে ৮০ টাকাই যাচ্ছে শাসনযন্ত্রের বা ব্যুরোক্রেসির প্রয়োজনে। বড়জোর ২০ টাকা আমাদের গরিব লোকদের কাছে পৌঁছুচ্ছে।' রাজীব গান্ধী ১৯৮৯ সালে যে বক্তৃতা রাজস্থানে দিয়েছিলেন তা আরও ভয়াবহ। তাঁর কথা অনুযায়ী আমরা গ্রামীণ উন্নতির জন্য যদি ১০০ টাকা বরাদ্দ করি তবে তার থেকে মাত্র ১৫ টাকা গ্রামীণ গরিবদের কাছে যাচ্ছে। বাকি টাকা চলে যাচ্ছে অফিসিয়ালদের খরচে, মিডলম্যান বা দালালদের ঘুষ দিতে বা স্রেফ দুর্নীতিতে। তাঁর তখন বক্তব্য ছিল আমাদের লক্ষ্য যে ১০০ টাকা আমরা গ্রামীণ উন্নতিতে খরচ করি অন্তত ৩০ টাকা গ্রামের আসল দরিদ্ররা যেন পায়। ১৯৯৬ সালে বাঙ্গালোরে ডিরেক্টর অফ ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স একটি সমীক্ষা চালায়। তাতে বলা হয়েছে '১০০ টাকা গ্রামীণ উন্নতির জন্য বরাদ্দ হলে মাত্র ১৩ টাকা টার্গেট গ্রুপ পাচ্ছে।' লক্ষ্ণৌতে গিরি ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস তাদের সমীক্ষায় জানাচ্ছে, পঞ্চায়েত বর্তমানে দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। টাকা পেতে গেলে স্ট্যান্ডার্ড কমিশন হচ্ছে ২০ শতাংশ—১০ শতাংশ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আর ১০ শতাংশ পঞ্চায়েতের লোকদের, যারা মুখ্যত দালাল। পঞ্চায়েতের কমিশন ন্যূনতম ১০ শতাংশ, সুবিধা মতো সেটা অবশ্য বেড়ে যায়। সমীক্ষা অবশ্য করা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলিতে। মহারাষ্ট্রে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেল স্কিমে যা করা হচ্ছে তা হল ভুয়া নামে লোক নিয়োগ চালু পদ্ধতি। লোকদের নাম যদি না পাওয়া যায়, গাধার নামেও টাকা তোলা হচ্ছে।'

সামাজিক উন্নতি অবশ্য সবাই চায়। আমাদের বর্তমান বাজেটে সামাজিক উন্নতির কথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক উন্নতি করার জন্য যে কাঠামো ও পদ্ধতি দরকার তা এখনও অশ্লীলভাবে অনুপস্থিত। হয়তো এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। কারণ আমরা শুনে শুনে অভ্যস্ত যে 'শিক্ষা আনে চেতনা।' এই চেতনা আনবার জন্য শিক্ষা খাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তা একমাত্র হতে পারে সরকারি বেহিসেবি খরচ যদি আমরা কমাতে পারি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ঘর সাজানোর জন্য পর্দার খরচ যদি ১০ লক্ষ টাকা হয় তবে বেহিসেবি খরচ বেড়েই যাবে। ফলে যত সরকারি অহেতুক খরচ বাড়বে তত শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। শুধু টাকা ঢাললেই গরিবদের অবস্থা উন্নতি করা যায় না, এই সত্যটি বর্তমান বাজেটে উপেক্ষা করা হয়েছে।

বৃদ্ধদের সামাজিক সুরক্ষা ও ভারতবর্ষ

পৃথিবীতে নানান কনফারেন্স হয়। কখনও শিশুদের নিয়ে, কখনও মহিলাদের অধিকার নিয়ে, কখনও শ্রমিক সমস্যা নিয়ে বা শিল্পের উন্নতির প্রয়োজনে। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স প্রায় শোনা যায় না। এই বছর অর্থাৎ ২০০২ সাল একটা ব্যতিক্রম। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের আনুকূল্যে এখন ঘন ঘন মিটিং এবং কনফারেন্স। একটা হয়ে গেল নিউ ইয়র্কে আর অন্যটা স্পেনের মাদ্রিদে। নিউ ইয়র্কের কনফারেন্সে স্বয়ং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব কোফি আন্নান মিটিং-এ এসে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সমস্যার কথা জানাতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও বললেন।

হঠাৎ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সমস্যার কথা পৃথিবীব্যাপী আলোচিত হবার কারণটাও বুঝতে হবে। পৃথিবীতে জনসংখ্যার নানান পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন যেটা সব দেশেই লক্ষণীয় তা হচ্ছে সংখ্যায় এবং শতাংশে সব দেশেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাড়ছে। এখন আয় বৃদ্ধি হচ্ছে। পরিবারের আকার সীমিত হচ্ছে। মেয়েদের সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমছে। এদিকে ডাক্তারি শাস্ত্রের উন্নতি হচ্ছে। ফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হবে যে, বর্তমানে জনসংখ্যায় শিশুরা বেশি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কম। এই জনসংখ্যার স্থানগত মানের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে চলেছে। এখন বহু দেশে শিশুদের তুলনায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সংখ্যায় বেশি হবে।

'বার্ধক্যের' ওপর আই এম এফ একটি বই বের করেছে। তাতে বলা হচ্ছে শিশুরা অর্থাৎ সদ্যোজাত থেকে ১৪ বছর যাদের বয়েস, ১৯৮০ সালে তারা ছিল পৃথিবীর জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। ২০২৫ সালে সেটা কমে দাঁড়াবে ১৫ শতাংশ। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র পরিবারে শিশুর সংখ্যা কমছে। অন্যদিকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অর্থাৎ যাদের বয়েস ৬০ বছরের উপর তারা ১৯৮০ সালে ছিল পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যার ১২.৫ শতাংশ আর ২০২৫ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়াবে ২২ শতাংশ। অর্থাৎ পৃথিবীতে এক আমূল পরিবর্তন আসছে। বৃদ্ধ-

বৃদ্ধারা সংখ্যায় বাড়বে আর শিশুদের সংখ্যা কমবে।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। প্রথমটি যাদের বয়েস ৬০ বছরের উপর তারাই বৃদ্ধ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যাদের বয়েস ৬৫ বছরের উপর তারাই শুধু বৃদ্ধা। বহু আলোচনার উপর বর্তমানে আমরা ৬০ বছরের উপর লোকদেরই বৃদ্ধ বলছি। সাধারণভাবে বলতে গেলে বৃদ্ধ মানে যারা ৬০ বছরের বেশি তারা বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ কোটি। ২০৫০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২০০ কোটির কিছু বেশি। যত উন্নত দেশ তত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা বেশি। তার মানে এই যে, অনুন্নত দেশে উন্নতি যত হবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা তত বাড়বে। উন্নতি মানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি।

এটি প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি সারণী তৈরি করেছে। সেই সারণীটি লেখার সঙ্গে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

সারণী-১	
দেশগুলির নাম	**জনসংখ্যার কত অংশ ৬০ বছরের উর্ধ্বে**
ইতালি, জাপান, জার্মানি, সুইডেন, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন, ফ্রান্স হাঙ্গেরি।	২০ থেকে ২৫ শতাংশ বা তার উর্ধ্বে
রাশিয়া, কানাডা, পোল্যান্ড, আমেরিকা।	১৫ থেকে ২০ শতাংশ
হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন।	১০ থেকে ১৫ শতাংশ
ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ব্রাজিল, মিশর।	৫ থেকে ১০ শতাংশ
কেনিয়া, উগান্ডা, নাইজার।	৫ শতাংশের নিচে

সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যারা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তারা অবসরপ্রাপ্ত। অতএব তারা কাজ করবে না বা নতুন করে যোগ দেবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ৬০ বছরের উপরে অথচ 'নতুন' কিছু চাকরি চায় অথবা কিছু 'আয়' করতে চায় তাদের সংখ্যা অনুন্নত দেশে বেশি। অর্থাৎ সামাজিক সুরক্ষা না থাকাতে অনুন্নত দেশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কিছু একটা করতে চায়। ৬০ বা ৬৫ বছরের উপরে তবুও 'আয়' করতে চায় সেই সংখ্যাটা কেনিয়া, উগান্ডা, নাইজারে প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ। আর ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৬০ শতাংশ। অথচ হাঙ্গেরিতে ২ শতাংশ, ফ্রান্সে ৬ শতাংশ, জার্মানিতে ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ 'অবসর' কথাটি অনুন্নত দেশে প্রায় অচল। বৃদ্ধ অথচ সংসার চালাতে পারছে না এই সংখ্যাটা ভারতবর্ষে কমবার বদলে ক্রমশ বাড়ছে। অর্থাৎ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে কোনো নীতি এবং সামাজিক সুরক্ষা অনুন্নত দেশে নেই। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা আমাদের দেশে অবহেলিত শ্রেণী। কথাটি আমার নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের।

অথচ সামাজিক সুরক্ষা বা যাকে সোসাল সিকিউরিটি বলে তা নিয়ে বহুদেশে আজ নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কয়েকটি দেশে যে কি প্রভূত উন্নতি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে এইসব রাষ্ট্রগুলি নানান সুরক্ষা কবচ তৈরি করছে। বাজেটের বিপুল অংশ এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সামাজিক কল্যাণে নিয়োগ করা হচ্ছে।

ফ্রান্স ও জার্মানির কথাই ধরা যায়। তারা জাতীয় আয়ের ৩১ শতাংশ শুধু পেনশন ফান্ড, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের পেছনে খরচ করছে। এই ৩১ শতাংশ খরচ যাতে আরও বাড়ানো যায় তার জন্য তারা আগেভাগে পরিকল্পনা তৈরি করছে। এই দুটি দেশে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা কত তাড়াতাড়ি পেনশন পায় তার প্রতিযোগিতা। বিশ্বায়ন সর্বত্রই হতে পারে তবে রাষ্ট্রের কর্তব্য যে সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতি আছে তা সব সময় বলা হচ্ছে। ইতালিতে সামাজিক সুরক্ষা ফ্রান্স বা জার্মানির মতো উন্নত না হলেও তারা বাজেটের ২০ শতাংশ খরচ করছে। আবার এখানে রাষ্ট্রই প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। জাপান জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ খরচ করছে। তবে ২০০৫ সালে এই অঙ্কটা যাতে ২৭ শতাংশ করা যায় তার বন্দোবস্ত করছে। ব্রিটেন ২৩ শতাংশ জাতীয় আয়ের খরচ করছে। আর বলা হচ্ছে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই অঙ্কটা কিঞ্চিৎ কম। ব্রিটেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আগামী দশ বছরে তারা জাতীয় আয়ের ২৪ শতাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উন্নতিকল্পে খরচ করবে।

ইউরোপে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক খরচ যতটা বাড়ছে কানাডা ও আমেরিকায় ঠিক ততটা বাড়ানো হচ্ছে না। তারা সামাজিক কল্যাণে রাষ্ট্র এবং বেসরকারি উদ্যোগ দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। বুশ প্রশাসনে বর্তমানে রাষ্ট্রের খরচ বাড়ানো যায় কিনা তাই নিয়ে নানান পরিকল্পনা। কংগ্রেসে একদল নিত্যনতুন পরিকল্পনা নিয়ে আসছে।

বৃদ্ধদের সামাজিক কল্যাণ নিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে নানান পরিকল্পনা। কোথাও অগ্রগতি দেখবার মতো। কোথাও অতটা অগ্রসর হয়নি। তবে পেনশন যেন ভদ্রহারে পাওয়া যায় এই বিষয়ে সকলে একমত।

ভারতবর্ষের কথায় আসা যাক। এখানে সামাজিক সুরক্ষা কেন্দ্র দেখবে, না রাজ্য দেখবে তাই নিয়ে সময় সময় চিৎকার। পেনশন পাওয়া অন্তত স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্ষেত্রে লটারি পাবার মতো। কবে অবসর নেওয়া আর কবে পেনশন পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গে তা নিয়ে নীতির বদলে দুর্নীতি বেশি। বছরের পর বছর পেনশন পাওয়া যায় না। বলা হয় কাগজপত্র ঠিক নেই। অথচ কাগজপত্র কি করলে ঠিক হয় অন্তত পেনশন কি করে তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে তা নিয়ে কোনো নীতিই তৈরি হয়নি। শুধু সরকাবি প্রতিষ্ঠান নয়, বেসরকারি সংস্থাগুলোতেও একই অবস্থা। চা-বাগানে শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাচ্ছে না এমন ঘটনা অজস্র। অথচ পেনশন আটকানো বা

বকেয়া অর্থ না দেওয়া পশ্চিমী দেশগুলিতে অসম্ভব। দুবেলা আমরা পশ্চিমী দেশগুলিকে সমালোচনা করি তবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাওনা টাকা নিয়ে বজ্জাতি অন্তত তারা করে না। আমাদের দেশে হয়—পশ্চিমবঙ্গ তার একটি উদাহরণ। পেনশন ফান্ড এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে যত চালাকি করা হয় এই রামরাজ্যে, পশ্চিমী দেশে তা হয় না।

এবার আবার সুদের হার কমিয়ে দিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় কমিয়ে দিয়ে 'সিনিয়র সিটিজেনদের' নিয়ে খেলা। বিদেশে ট্যাক্স আছে কিন্তু সামাজিক সুরক্ষাও আছে। আর আমাদের দেশে ট্যাক্স আছে কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সামাজিক সুরক্ষা বিশেষ নেই। যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শোষিত কিনা বলা মুশকিল। তবে অবহেলিত তা জোর করে বলা যায়। কথাটা রাষ্ট্রপুঞ্জের।

আন্তঃরাজ্য বৈষম্য ঃ ভবিষ্যতে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে

ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। এই বৈষম্য অবশ্যই দুই ধরনের। প্রথম বৈষম্য হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে আর দ্বিতীয় বৈষম্য হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে। এই রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্যে আঞ্চলিক বৈষম্য ও নানান পার্থক্য থাকায় চতুর্দিকে আজ নানান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ভারতবর্ষে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে এক ধরনের mini-nationalism যেটা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। Mini জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আজকের দিনে সমাজ বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুবই আলোচনার বিষয়। কেন এই ধরনের আন্দোলন ক্যান্সারের মতো সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে?

সমস্যাটা বোঝার জন্য কিছু তুলনামূলক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক। দিল্লি রাজ্যের মাথাপিছু আয় বছরে ১০,০০০ টাকা আর সে স্থলে ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশে মাথাপিছু আয় মাত্র ১২৭৮ টাকা এবং বিহারের ২৬৫৫ টাকা। আর জাতীয় গড় আয় সমগ্র ভারতবর্ষে ৪৯৩৩ টাকা। অর্থাৎ দিল্লির মাথাপিছু আয় ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। আর বিহার ও দিল্লির জাতীয় আয়ের কোনো তুলনাই হয় না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় আয় মাঝামাঝি অর্থাৎ গড় আয়ের কাছাকাছি।

ভারতের রাজ্যগুলিকে এখন তিনভাগে ভাগ করা হচ্ছে। প্রথমত, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ইত্যাদি রাজ্যে মাথাপিছু আয় জাতীয় মাথাপিছু আয় থেকে অনেক বেশি—প্রায় দ্বিগুণ। আর বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান (BIMARU রাজ্য) যাদের মাথাপিছু আয় আমাদের গড় জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ শতাংশ কম। আর মাঝামাঝি রাজ্য যাদের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের কাছাকাছি যেমন পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাডু, কেরল, কর্নাটক ইত্যাদি।

এই বৈষম্য কেন তার সহজ ব্যাখ্যাও দেওয়া যাচ্ছে না। যেমন শিল্পে উন্নত রাজ্যগুলির জাতীয় আয় যে বেশি খুব বেশি তাও প্রমাণ হচ্ছে না। যেমন দিল্লি রাজ্যে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অবদান অত্যন্ত সামান্য—মাত্র ১.৮৩ শতাংশ, পণ্ডিচেরী যার শিল্পক্ষেত্রে অবদান মাত্র ০.২ শতাংশ অথচ দিল্লির জাতীয় আয় সবচেয়ে বেশি, আর পণ্ডিচেরী চতুর্থ। অথচ মহারাষ্ট্র যার শিল্পে সামগ্রিক অবদান প্রায় ভারতের ২৩ শতাংশ—মাথাপিছু আয় হিসেবে বর্তমানে স্থান ষষ্ঠ। অথচ উত্তরপ্রদেশ যার শিল্পে সামগ্রিক অবদান প্রায় ভারতবর্ষে ১০ শতাংশ—মাথাপিছু আয় হিসেবে স্থান ২৪তম।

বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশকেই বর্তমানে ধরা হচ্ছে সবচেয়ে 'দুর্বলতম' রাজ্য। অনেক সময় এই চারটি রাজ্যগুলিকে বলা হচ্ছে 'চিরকালের জন্য অসুস্থ'। এই চারটি রাজ্য হিন্দি বলয়ে। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় ৩৩.৫ কোটি লোক এই চারটি রাজ্যে আছে। এই চারটি রাজ্যে মিলিত লোকসংখ্যা ১৯৮১ সালে ছিল ২৬.৫ কোটি আর ১৯৯১ সালে তা আরও ৭ কোটি লোক বাড়ে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে ও অস্ট্রেলিয়ার মিলিত লোকসংখ্যা বর্তমানে ৩১ কোটি। আমেরিকা ভারত থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বড়। অথচ এই চারটি রাজ্যে লোকসংখ্যা ৩৩.৫ কোটি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেকটাই বেশি। অর্থাৎ হিন্দি এই রাজ্যগুলির জন্য আজকে ভারতবর্ষে জনসমস্যার এত প্রচণ্ড সঙ্কট। বলা হচ্ছে হিন্দি বলয়ে লোকসংখ্যা না কমাতে পারলে দেশের জাতীয় আয়ও বাড়বে না। বেকারি সমস্যারও সমাধান হবে না।

কেরলে বর্তমানে জন্মহার হাজার প্রতি ১৭.৩ শতাংশ, আর তামিলনাড়ুতে ১৯.৫ শতাংশ। কিন্তু বিহারে জন্মহার ৩২, উত্তরপ্রদেশে ৩৬। অর্থাৎ শুধু এই কয়টি রাজ্য জন্মহার কমাতে পারেনি বলে আজ ভারতের গড় জন্মহার ২৮.৭ প্রতি হাজারে। যদিও শিশুমৃত্যু হার কেরলে বর্তমানে ১৩, ভারতবর্ষে তা ৭৮ প্রতি হাজারে। কারণ মধ্যপ্রদেশে শিশু মৃত্যুহার ১০৬ আর উত্তরপ্রদেশে ৯৬; অর্থাৎ ভারতে বর্তমানে এই লাগামহীন জনসংখ্যার প্রধান কারণ এই চারটি রাজ্যে উন্নতির হার অত্যন্ত কম, অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি।

পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু হার এই চারটি রজ্যে বর্তমানে হাজার প্রতি ১২৪ আর পৃথিবীতে এই মৃত্যুহারের হিসাব আরও অন্তত ১৪৫টি দেশে পাওয়া যায়। লজ্জা ও দুঃখের কারণ পৃথিবীতে বর্তমানে অন্তত ৯০টি দেশ আছে যার শিশুমৃত্যু হার (IMR) ভারত থেকে কম আর অন্তত ১০৩টি দেশ আছে যার পাঁচ বছরের নিচে মৃত্যুহার ভারতের থেকে কম। আর এইসব দেশ যে উন্নত তা বলা যায় না। কারণ শিশুমৃত্যু হার ভারতের থেকে কম এমন দেশগুলি হচ্ছে, বসতোওয়ানা, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে, মিশর, মরোক্কো, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, হাইতি, আর সব ল্যাটিন আমেরিকার দেশ। অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশ থেকে অনেকটাই খারাপ। শুধু

ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কথা বলাটা একটু অন্যায়, কারণ দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে কয়েকটি বিশেষ রাজ্যে। এই কয়টি বিশেষ রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে ভারতের গড়টা এতটাই খারাপ।

বিভিন্ন রাজ্যে শিশুদের বাঁচাবার ভবিষ্যৎ বিভিন্ন। যেমন প্রতি হাজারে কেরলে ১৭ জন শিশু মারা যাবে, সেখানে ওড়িশায় প্রতি হাজারে শিশু মারা যাবে ১৪৪ জন। যদি সমগ্র ভারতে কেরলের জন্মহার ও মৃত্যুহার আমরা চালু করতে পারতাম, তবে অন্তত প্রতি বছরে ১০ মিলিয়ন শিশু কম জন্মাতো আর অন্তত ১.৭৬ মিলিয়ন কম শিশু মারা যেত। অর্থাৎ কেরলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি বিহারেও আসত তা হলে এই জনসমস্যার সমাধানের কিছু সূত্র পাওয়া যেত।

আবার ওড়িশার সঙ্গে যদি কর্নাটকের তুলনা করি তবে লক্ষ্য করা যেত ওড়িশার লোকসংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে ২.০৩ শতাংশ হারে, অথচ মাথাপিছু আয় বাড়ছে ১.২৩ শতাংশ হারে। অর্থাৎ কালের অমোঘ নিয়মে ওড়িশার জীবনযাত্রার মান ক্রমশ কমবে—বাড়বে না। অথচ কর্নাটক রাজ্যে জনসংখ্যা বাড়ছে ১.৪১ শতাংশ হারে, আর মাথাপিছু আয় বাড়ছে ২.০৬ শতাংশ হারে। অধিকাংশ দুর্বল রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার থেকে অনেকটাই বেশি। ফলে জীবনযাত্রার মান 'দুর্বল' রাজ্যে ক্রমাগত কমবে, আর 'সবল' রাজ্যে তা বাড়বে। ফলে ভারতবর্ষেও যে ধরনের অনৈক্য দেখা যাবে তা ভবিষ্যতের পক্ষে হবে মারাত্মক। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক ধরনের সমস্যা আসছে—গরিব ও দুর্বল রাজ্য যারা ক্রমাগত দুর্বলতর হচ্ছে আর সবল ও প্রগতিশীল রাজ্য যেখানে জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বাড়বে। এই 'দুই ভারতবর্ষ' এবং এই 'দুই কালচারের' মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য।

কালচার যে পৃথক কিছুটা হচ্ছে তা ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে (১৯৯৩) থেকে পরিষ্কার। বলা হচ্ছে ১৩-৪৯ পর্যন্ত বিবাহিত মহিলাদের ওপর সমীক্ষা করে জানা গেছে পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য। উত্তরপ্রদেশে পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং ভালো এই মত পোষণ করে মাত্র ১৮ শতাংশ, বিহারে ২১ শতাংশ, রাজস্থানে ৩০ শতাংশ, আর মধ্যপ্রদেশে ৩১ শতাংশ। অথচ কেরল, তামিলনাডু, পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া, হিমাচলপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে অন্তত ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ মহিলা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী এবং করে। রাজ্যে রাজ্যে আয়ের গতি, জনসংখ্যার প্রগতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি পৃথক কেন? সমাজবিজ্ঞানীরা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছেন। তবে উত্তরটা সদুত্তর কিনা তা কে জানে?

প্রথমত, কিছু কিছু রাজ্যে শাসনযন্ত্র একেবারেই দুর্বল। 'Work Ethics বা Work culture অনেক রাজ্যে অত্যন্ত কম। ফাইল চলে না। কাজ কেউ করে না। অর্থ বরাদ্দ হলেও তা খরচ হয় না। বলা হচ্ছে পূর্ব ভারতের বহু রাজ্যে

ও উত্তর ভারতেই এই ওয়ার্ক কালচারের বড্ড অভাব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৯৩-৯৪ সালে বিহারে যোজনার অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ২৩০০ কোটি টাকা। অথচ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে সমন্বয়ের অভাব থাকার ফলে খরচ হয়েছে মাত্র ৭৫০ কোটি টাকা। 'কেন্দ্রের বঞ্চনা'র কথা অনেক সময় শোনা যায়—তবে আবার উল্টোটাও সত্যি। টাকা দেওয়া হয়েছে অথচ খরচ হচ্ছে না। এক খাতের টাকা অন্য খাতে চলে যাচ্ছে। ঠিক সময়ে হিসাব দেওয়া হয় না। ঠিক সময়ে হিসাব যায় না বলে পরের অর্থ বরাদ্দ আসে না। অর্থাৎ শাসনযন্ত্রের দুর্বলতার জন্য অর্থ ব্যবহারও হয় না, সদ্ব্যবহার তো দূরের কথা।

দ্বিতীয়ত, বলা হচ্ছে শাসনযন্ত্র শুধু অথর্ব, তাও যেমন সত্যি আবার ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাও অনেক সময় উন্নতির পরিপন্থী। ট্রেড ইউনিয়ন এমন সব ব্যবস্থা নেয় তার এক কথায় সারাংশ হচ্ছে 'আসি যাই মাইনা পাই, কাজ চাও তো বোনাস দাও'। আবার সেই ওয়ার্ক কালচার। বর্তমানে অনেক সমাজবিজ্ঞানীরা দেখাচ্ছেন শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথায় চালিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে ধ্বংস করেছে। বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নের তুলনা করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন বড্ড বেশি 'চলবে না, চলবে না' থিওরিতে বিশ্বাসী। কীসে চলে তার তত্ত্ব জানা নেই।

তৃতীয়ত, দেশের উন্নতি ও রাজ্যের উন্নতি নির্ভর করে কিছুটা শিক্ষার গুণগত মান ও সামগ্রিক গড়ের উপর। অনেক রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তাতে আর যাই হোক শিক্ষা হয় না। কেরল বা অন্য অনেক রাজ্য শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত উন্নতি করেছে। আর শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও কমেছে। পঞ্জাবে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে 'নতুন নতুন' চাকরির উৎস তৈরি হচ্ছে। উন্নতিও দ্রুত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতবর্ষে এখন একটি 'গড়' রাজ্য। অর্থাৎ উন্নতিও তেমন কিছু নেই আর বিহারের মতো অবস্থাও নয়। সর্বক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা মাঝামাঝি। বিহার থেকে আমরা উন্নত হয়তো এটাই আমাদের আত্মপ্রসাদ ও আত্মশান্তি।

ত্রিশ বছরে রাজ্যগুলিতে অসম উন্নতির ফলে দেশ কোন্ দিকে যাচ্ছে?

ভারতবর্ষে উন্নতি বিভিন্ন অঞ্চলে বা রাজ্যে কেমন হয়েছে তার মাপকাঠি নিয়ে নানান তর্ক। মাপকাঠি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে সাধারণভাবে একটা মাপকাঠির উপর জোর দেওয়া হয় তার নাম মাথাপিছু আয়। মাথাপিছু আয় একটা গড় হিসাব। তাই অনেকে মনে করে দেশের অনৈক্য এই মাপকাঠিতে ধরা পড়ে না। যদিও মাথাপিছু আয় একটা বিশেষ পদ্ধতি যাতে অনৈক্য ধরা পড়ে না, জীবনযাত্রার গুণগত মান ধরা পড়ে না, তথাপি বিশ্ব সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস ও ভারতবর্ষে এই মাপকাঠি বহুল প্রচলিত।

এই মাসে ভারতের বর্তমান যোজনা পরিষদ একটি সমীক্ষা বের করেছে। বিষয়বস্তু যোজনা ভারতবর্ষে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে। এই যোজনায় বিভিন্ন রাজ্যে কেমন উন্নতি হয়েছে, তুলনা করা হয়েছে ১৯৬০-৬১ সালের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে ১৯৯৩-৯৪ সালের মাথাপিছু আয়ের। মাথাপিছু আয়ের লিগ টেবিল তৈরি করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন কি ধরনের তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

এক) ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পঃ বঙ্গের স্থান ছিল তৃতীয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্থান কমতে কমতে এখন এগারোতম। আরও আশ্চর্যের কথা এত যোজনা পরিকল্পনা পঞ্চায়েত, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও ভারতের উন্নতির লিগ টেবিলে ভারতের গড় মাথাপিছু আয় থেকে পঃ বঙ্গের মাথাপিছু আয় কম। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছর পরে হিসেবে দেখা যাচ্ছে পঃ বঙ্গ অন্তত মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বড় জোর একটি গড় রাজ্য। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে বিশেষ উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

দুই) পূর্ব ভারতের রাজ্য বিহারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ১৯৬০-৬১ সালে বিহার ১৮টি রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে নিচে অথবা ১৮তম ছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে বিহারের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এখনও ১৮তম বা সবচেয়ে নিচে। অর্থাৎ পূর্ব ভারতের এই রাজ্যটি দীর্ঘতম। আগেও তা ছিল এখনও তা আছে।

তিন) পূর্ব ভারতের অসমের অবস্থা এমন কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। ১৯৬০-৬১ সালে অসমের মাথাপিছু আয় হিসেবে স্থান ছিল অষ্টম এখন কমতে কমতে স্থান ১২তম। পঃ বঙ্গের ঠিক পরেই। অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ তুলনায় আপেক্ষিকভাবে অসমের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়েছে।

চার) কিছু কিছু রাজ্য এগিয়ে চলেছে। ১৯৬০-৬১ সালে হরিয়ানার স্থান ছিল রাজ্যগুলির মধ্যে সপ্তম। ১৯৯৩-৯৪ সালে হয়েছে চতুর্থ। কেরলের স্থান ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১৩তম। কেরল ১৯৯৩-৯৪ সালে হয়েছে দশম। কর্নাটকের স্থান ছিল ১৯৬০-৬১ সালে নবম ১৯৯৩-৯৪ সালে সপ্তম। ১৯৬০-৬১ সালে পঞ্জাবের স্থান ছিল চতুর্থ—পঃ বঙ্গের পরে। ১৯৯৩-৯৪ সালে পঞ্জাবের স্থান হয়েছে দ্বিতীয়। মধ্যপ্রদেশের স্থান ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১৪তম—এখন ১৩তম। অর্থাৎ লিগ টেবিলে কেরল, হরিয়ানা, পঞ্জাব, কর্নাটক ও মধ্যপ্রদেশ উন্নতি করেছে। কেউ যৎসামান্য যেমন মধ্যপ্রদেশ, কেউ লাফ দিয়েছে যেমন পঞ্জাব।

পাঁচ) ১৯৬০-৬১ সালে মহারাষ্ট্রের স্থান ছিল দ্বিতীয়—দিল্লির পরে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থান কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে মহারাষ্ট্রের স্থান তৃতীয়। দ্বিতীয় স্থান এখন পঞ্জাবের।

ছয়) দিল্লির কথা অবশ্য আলাদা। দিল্লি এখন একটি রাজ্য বলে পরিগণিত। ১৯৬০-৬১ সালে দিল্লি সর্বপ্রথমে ছিল মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে। ১৯৯৩-৯৪ সালেও দিল্লির মাথাপিছু আয় সর্বপ্রথমে।

সাত) মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা যে ভারতের গড় মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দিল্লির মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ। আর গড় মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পঞ্জাবের মাথাপিছু আয় ৭৮ শতাংশ বেশি।

আট) ভারতের রাজ্যগুলিকে এখন তিনভাগে ভাগ করা হচ্ছে। কিছু রাজ্যের মাথাপিছু আয় ভারতীয় গড় থেকে অনেকটাই বেশি। উন্নতি এইসব রাজ্যে দ্রুত হচ্ছে। এই প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলি হচ্ছে—১) দিল্লি ২) পঞ্জাব ৩) মহারাষ্ট্র ৪) হরিয়ানা ৫) গুজরাট। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যগুলি বড় জোর গড় রাজ্য। সাধারণভাবে ভারতীয় গড়ের কিছু উপরে যেমন ৬) তামিলনাড়ু ৭) কর্নাটক। আবার গড়ের সামান্য নিচুতে যেমন ৮) হিমাচলপ্রদেশ ৯) অন্ধ্র ১০) কেরল ১১) পঃ বঙ্গ। আবার গড়ের বেশ কিছুটা নিচে যেমন ১২) অসম ১৩) মধ্যপ্রদেশ ১৪) রাজস্থান ১৫) উত্তরপ্রদেশ ১৬) ওড়িশা ১৭) জম্মু কাশ্মীর ১৮) বিহার। অর্থাৎ ১৮টি রাজ্যের মধ্যে মাথাপিছু আয় ভারতীয়

গড়ের থেকে বেশি মাত্র সাতটি রাজ্যের আর ১১টি রাজ্যের মাথাপিছু আয় ভারতীয় গড়ের থেকে অনেকটাই কম। আরও লজ্জার কথা বিহারের তুলনায় দিল্লির মাথাপিছু আয় প্রায় চারগুণ বেশি। দিল্লির মাথাপিছু আয় ওড়িশা থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি। আর পঃ বঙ্গের থেকে প্রায় দ্বিগুণ।

মাথাপিছু আয় ১৯৯৩-৯৪

	রাজ্যের নাম	মাথাপিছু আয় রুপি হিসেবে
(১)	দিল্লি	১৪৭১৪
(২)	পঞ্জাব	১২৩১৯
(৩)	মহারাষ্ট্র	১০৯৮৪
(৪)	হরিয়ানা	১০৩৫৯
(৫)	গুজরাট	৭৬০০
(৬)	তামিলনাড়ু	৭৩৫২
(৭)	কর্নাটক	৭০২৯
(৮)	হিমাচলপ্রদেশ	৬৫১৯
(৯)	অন্ধ্র	৬৪৮৯
(১০)	কেরল	৬২৪২
(১১)	পঃ বঙ্গ	৬০৫৫
(১২)	অসম	৫৯১৬
(১৩)	মধ্যপ্রদেশ	৫৪৮৫
(১৪)	রাজস্থান	৫২২০
(১৫)	উত্তরপ্রদেশ	৪৭৪৪
(১৬)	ওড়িশা	৪৭২৬
(১৭)	জম্মু-কাশ্মীর	৪২৪৪
(১৮)	বিহার	৩৬৫০

(ভারতীয় গড় মাথাপিছু আয় ৬৯২৯ টাকা)

ভারতে অসম উন্নতি হয়েছে। কেন একটা রাজ্য পিছিয়ে যাচ্ছে আর অন্য রাজ্যগুলি এগিয়ে যাচ্ছে তাই নিয়ে একটি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবে অনৈক্য ও অসম উন্নতি নিয়ে নানা সমস্যা দেখা যায়।

রাজ্যের মধ্যেও আবার অঞ্চলে অঞ্চলে উন্নতির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ ও কোঙ্কণ অঞ্চলে তেমন উন্নতি হচ্ছে না। অন্ধ্রের গরিব অঞ্চল আরও গরিব হচ্ছে। পঃ বঙ্গেও অসম উন্নতি। উত্তরবঙ্গের উন্নতি পঃ বঙ্গের সামগ্রিক উন্নতি থেকে অনেকটাই কম। সেটা অবশ্যই সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই প্রমাণ করা যায়।

আজকাল 'অসম' উন্নতি নিয়ে আলোচনা সর্বত্রই হচ্ছে। এই মাসে খাদ্য

নিয়ে রোমে যে শিখর সম্মেলন ও বিশ্ব সম্মেলন হয়ে গেল তাতেও আঞ্চলিক অনৈক্য নিয়ে নানা কথা হয়েছে। আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গা নিয়ে বোম সম্মেলনে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। রোম সম্মেলনে বিশ্বের নেতারা একমত হয়েছেন, আঞ্চলিক বৈষম্যর থেকে নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা ও আলোচনা আজকের অর্থনীতিতে কোনো নিষিদ্ধ বস্তু নয়। ভারতের অভিশাপ এই যে উন্নতি কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ফলে চতুর্দিকে আজ নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি।

একই শাসনব্যবস্থা, নির্বাচন পদ্ধতি, বিচার প্রথা তবুও বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নতির বৈষম্য

একটা আশ্চর্য ব্যাপার ভারতের অর্থনীতিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একই দেশ, একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা, এই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি, একই বিচার প্রথা অথচ রাজ্যে রাজ্যে উন্নতির বৈষম্য প্রবল। বৈষম্য যদি কমত তা হলে বলার কিছু থাকত না। বৈষম্য কমার বদলে দেখা যাচ্ছে ক্রমাগত বাড়ছে। আর তার ফলে আমাদের ফেডারেশন সিস্টেমের ভবিষ্যৎ কি তাই নিয়ে অনেকেরই চিন্তা।

আলোচনার সূত্রপাত করেন একজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ। তাঁর সমস্যা ছিল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং একই ধরনের প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম্ অফ গভর্নমেন্ট ব্রাজিলের মতো, অথচ ব্রাজিল বহু পিছিয়ে আছে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখন একমাত্র সুপারপাওয়ার। অথচ ব্রাজিলের আয়তন আমেরিকা থেকে বিশেষ কম নয়। তবে ব্রাজিল কেন অনুন্নত আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কেন প্রভূত বলশালী? এর সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে? আবার বলা হয় একটি অঞ্চল বা দেশ উন্নত তার কারণ, তার বহুল পরিমাণে কাঁচামাল, লৌহ আকর বা যাকে বলি রিসোর্স তা আছে। একটা দেশ উন্নত যদি তার রিসোর্স থাকে, আর অনুন্নত যদি না থাকে। তবে সেই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ যাঁর নাম ডগলাস নর্থ এই তত্ত্ব মানতে চান না। জাপান বা সুইডেনের তেমন কোনো রিসোর্স নেই, অথচ আফ্রিকার কঙ্গো বা সিয়েরা লিওনে অফুরন্ত যাকে বলা হয় রিসোর্স। জাপানের উন্নতির সঙ্গে কঙ্গোর কোনো তুলনাই হয় না। উন্নতির এই বৈষম্যের কারণ কি? ডগলাস নর্থ একটি মাত্র হাইপোথেসিস নেননি। তিনি নানান ভাবে এর বিচার করে জানাচ্ছেন কারণ বহুবিধ। যেমন আমেরিকা যুক্তরাজ্যে সবাই জানে যে বিচার-পদ্ধতি অতি দ্রুত আর মোটামুটিভাবে সব

সন্দেহের উর্ধ্বে। আমেরিকানরা কোর্টে গেলে জাস্টিস পাবে, অথচ ব্রাজিলে তা সম্ভব নয়। ব্রাজিলের বিচার ব্যবস্থা এতই ত্রুটিপূর্ণ যে বিচারের রায় বের হতে বছর কুড়ি লেগে গেলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। বৈষম্যের কারণ নানাবিধ এবং অনেক কারণই অজানা। কোনো কোনো দেশে দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যার ফলে উন্নয়নের অর্থ দরিদ্র শ্রেণীর হাতে পৌঁছয় না। আবার পাবলিক সারভেন্ট ব্যুরোক্রেসি নিজেকে সারভেন্ট না ভেবে 'মাস্টার' ভাবেন। কাজের কাজ কিছু হয় না। আবার কোথাও কোথাও রাজনীতি 'Bad Money Drives out good Money out of Circulation.'

কোথাও কোথাও আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদদের বন্দী। পুলিশ দুর্নীতিপরায়ণ তখনই হয় যখন রাজনীতিবিদদের সব অন্যায় আবদার মানে। সিঙ্গাপুরের বর্তমানে মাথাপিছু আয় ফ্রান্সের কাছাকাছি। আর সিঙ্গাপুরের পুলিশ বা ব্যুরোক্রেসিকে রাজনীতিবিদরা কখনোই কুক্ষিগত করতে পারেনি, কোনো 'ফোন কলে' কাজ হয় না। ডগলাস নর্থ বলতে চাইছেন যে 'আইনের শাসন' সিঙ্গাপুরে আছে বলেই সিঙ্গাপুর উন্নত। রাজনীতিবিদদের কাজ আইন তৈরি করা। তা কিভাবে কার্যকরী হবে তার দায়িত্ব ব্যুরোক্রেসি আর পুলিশের। রাজনীতিবিদরা হস্তক্ষেপ করতে গেলে বা অন্যায় করলে তার শাস্তির বিধান সিঙ্গাপুরে আছে। তাই সিঙ্গাপুর উন্নত।

ভারতের কথাই ধরা যাক। ভারতে উন্নতির খরচ ক্রমশ বাড়ছে। শুধু গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। অথচ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ প্রকল্প সাফল্য লাভ করেছে। কোনো কোনো রাজ্যে গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প ১০০ শতাংশ সফল আবার কোথাও তার অর্ধেকেরও কম। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন উন্নতির ধারা দেখা যাচ্ছে। এক ধরনের রাজ্যে উন্নতি দ্রুতহারে হচ্ছে আর অন্য কয়েকটি রাজ্যে উন্নতি তো হয়নি বরং অবনতি।

আমাদের দেশে ন্যাশনাল সামপেল সারভে (NSS) খুবই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। বিশ্বজোড়া তাদের নাম ডাক। তারা কিছুদিন আগে বিভিন্ন রাজ্যে কি ধরনের উন্নতি হয়েছে তার সংখ্যাতত্ত্ব বের করেছে। তা নিচে দেওয়া হল।

সারণী ১

বিভিন্ন রাজ্যে উন্নতির ধারা (মাথাপিছু) শতকরা হিসেবে

রাজ্যের নাম	১৯৮১-৯১	১৯৯২-৯৭
পঞ্জাব	৩.৩	২.৮
মহারাষ্ট্র	৩.৭	৭.৪
হরিয়ানা	৩.৯	২.৬
গুজরাট	৩.৩	৮.৬

পঃ বঙ্গ	২.১	৪.৯
কর্নাটক	৩.১	৩.৪
কেরল	২.২	৪.৯
তামিলনাড়ু	৪.১	৫.২
অন্ধ্র	২.৬	৩.৮
মধ্যপ্রদেশ	২.৬	৪.১
উত্তরপ্রদেশ	২.৬	১.৮
ওড়িশা	০.৯	১.৫
রাজস্থান	৪.৭	৩.৯
বিহার	২.৬	০.৭

(Minus) (NSS Data)

রাজ্যগুলিকে এখন তিনভাগে ভাগ করা হচ্ছে। দ্রুত উন্নতশীল রাজ্য—এর মধ্যে আছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু। এর মধ্যে গুজরাটের মাথাপিছু আয়ের উন্নতির হার অনেক উন্নত দেশ থেকে বেশি। এমনকি যাদের এশিয়ান ব্যাঘ্র বলা হচ্ছে তার থেকেও বেশি। এক মেরুতে আছে গুজরাট আর অন্য মেরুতে আছে বিহার।

বিহারে ভারতের সবচেয়ে বেশি রিসোর্স। অথচ দেখা যাচ্ছে উন্নতির হার এখানে শূন্য থেকেও কম বা নেগেটিভ। বিহার যেন পিছু হাঁটছে। বিহার নেগেটিভ মানে ১৯৯২-৯৭ সালে উন্নতি হওয়ার বদলে অবনতি হয়েছে। ঠিক এই ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে বড় বড় কয়েকটি রাজ্যে—যারা প্রধানত হিন্দিভাষী। এদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ একটি। আর অন্যটি অহিন্দি ওড়িশা। অথচ ওড়িশার রিসোর্স বিহারের থেকে কম নেই—অন্তত গুজরাট থেকে বেশি। কয়েকটি রাজ্যকে এখনি বলা হয় BIMARU রাজ্য অর্থাৎ অসুখে বা বিমারে ধুঁকছে। বিমারু রাজ্যগুলির মধ্যে আছে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ। এই রোগগ্রস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান হাঁটি হাঁটি করেও এগুচ্ছে। পেছনে পড়ে আছে বিহার ও ওড়িশা।

একদিকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র আর অন্যদিকে বিহার ও ওড়িশা। তার মাঝে উন্নতির দিক থেকে মধ্য উন্নতির হার কিছু কিছু রাজ্যে হয়েছে। তার মধ্যে আছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, কেরল, কর্নাটক ও পঃ বঙ্গ।

উন্নতির হারের কারণ হিসেবে NSS দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছে। আমাদের মতো দেশে উন্নতি ত্বরান্বিত হয় যদি কৃষি ও শিল্প—দু'ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। কোনো কোনো রাজ্যে শিল্প ও কৃষির একই সঙ্গে উন্নতি হয়েছে—তারা মুখ্যত মহারাষ্ট্র, গুজরাট আর তামিলনাড়ু। আবার কোনো কোনো রাজ্য শিল্পে যতটা অগ্রসর হয়েছে কৃষিতে ততটা হয়নি—কর্নাটক। বস্তুত হাইটেক শিল্পে বর্তমানে কর্নাটক প্রভূত উন্নতি করেছে। বলা হচ্ছে

শিল্পের উন্নতিতে কর্নাটক অন্য রাজ্যগুলিকে ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। আমরা আজকে যাকে বলি Knowledge Intensive Industry তাতে কর্নাটক অন্য সব রাজ্যগুলিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সফ্‌টওয়ার শিল্প, কম্পিউটার শিল্প যাকে বলা হয় ইনফরমেশন টেকনোলজি তাতে কর্নাটক লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি চাকরির সৃষ্টি কর্নাটকেই হয়েছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রিসার্চেও কর্নাটক অগ্রণী। অর্থাৎ যাকে আমরা R&D বলি তাতে দেখা যাচ্ছে কর্নাটকে যা সম্ভব হচ্ছে অন্য রাজ্যে তা হয়নি। NSS আরও একটা কথা বলছে যে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলি দক্ষিণ ভারতে যতটা সাফল্য লাভ করেছে উত্তর ভারতে তা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ যাকে 'মা-জাতীয়' রাজ্য বলা হচ্ছে এখানে উন্নতির হার প্রায় সবটাই কৃষি উন্নতির জন্য হয়েছে। কৃষি উন্নতি দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় যা দ্রুত হয়েছে তা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে হয়নি। অথচ থিওরি অনুযায়ী কৃষি বিপ্লব হবার কথা। অনেক শিল্পই পঃ বঙ্গ থেকে বাইরে চলে গেছে অথবা রুগ্ন। এর কারণ কি? কেউ বলে পরিষেবার অভাব, কেউ বলে ট্রেড ইউনিয়ন অনেক সময়ই লাগামছাড়া, কেউ বলে ব্যুরোক্রেসি এখনও শিল্পবন্ধু হতে পারেনি। প্রশ্ন উঠতে পারে শিল্পবিপ্লব কি কৃষিবিপ্লব ছাড়া বজায় রাখা যায়? পঃ বঙ্গে উল্টো প্রশ্নও আছে কৃষিবিপ্লব কি শিল্পবিপ্লব ছাড়া বহন করা যায়?

তবে ভারতের সমস্যা বিহারের মতো রাজ্যগুলিকে নিয়ে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৪০ শতাংশই প্রতি বছরে যোগ করছে। বিহারে বা উত্তরপ্রদেশে চাকরির অভাব ভূমি সংস্কার হয়নি, হবার কোনো লক্ষণ নেই। ফলে এইসব অঞ্চল থেকে প্রভূত পরিমাণে MIGRATION বা স্বরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাচ্ছে। ফলে অন্য রাজ্যেও জনসংখ্যার হার যা নর্মাল রেট তার থেকে বাড়ছে আর শহরে শহরে বস্তির সংখ্যা স্ফীত হচ্ছে। অসম উন্নতি হলে এটা হবেই। বিহারে কেন উন্নতি হচ্ছে না তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। হয়নি এবং হচ্ছে না—এটাও সত্যি।

অর্থাৎ ভারতে রাজ্যে রাজ্যে অসম উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পঞ্জাবের মাথাপিছু আয় ২১২৪ ডলার আর সেখানে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ ৬০০ ডলারের নিচে। উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশাও প্রায়ই তাই। এটা অবশ্য U.N.O. তাদের ১৯৯৭ সালের রিপোর্টে জানাচ্ছে। অর্থাৎ রাজ্যে রাজ্যে অনৈক্য আছে এবং অনেক জায়গায় সেটা বাড়ছে। অথচ সবাই আমরা একই আইন এবং শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই আছি। এই বৈষম্যের কারণ ঠিক কি হতে পারে তাই নিয়ে অন্তত রাজনীতিবিদদের এক আত্মসমালোচনা দরকার। যেটা এখনও হয়নি। 'চলতা হ্যায়' রাজনীতিতেই কিছু লোকের লাভ।

অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই কি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়? জিজ্ঞাসা থেকেই যায়

অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই কি সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করা সম্ভব? সামাজিক কল্যাণ কথাটির নানান অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে যে, দেশে যদি উন্নতি হয় তবে আপেক্ষিক সাম্য বা ইকোয়ালিটি বা আয়ের বন্টন ব্যবস্থা কি সুষম হতে বাধ্য। অর্থাৎ গ্রোথ আর সাম্য কি একই সঙ্গে যেতে পারে বা যায়? দেশের আয়ের যদি বৃদ্ধি হয় তবে বড়লোক আর গরিব লোকদের মধ্যে তফাত দূর হবে না বাড়বে।

এই নিয়ে রাশিয়ান-আমেরিকান অর্থনীতিবিদ কুজনেট্ একটি তথ্য দেন। তাঁর মতে দেশে উন্নতি হলেই যে আয়ের বৈষম্য দূর হবে তা প্রমাণ করা যায় না। অন্তত প্রথম দিকে আয় যত বাড়বে অনৈক্য তত বাড়তে পারে। আয় যদি অনেকটাই বাড়ে তবে অনেক পরে হয়তো সাম্যর দিকে সমাজ ব্যবস্থা যাবে। অন্তত কুজনেট্ বলতে চাচ্ছেন আয় বাড়লেই বৈষম্য কমবে এবং তৎক্ষণাৎ কমবে এমন আশা করা যায় না। বস্তুত কুজনেট্ বিভিন্ন দেশের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে যে অর্থনীতির মূলসূত্র বের করেছেন তাতে বলা আছে অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই সামাজিক উন্নতি তাৎক্ষণিক হবে এমন আশা করা যায় না। সোজা মানে অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই দেশে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবেই তা বলা যায় না।

কুজনেটের তত্ত্ব অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত ধারণার বিপক্ষে। প্রচলিত ধারণার ধারক ও বাহক আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা আই এম এফের কিছু অর্থনীতিবিদ। তাঁদের ধারণায় আয়ের আয়তন বা যাকে ইনকাম কেক বলা হচ্ছে তা যদি বাড়ে তবে বন্টন ব্যবস্থা উন্নততর হবে। গরিব ও বড়লোকের বিভেদ ক্রমশ কমে আসবে। এঁদের মতে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি যদি ত্বরান্বিত করা যায়, যদি দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো যায় তবে বন্টন ব্যবস্থাও ভালো

হতে বাধ্য। এই আই এম এফ অর্থনীতিবিদদের মতে, জাতীয় আয় আর সামাজিক ন্যায় পরস্পরের পরিপূরক এবং আয় বাড়াটা হচ্ছে আদি 'কারণ' বা যাকে বলা হচ্ছে Cause আর আয়ের সুষম বন্টন হচ্ছে তার 'ফল' বা Effect অর্থাৎ জাতীয় আয় বাড়লেই সাম্য বাড়বে। এই দুটোর সম্পর্ক Cause-effect দ্বারা পরিচালিত।

কুজনেটের পরে অমর্ত্য সেন প্রমুখ অনেক অর্থনীতিবিদ বলতে চান যে জাতীয় আয় বাড়লে সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি এমন উদাহরণ ভুরিভুরি। জাতীয় আয় বাড়ছে অথচ দেখা যাচ্ছে দেশের বন্টন ব্যবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। সামাজিক কল্যাণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্রতর লোকদের অবস্থার যদি উন্নতি করতে চাই তবে আলাদা ও পৃথকভাবে নীতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে দেশে শিল্প বাড়ছে অথচ চাকরি কমছে। কৃষির উৎপাদন বাড়ছে অথচ অসংখ্য শিশু অপুষ্টিতে বা ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগছে। সুতরাং আয় বাড়লেই সব সামাজিক সমস্যার সমাধান আশু করা সম্ভব তা বলা যায় না।

ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। বহুদিন ধরে আমাদের জাতীয় আয় ৩.৫ হারে বাড়ছিল। এর পরিবর্তন বিশেষ হয়নি—কোনো যোজনাতেও হয়নি। 'ভদ্রলোকের এক কথা'র মতো আমাদের জাতীয় উন্নতির হার ছিল ৩.৫ শতাংশ। এই ৩.৫ শতাংশ জাতীয় আয়ের উন্নতিকে মাঝে মাঝে বলা হয় 'হিন্দু রেট অফ গ্রোথ'। অর্থাৎ যে দেশে হিন্দুরা সংখ্যাধিক্য সেই দেশে উন্নয়নের সীমারেখা ৩.৫ শতাংশ। চেষ্টা করলেও বাড়ানো বা কমানো যাবে না।

কিন্তু 'হিন্দু রেট অফ গ্রোথ' কথাটি দেখা গেল অর্থহীন। কারণ ১৯৯২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির হার প্রায় ৬.৪ শতাংশ অর্থাৎ হিন্দু রেট অফ গ্রোথের প্রায় দ্বিগুণ। অথচ এই জাতীয় উন্নতিতে অপুষ্টি দূর হয়েছে কি?

ইউনিসেফ একটি রিপোর্ট বের করেছে। রিপোর্টটির নাম 'The progress of Indian States —আর এই রিপোর্টে বলা আছে আমাদের জাতীয় আয বাড়লেও ৭৫ মিলিয়ন পাঁচ বছরের শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। অর্থাৎ আমাদের পাঁচ বছরের নিচে যত শিশু আছে তার প্রায় ৬৩ শতাংশ অর্ধ আহার বা প্রায়শ অনাহার অথবা অপুষ্টিতে ভুগছে। আর অপুষ্টি শিশুর সংখ্যা আমাদের দেশে পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। সাহারার নিচে যে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি আছে তাদের সাধারণত পশ্চাৎপদ রাষ্ট্র হিসেবেই ধরা হয়। তাদের তুলনায় প্রতি হাজারে আমাদের অপুষ্টি রোগে ভুগছে শিশুর সংখ্যা হবে—সাহারার রাষ্ট্র থেকে দ্বিগুণ। তার বহুবিধ কারণ আছে তার মধ্যে হচ্ছে আয়ের বন্টন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মোট কথা ভারতে জাতীয় আয় বাড়ছে অথচ অপুষ্টি বা

ম্যালনিউট্রেশনে ভুগছে এমন শিশু ৭৫ মিলিয়ন।

জাতীয় আয় বাড়া মানে কি জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি? এই প্রশ্নের উত্তর.দেবার জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয় কোপেনহেগেনে। কোপেনহেগেন কনফারেন্সে একটাই আলোচনার বস্তু ছিল, সেটা হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে জাতীয় আয় বাড়ছে, জাতীয় বিনিয়োগ বাড়ছে. অথচ বেকারি বাড়ছে আর দারিদ্র্যও বাড়ছে। পৃথিবীর যা লোকসংখ্যা তার ৫০ শতাংশ মাথাপিছু আয় ৪ ডলারের নিচে। আর আমাদের দেশে প্রায় ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে মানে মাথাপিছু আয় ১ ডলারের কম, সেই রকম দারিদ্র্যসীমার নিচে খোদ আমেরিকায় প্রায় ২৫ শতাংশ আর ইউরোপের অনেক দেশে ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। কোপেনহেগেন কনফারেন্সে আরও একটি তথ্য বের করা হয়—আমেরিকাতে আয়ের বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। অর্থাৎ টেকনোলজিক্যাল বিপ্লবে দেখা যাচ্ছে আমেরিকার বড় লোকরা আরও বড়লোক হচ্ছে আর গরিব লোকরা আরও গরিব হচ্ছে। জাতীয় আয়ের বৈষম্য দ্রুত হারে বাড়ছে ব্রাজিল, পেরুতে আর ঘানায়। কোপেনহেগেন কনফারেন্সে আরও একটি বক্তব্য পরিষ্কার। আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক দেশে যে গৃহযুদ্ধ দেখা যাচ্ছে তা জাতীয় সমস্যা বলেই ভাবা হচ্ছে বা Ethnic Conflict কিন্তু আসল কারণ জাতীয় আয়ের বৈষম্য ক্রমাগত আফ্রিকায় বেড়ে যাচ্ছে।

কোপেনহেগেনের কনফারেন্স হয় ১৯৯৫ সালে। তারপরে ২০০০ সালে জুন মাসে জেনিভাতে (২০ জুন থেকে ৩০ জুন) ইউনাইটেড নেশনস আরো একটি কনফারেন্স ডাকে। এই জেনিভাতে আরও বেশি দেশ যোগদান করে—আর কিছু বেসরকারি সংস্থাও বা NGO-রা এখানে আসে। সমস্যা একটাই। পৃথিবীব্যাপী কি জাতীয় আয়ের বন্টন ব্যবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে আর তার ফলে সামাজিক সমস্যা কি ধরনের এবং শিল্প বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব, গ্লোবালাইজেশন, লিবারেশন, বেসরকারিকরণ দেশকে এবং জাতিকে কোন্‌দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

জেনিভার সামাজিক কনফারেন্স থেকে যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা সবাইকে চিন্তান্বিত করতে বাধ্য। বড়লোকরা আরও বড়লোক হচ্ছে আর গরিবরা আরও গরিব হচ্ছে—এটাই আসল উপসংহার।

যেমন পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বাড়ছে কিন্তু মাত্র ৫ শতাংশ লোক এই বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা ভোগ করছে। পৃথিবীব্যাপী বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। কিন্তু ৬৪ শতাংশ লাভ মাত্র উপরের ৫ শতাংশ ভোগ করছে। আর শেষের দিকে পৃথিবীর যে দরিদ্রতম ৫ শতাংশ লোক আছে তারা বাণিজ্য প্রসার থেকে আর বিদেশী বিনিয়োগ থেকে মাত্র ১ শতাংশ লাভ করছে। অন্য ভাষায় বলা যাক,

পৃথিবীর বাণিজ্য প্রসারের লাভ উপরের ধনী শ্রেণী ৫ শতাংশ কুক্ষিগত করেছে আর দরিদ্রতম ৫ শতাংশ সামান্য ছিটেফোঁটা পাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী এটাই চিত্র।

পৃথিবীব্যাপী ২০০ জন সবচেয়ে ধনী লোকের আয় ছিল ১৯৯৪ সালে ৪৪০ মিলিয়ন ডলার! কিন্তু ২০০ জন ধনী লোকের আয় ১৯৯৪ সাল থেকে বেড়ে ১৯৯৮ সালে হয়েছে ১,০০০০০০,০০০০০০,০০০০০০ ডলার বা এক ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ একের পরে আঠারোটি শূন্য। পৃথিবীতে প্রথম দশটি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের যুগ্ম আয় পৃথিবীর ৮২টি অনুন্নত দেশের যুগ্ম জাতীয় আয়ের থেকে বেশি। পৃথিবীতে ৫২টি কোম্পানি বা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন আছে যারা ১০০টি দেশের অর্থনীতিকে বলা যায় নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে জেনিভার সামাজিক কল্যাণ সভায় কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার।

১) প্রত্যেক দেশে উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও উন্নত আর অনুন্নত দেশের মধ্যে অসাম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২) অনুন্নত দেশে উন্নতির সুফল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ।

৩) উন্নত কি অনুন্নত সব দেশেই বিনিয়োগ বাড়া সত্ত্বেও বেকারি বাড়ছে।

৪) দারিদ্র্যসীমার নিচে লোক শুধু অনুন্নত দেশেই নয়, উন্নত দেশেও আছে—এমনকি আমেরিকায়ও প্রচুর। আমেরিকাতে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আয়ের বৈষম্য বা যাকে বন্টন ব্যবস্থা বলে তা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আর এই প্যাটার্ন পৃথিবীতে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র আরও দরিদ্রতর হচ্ছে। অথচ দেশের সামগ্রিক জাতীয় আয় বাড়ছে। আর এটাই হচ্ছে 'উন্নতির প্যারাডক্স'।

ভারতবর্ষে বন্টন ব্যবস্থা কেমন? আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ তথাকথিত হিন্দু রেট অফ গ্রোথের সীমানা ছাড়িয়ে চলছে। তবে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট তাদের বাৎসরিক রিপোর্টে জানাচ্ছে যে ভারতবর্ষে 'অনৈক্য' বা যাকে বলি ইনইকোয়ালিটি তার পরিবর্তন বেশি কোথাও হচ্ছে না।

ভারতবর্ষে যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে তার সারাংশ নিচে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

১) জনসংখ্যার প্রথম ২০ শতাংশ অর্থাৎ যারা বড়লোক তারা জাতীয় আয়ের ৪১.৪ শতাংশ সম্পদের অধিকারী।

২) জনসংখ্যার প্রথম ১০ শতাংশ যারা অত্যধিক বড়লোক তারা জাতীয় সম্পদের প্রায় ২৭ শতাংশ সম্পদের অধিকারী।

৩) জনসংখ্যার যারা সবচেয়ে গরিব এই ২০ শতাংশ জাতীয় সম্পদের মাত্র ৮ শতাংশ সম্পদের অধিকারী।

৪) জনসংখ্যার যারা অত্যধিক গরিব সেই ১০ শতাংশ জাতীয় সম্পদের মাত্র ২ শতাংশ নিচে সম্পদের অধিকারী।

অর্থাৎ যারা সবচেয়ে বড়লোক সেই ১০ শতাংশ আমাদের সম্পদের ২৭ শতাংশের অধিকারী। আর যারা সবচেয়ে গরিব সেই ১০ শতাংশ আমাদের সম্পদের ২ শতাংশর নিচে সম্পদের অধিকারী। অর্থাৎ সর্বত্রই 'উন্নতি' হচ্ছে কিন্তু বন্টন ব্যবস্থা (বাম শাসিত বা অ-বাম শাসিত) রাজ্যে কোথাও বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ জেনিভায় বলা হচ্ছে আয়ের উন্নতি মানেই আয়ের সাম্য নয়।

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য দেশকে মাঝেমাঝে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বা যাকে বলা হচ্ছে মানব বিকাশ রিপোর্ট বের করতে হবে। তার কারণ দেশের উন্নতি কি ধরনের হচ্ছে তার একটা স্বচ্ছ ধারণা সবাই যেন করতে পারে। এই ধরনের রিপোর্ট থাকলে অঞ্চলে অঞ্চলে তুলনা করা যায় এবং একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশেরও তুলনা সম্ভব। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কথা অনুযায়ী ১৩৫টি দেশ রিপোর্ট প্রস্তুত করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে জমা দিয়েছে। আমাদের যোজনা কমিশন অনেক গড়িমসি করে অনেক সময় নিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বের করেছে যা অনেক ক্ষেত্রে মূল্যহীন। কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরনো অনেক তথ্য দিয়ে ২০০২ সালে যোজনা কমিশন একটি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বের করেছে। যা হোক নাই মামা থেকে কানা মামা ভালো। ১৩৫টি দেশ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ভারতবর্ষ ১৩৬তম দেশ। আমাদের আগে মায়ানমার, ওদের দেশে এত গৃহযুদ্ধ ও সমস্যা থাকলেও রিপোর্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘে জমা দিয়েছে।

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বা মানব বিকাশ কাকে বলে তাই নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক। আগে ধারণা করা হচ্ছিল যে, একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে মাথাপিছু আয়ের উপর। যত মাথাপিছু আয় বাড়বে দেশের তত উন্নতি হবে। এখন এই ধারণা বর্জন করা হচ্ছে। উন্নতি জিনিসটা সামগ্রিক। মাথাপিছু আয় বাড়া যেমন দরকার, তেমন দরকার শিক্ষার হারের উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, আয়ুর বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি, দারিদ্র্য মোচন এবং আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ। অর্থাৎ 'উন্নতি' শুধু আয় নয় আরও 'অনেক কিছু'। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেন এই ধরনের উন্নতি মাপার জন্য নানান তত্ত্ব দিয়েছেন। এই তত্ত্বটি অমর্ত্য সেন ছাড়াও পাকিস্তানের মহবুব উল হক এবং আরও অনেক বিদেশী অর্থনীতিবিদরা

দিয়েছেন। তাঁদের কথা রাষ্ট্রপুঞ্জ মেনে নিয়ে প্রত্যেক দেশই যেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করে তার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে ভারতও হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ও রিপোর্ট কিছুদিন আগে তৈরি করেছে।

ভারতবর্ষে রিপোর্টটি বিশালকায় ২৯৭ পৃষ্ঠা। কিছু কিছু ফাঁকিবাজি আছে। কোনো কোনো সংখ্যা ১৯৯১ পর্যন্ত আবার কিছু সংখ্যা ২০০১ সাল পর্যন্ত। এই রিপোর্টে আমরা মূলত তিনটি জিনিস মাপবার চেষ্টা করেছি। প্রথমটি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বা HDI—আর এখানে মাথাপিছু আয় ছাড়া, শিক্ষার হার, গড় আয়ু, শিশুমৃত্যু-ইত্যাদি নিয়েছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ বা জেন্ডার (Gender) ইক্যুয়ালিটি ইনডেক্স। আর তৃতীয়টি দারিদ্র্য ঠিক কি ধরনের অর্থাৎ পভার্টি ইনডেক্স (Poverty Index)। এই তিনটি আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মাপা হয়েছে। আর একটি রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনা করা হয়েছে। শুধু হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের বেলায় ২০০১ সাল পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। আর তুলনা করা হয়েছে ১৫টি রাজ্যের মধ্যে। বাকি সব সংখ্যা ১৯৯১ সালের। বলা বাহুল্য HDI-তে কেরলের স্থান সর্বপ্রথমে। দ্বিতীয় স্থান পঞ্জাব। অর্থাৎ পঞ্জাবের মাথাপিছু আয় কেরলের থেকে বেশি হলেও শিক্ষার হার, স্বাস্থ্য পরিষেবায় কেরল অনেক এগিয়ে। HDI-তে কেরল সর্বপ্রথম। ১৫টি রাজ্যের মধ্যে পঃ বঙ্গের স্থান HDI-তে ৮তম বা অষ্টম। অর্থাৎ পঃ বঙ্গ একটি মাঝারি গোছের গড় রাজ্য। তামিলনাড়ু বর্তমানে তৃতীয় আর পঃ বঙ্গের নিচে রাজস্থান—স্থান নবমে। পঃ বঙ্গের নিচে মুখ্যত বিমারু রাজ্যগুলি অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আর রাজস্থান এবং ওড়িশা। বিহার সর্বশেষে। HDI-তে কেরল প্রথম এবং পঞ্জাব দ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও নানান অনুপাত বিরোধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানব বিকাশে কেরল প্রথম হওয়া সত্ত্বেও বেকারিতেও হয় দ্বিতীয় কিংবা প্রথমে। অর্থাৎ শিক্ষার হার বাড়লে বেকারি কমবে এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। আবার পঞ্জাবে মাথাপিছু আয় বেশি এবং HDI-তে দ্বিতীয় অথচ দেখা যাচ্ছে সেক্স রেসিও (Sex Ratio) সবচেয়ে খারাপ। মহিলাদের অবস্থা খারাপ। ভ্রূণ হত্যা নিত্য ঘটনা। ভ্রূণ হত্যা মানে অবশ্য মেয়ে হত্যা। অন্ধ্রপ্রদেশে এ নিয়ে বর্তমানে খুব বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে কম্পিউটার বিপ্লব চলে এসেছে। রাজ্যটি দ্রুত আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছে। অথচ HDI-তে গত ২০ বছরে অন্ধ্রের কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯৮১ সালে যা ছিল ২০০১ সালেও প্রায় তাই। বস্তুত ১৯৮১ সালে HDI-তে অন্ধ্র ছিল নবম স্থানে—২০০১ সালে দশম স্থানে। বরং রাজস্থান উপরে চলে এসেছে। আর ২০০১ সালে ঠিক পশ্চিমবঙ্গের পরে নবম স্থানে। HDI-তে আশ্চর্য রাজস্থান দ্রুত উন্নতি করছে।

পশ্চিমবঙ্গের কথা আবার বলা যাক। মানব বিকাশে ১৯৮১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যা হিসাব তাতে বোঝা যাচ্ছে পঃ বঙ্গের স্থান ১৫টি বৃহৎ

রাজ্যের মধ্যে মাঝামাঝি। উপরেও উঠছে না আবার নিচেও নামছে না। আর এখন আমাদের পঃ বঙ্গের অবস্থা বিমারু রাজ্যগুলি থেকে কিঞ্চিৎ ভালো। তবে সাংঘাতিক কিছু নয়। অর্থাৎ দক্ষিণী ও পশ্চিমী রাজ্যগুলি যে উন্নতির হার বজায় রেখেছে আমরা তাদের সমকক্ষ হতে পারছি না। বরং আমাদের তুলনা এখন বিহারের সঙ্গে। আর বিহার থেকে আমাদের অবস্থা ভালো এটাই একমাত্র বর্তমানে আত্মপ্রসাদ।

যোজনা কমিশন এবার মানব বিকাশ বা HDI-কে আরও ভাগ করেছে। দু'টি ভাগ এখন খুবই আলোচিত। একটি গ্রামীণ মানব বিকাশ আর অন্যটি নাগরিক মানব বিকাশ। অর্থাৎ গ্রামে এবং শহরে আমাদের অধিবাসীদের অবস্থা কেমন তা পরিমাপ করা হচ্ছে। HDI-বা মানব বিকাশ যেমন ১৫টি রাজ্য নিয়ে গণনা করা হয়েছে আর ২০০১ সালের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে এই গ্রামীণ ও নাগরিক মানব বিকাশে ১৯৯১ সালের সংখ্যা নেওয়া হয়েছে আর তুলনা করা হয়েছে ৩২টি বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে।

১৯৯১ সালের ১৪ বছর (প্রায়) বামফ্রন্ট শাসন করার পরে গ্রামীণ মানব বিকাশে ৩২টি রাজ্যের মধ্যে আমাদের স্থান ১৯তম। যদিও বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে বিমারু ও অন্ধ্র আমাদের নিচে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বৃহৎ দক্ষিণী ও পশ্চিমী রাজ্য, পঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ গ্রামীণ মানব বিকাশে পঃ বঙ্গের উর্ধ্বে। অর্থাৎ আমরা গ্রামের উন্নয়ন বলে যতটা চিৎকার করেছি বাস্তবে ততটা সাফল্য লাভ করিনি। বর্গা করলেই আপসে গ্রামীণ বিকাশ হবে এমন ধারণা বোঝা যাচ্ছে অবাস্তব।

গ্রামীণ মানব বিকাশে স্বাস্থ্য পরিষেবার ও শিক্ষার হার এখনও অনেক রাজ্য থেকে পঃ বঙ্গ অনেকটাই পিছিয়ে। গ্রামীণ মানব বিকাশে পঃ বঙ্গের স্থান গড়েরও নিচে। অর্থাৎ আমাদের পঞ্চায়েতগুলির গুণগত মান খুব উন্নত নয়। আবার নাগরিক মানব বিকাশে আমাদের স্থান ৩২টি রাজ্যের মধ্যে ২৬তম। তার মানে একেবারে নিচের দিকে। অবশ্য আমাদের নিচে কিছু বিমারু রাজ্য আছে আর আছে অন্ধ্র। নাগরিক মানব বিকাশে আমাদের স্থান গড়েরও অনেক নিচে তার কারণ পঃ বঙ্গের বাজারে বস্তির বিস্ফোরণ, চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্নদশা, শহুরে হাসপাতালগুলির দুর্দশা, রাস্তাঘাট সবই সেকেলে ইত্যাদি। মানব বিকাশে বাজারের অবস্থা পঃ বঙ্গে ভয়াবহ। পঃ বঙ্গের যেগুলি পুরনো শহর ছিল তার পরিষেবা ভেঙে পড়েছে আর যেগুলি নতুন শহর হচ্ছে তাদেরও পরিষেবার মান উন্নত নয়। ফলে ৩২টি রাজ্যের মধ্যে নাগরিক মানব বিকাশে আমাদের স্থান শেষের দিকে—২৬তম। অবশ্য আমাদের আত্মপ্রসাদ এই যে বিহার থেকে আমরা আপাতত উপরেই আছি। আপাতত।

জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি ইনডেক্সে (Gender Equality Index) আমাদের স্থান প্রায় শেষের দিকে। অথচ সাধারণ লোকদের ধারণা পঃ বঙ্গে মেয়েদের অবস্থা মোটামুটি ভালো—পার্থক্য করা হয় না। তবে আমরা যোজনা কমিশনের

রিপোর্ট থেকে জানি যতটা আমরা বলছি ততটা সত্য নয়। আমরা জানি না Drop-out rate মেয়েদের মধ্যে ভয়ানক। শিক্ষার হারে মেয়েরা পিছিয়ে। চাকরি পাবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে। ৩২টি রাজ্যের মধ্যে আমাদের স্থান ২৬তম। আর আমাদের নিচে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। Gender Equality Index সবচেয়ে প্রথমে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—আর দ্বিতীয় স্থানে কেরল। আর পঃ বঙ্গ ২৬তম। সব উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলির স্থান পঃ বঙ্গের উপরে। আমাদের যে বিশ্বাস ছিল যে পঃ বঙ্গে নারীদের বিরুদ্ধে কোনো অত্যাচার, অবিচার হয় না—দেখা যাচ্ছে আসল ঘটনা অন্যরকম। অবশ্য আবার সান্ত্বনা আমাদের স্থান বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ঠিক উপরে।

হিউম্যান পভার্টি ইনডেক্স (Human Poverty Index) বা দারিদ্র্য কি ধরনের তা মাপবার চেষ্টা হয়েছে ও বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। এখন দারিদ্র্য বলতে কতকগুলি তথ্যর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য যেগুলি নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম (১) কত লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে, (২) কত শতাংশ লোক খাবার জল ঠিকমতো পায় না, (৩) কত শতাংশ লোক বিদ্যুৎ পায় না, (৪) স্যানিটেশন পায় না, (৫) ডাক্তারের সাহায্য পায় না, (৬) কাঁচা বাড়িতে থাকে, (৭) শিক্ষার হারে কতটা পিছিয়ে, (৮) শিশুরা স্কুল যায় না, (৯) গেলেও তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায়, (১০) কত সংখ্যক লোক ৪০ বছরের নিচে মারা যাচ্ছে। এগুলোকে বলা হচ্ছে দারিদ্র্যের সূচক বা পভার্টি ইনডেক্স। এইক্ষেত্রে ৩২টি রাজ্যের মধ্যে পঃ বঙ্গের স্থান গ্রামে ২৩তম আর শহরে ২১তম। অর্থাৎ গড়ের নিচে। এই থেকে একটা কথা পরিষ্কার অন্য রাজ্যের তুলনায় আমরা আপেক্ষিকভাবে শহর ও গ্রামে দারিদ্র্য দূর করতে ব্যর্থ। দারিদ্র্যমোচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হিমাচলপ্রদেশ এবং কেরল।

পঃ বঙ্গের অবস্থা গত ২৫ বছরে খুব একটা উন্নতি হয়েছে বিশেষত অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের তুলনায়—তা যোজনা কমিশনের রিপোর্ট থেকে আদৌ প্রমাণিত হয় না। আরও আশ্চর্য এই যে অন্য অনেক রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে মাথাপিছু খরচ আমাদের থেকে বেশি। আমাদেরই অর্থ পাওয়া যায় না। অন্য রাজ্যগুলি দারিদ্র্যমোচনে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্য পরিষেবায় পঃ বঙ্গের থেকে উন্নততর। এটি অবশ্য যোজনা কমিশনের রিপোর্ট—অতএব আমরা গলা ফাটিয়ে বলতেই পারি—'সবই কেন্দ্রের চক্রান্ত'। এই মানব বিকাশ রিপোর্ট কেন্দ্রের তৈরি। মানব বিকাশে বামপন্থী কেরল প্রথম আর বামপন্থী পঃ বঙ্গর স্থান সর্বত্রই হয় মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে। রিপোর্টটি পুরোপুরি কেন্দ্রের চক্রান্ত তা মনে হয় না। বরং পঃ বঙ্গবাসীদের বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। উন্নতির বাধা কোথায় সেটাও বোঝা দরকার।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসেব : ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে ৩৬ শতাংশ মানুষ

এবারকার বাজেটের প্রাক সমীক্ষায় জানান হয়েছে যে ভারতের দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা শতাংশ হিসেবে ক্রমাগত কমছে। এবার দু'টি বছরের তুলনা করা হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ সালের সঙ্গে ১৯৯৯-২০০০ সালের। জানান হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ শতাংশ—এখন ১৯৯৯-২০০০ সালে কমে ২৬.১ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ-ছয় বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। এতে সবারই খুশি হবার কথা। কারণ আমাদের দেশে এখন উন্নতির হার এতই বেশি যে লোকের জীবনযাত্রার মান ক্রমে দারিদ্র্যসীমার উপরে চলে যাচ্ছে। ভারতের আম জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। প্রতি পাঁচ বছরে যদি ১০ শতাংশ হারে কমে তবে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ভারতে দারিদ্র্য আর থাকবেই না।

সরকারি হিসেব বিশ্বাসযোগ্য কিনা তার আলোচনা দরকার। প্রথমেই বলে রাখা দরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভারত সরকারই দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো মিল নেই। আরও সোজাভাবে বলতে গেলে ১৯৯৩-৯৪ সালে যেভাবে দারিদ্র্যসীমা মাপা হয়েছিল ১৯৯৯-২০০০ সালে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। দুটো বছরের মধ্যে তুলনা আদৌ করা যায় না। সুতরাং ১০ শতাংশ দারিদ্র্য গত পাঁচ-ছয় বছরে কমেছে এমন কৃতিত্ব সরকার দাবি করতে পারে না। দুটো দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা আলাদা, মাপ করার পদ্ধতি আলাদা, স্যাম্পেল আলাদা। তুলনা তখনই করা যেতে পারে যদি সংজ্ঞা এবং মাপার পদ্ধতি এক থাকে। এক্ষেত্রে তা হয়নি। দারিদ্র্যসীমা কমেছে বা বেড়েছে নির্ভর করে সংজ্ঞার উপর। যদি চালাকি করে আমরা সংজ্ঞার পরিবর্তন করি আমরা দেখাতে পারি দারিদ্র্যসীমা কমেছে। মনমোহন সিং যখন

অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি একবার দাবি করেছিলেন ভারতে দারিদ্র্য নির্মূল হয়ে এসেছে। কারণ তখন মাত্র তাঁর হিসেব অনুযায়ী ১৯ শতাংশ লোক ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে। মনমোহন সিং-এর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এটাকে অনেক সময়ে বলা হয় Statistical Lie বা সংখ্যাতত্ত্বর কারচুপি করে আমার পছন্দমতো প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারি। রাজনীতিবিদরা প্রায়শ এটা করে থাকেন। আমাদের রাজ্যে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। মানে সব ধরনের রাজনীতিবিদরা সংখ্যার 'মায়াজাল' এবং 'ইন্দ্রজাল' সৃষ্টি করেন আর লোকদের বোকা বানায়।

দারিদ্র্যসীমা কাকে বলে তা নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক আছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কত ধরনের সংজ্ঞা আছে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

১) প্রথম যুগে ডান্ডেকার ও রথের (Dandekar & Rath) যে সংজ্ঞা নিয়ে দারিদ্র্যসীমা মাপার চেষ্টা হল তা হচ্ছে যাদের মাথাপিছু আয় দিনে ১ টাকার নিচে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে।

২) মাথাপিছু আয় কথাটির মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ধরা হয়নি। যদি মুদ্রাস্ফীতি ধরা হয় তবে মাথাপিছু ১ টাকার উপরে বাড়ানো উচিত।

৩) আগে জানা যাক আমাদের যথাযোগ্য জীবনধারণের মান কি হওয়া উচিত। কত ক্যালোরি খাবার খাওয়া দরকার। তার নিচে বসবাসকারীরা দারিদ্র্যসীমার নিচে।

৪) খাদ্যদ্রব্যই শুধু জীবনধারণের মানের উপযুক্ত মাপকাঠি নয়, তার সঙ্গে বাসস্থানের গুণগত মান, পরিধান কি হওয়া উচিত, জ্বালানির খরচ ইত্যাদি ধরা হোক। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য শুধু নয়, অন্যান্য জিনিসও ধরা হোক।

৫) দিনের আয় মাপা কঠিন, বাৎসরিক একটা আয় ধরা যাক—যা আমাদের যথাযোগ্য জীবনযাত্রার মান দিতে পারে। ভারত সরকার এই মাপকাঠি ৬২০০ থেকে ৬৫০০ টাকা আগে ধরেছিলেন।

৬) এক বছরের আয় বা ব্যয় সাধারণভাবে কেউ বলতে পারে না তার জন্য একমাস বা এক সপ্তাহের আগের আয়-ব্যয় ধরা যাক। ভারতবর্ষে বর্তমানে এই 'এক মাসের' ব্যয়টাই দারিদ্র্যসীমার জন্য মাপা হচ্ছে। আবার বিকল্পভাবে 'এক সপ্তাহের' ব্যয়ও ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ আয় জানা যায় না বা জানা মুশকিল তাই ব্যয়টা ধরা হয়।

৭) অমর্ত্য সেনের আবার মাপকাঠি আলাদা। দারিদ্র্য অনেক ধরনের। তবে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বা দরিদ্র লোকদের তুলনায় 'দরিদ্রতম' লোকেরা ভারতে অনেক। তাদের মাপা কঠিন। তবে 'দরিদ্রতম' লোকদের জন্য সংজ্ঞা ঠিক করা উচিত। অমর্ত্য সেন এই বিষয়ে একটি 'P' সূচিকা তৈরি করেছেন।

৮) অমর্ত্য সেনের দ্বিতীয় সংজ্ঞা হচ্ছে যে দারিদ্র্য নির্ভর করে প্রত্যেক

মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থানের উপর। একে বলা হয় "Location of Individual"। এবং মানুষের অবস্থান নির্ভর করে শুধু আয় বা ব্যয়ের উপর নয় তার শিক্ষার হারের উপর, স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর, শিশুরা স্কুলে কতদিন থাকে ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর। এগুলো দারিদ্র্যসীমার মধ্যে ধরা উচিত।

৯) দারিদ্র্য শহর ও গ্রামে এক ধরনের হতে পারে না। গ্রামের লোকেরা শহরের তুলনায় বেশি কায়িক পরিশ্রম করে। গ্রামে বাস-ট্রাম নেই। বেশি হাঁটে এবং জমিতে অনেক বেশি কায়িক পরিশ্রম করে। অতএব খাদ্যদ্রব্য গ্রামের লোকদের বেশি দরকার শহরের তুলনায়। বা গ্রামের লোকদের যেহেতু বেশি দরকার আপেক্ষিকভাবে বেশি আয়ও দরকার। সেই 'যথাযোগ্য' ক্যালোরি আয়ের নিচে যারা তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে।

১০) ইউনাইটেড নেশনস বিভিন্ন দেশের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার তুলনা করতে চায়। তারা একটা মাপকাঠি নিয়েছে। সেটা হল মাথাপিছু প্রতিদিন আয় যদি এক ডলারের নিচে হয় তবে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে। ইউনাইটেড নেশনসের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩৬ শতাংশ লোক ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে। মাথাপিছু আয় দিনে ১ ডলার, টাকা হিসেবে ৪৫ বা ৪৬ টাকা।

আরও অনেক সংজ্ঞা আছে। আর তার জন্য দারিদ্র্যসীমার নিচে কত লোক বাস করে তাই নিয়ে মতান্তর। ভারত সরকার বলছে জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ অর্থাৎ ২৬ কোটি লোক আর ইউনাইটেড নেশনস বলছে ৩৭ শতাংশ অর্থাৎ ৩৭ কোটি লোক। তফাতটা বিরাট।

যা হোক এবারকার প্রাক-বাজেটে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা কত তা মেপেছে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান—নাম ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে NSSO। তারা এইবার 'আয়' ধরেনি ধরেছে 'মাথাপিছু ব্যয়'। তারা দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ৩০ দিন আগে ৩০ দিন ধরে কি তারা খেয়েছে বা অন্যখাতে ব্যয় করেছে। আবার ৭ দিন আগে শুধু খাদ্যদ্রব্য তারা কি খেয়েছে। ৩০ দিনের রিপোর্টটি সরকার গ্রহণ করেছে। সাতদিনের রিপোর্টটি বের হয়নি। এটা ঠিক পদ্ধতি কিনা তাই নিয়ে তর্ক বিতর্ক অবশ্যই হতে পারে। NSSO পদ্ধতি হচ্ছে ৩০ দিন ধরে 'ন্যূনতম' একটা খরচ করা উচিত ছিল—সাধারণ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখবার জন্য। যারা করেনি তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে।

এই পদ্ধতিতে বলা হচ্ছে ভারতে ২৬.১ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে। অর্থাৎ ২৬ কোটি লোক। এটি অবশ্য গড় হিসেব। কোনো কোনো রাজ্যে দারিদ্র্যসীমা প্রায় নেই বললে হয়। আবার কোনো কোনো রাজ্যে দারিদ্র্য ভয়ানক। অর্থাৎ রাজ্যে রাজ্যে বিরাট পার্থক্য।

যে রাজ্যটি ভারতের সবচেয়ে গোলমেলে—অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীর সেখানে দারিদ্র্য সবচেয়ে কম। মাত্র ৩.৪৮ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে। এটা

দু'কারণে সম্ভব। প্রথমত, এটা হতে পারে ভারত সরকার জম্মু-কাশ্মীরে অকাতরে সাহায্য করেছে তার ফলে দারিদ্র্য কম। আবার এটা হতে পারে জম্মু-কাশ্মীরে স্যাম্পেল আগাগোড়াই গোলমেলে—লোক দেখানো স্যাম্পেল নেওয়া হয়েছে। যা হোক দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা কম গোয়াতে (৪.৪০ শতাংশ), চণ্ডীগড়ে (৫.৭৫), পঞ্জাবে (৬.১৬), হিমাচলপ্রদেশে (৭.৬৩)। পঞ্জাব ছাড়া এগুলি অবশ্য ছোট রাজ্য। পঞ্জাবে দেখা যাচ্ছে কৃষি উন্নতি হওয়ার ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোক মাত্র ছয় শতাংশের কিছু বেশি।

আবার বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ওড়িশায় (৪৭.১৫ শতাংশ)। তারপরে আছে বিহার (৪২.৬০ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ (৩৭.৪৩ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (৩১.১৫ শতাংশ) মোটামুটিভাবে বলা যায় ওড়িশা-বিহার অঞ্চলে দারিদ্র্য প্রকট।

অসম ও অরুণাচলে দারিদ্র্যসীমা বাড়ছে। অসমে ৩৬.০৯ শতাংশ আর অরুণাচলে ৩৩.৪৭ শতাংশ। ত্রিপুরায় ৩৪.৪৪ শতাংশ, নাগাল্যান্ডে ৩২.৬৭ শতাংশ। একমাত্র মিজোরাম ছাড়া (১৯.৪৭ শতাংশ) সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে।

দক্ষিণ ভারতে বহু রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা কম। যেমন কেরল (১২.৭২ শতাংশ), তামিলনাড়ু (২১.১২ শতাংশ), কর্নাটকে (২০.০৪ শতাংশ)। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকের সংখ্যা সমগ্র ভারতের গড় থেকে কম। আর আশ্চর্য উন্নতি করেছে গুজরাটে। সেখানে মাত্র ১৪ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে।

মহারাষ্ট্র আর পঃ বঙ্গ প্রায় সমগোত্রীয়। মহারাষ্ট্রে ২৫.০২ শতাংশ আর পঃ বঙ্গে ২৭.০২ শতাংশ। মহারাষ্ট্র ভারতের সামগ্রিক গড় থেকে (অর্থাৎ ২৬ শতাংশ) কিঞ্চিৎ কম। আর পঃ বঙ্গ গড় থেকে কিঞ্চিৎ বেশি।

একটা সিদ্ধান্তে বোধহয় আসা যায়। পঞ্জাব ও হরিয়ানা ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারতে দারিদ্র্য প্রকট—আর সবচেয়ে বেশি ওড়িশায় আর বিহারে। অথচ দক্ষিণ ভারতে অবস্থাটা এতটা খারাপ হয়নি। তার মানে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প, পঞ্চায়েত প্রথা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটে যতটা কার্যকরী হয়েছে উত্তর ভারতে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে তা হচ্ছে না।

যদি শতাংশ হিসেবে না দেখি যদি আমরা কত মানুষ কোন্ রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে জানতে চাই তবে উত্তরপ্রদেশে ৫ কোটি লোক, বিহারে ৪ কোটি লোক, মধ্যপ্রদেশে ৩ কোটি, পঃ বঙ্গে ২.১ কোটি আর ওড়িশায় ১.৭ কোটি আর অন্ধ্রে ১.২ কোটি লোক। অর্থাৎ শতাংশ হিসেবে যদি না দেখি তবে নাম্বারে ক'টি রাজ্য এগিয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশ ও বিহার। পঃ বঙ্গ আমাদের খুব পুলকিত করে না। তার কারণ পঃ বঙ্গে

দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খুব একটা কিছু করতে পারেনি। সরকারি প্রপাগান্ডা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নানান বৈষম্য। এই 'বৈষম্য' কেন তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী জাতীয় অজুহাত বা ভাঙা রেকর্ড বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় পঃ বঙ্গ প্রশমিত হওয়া সত্ত্বেও খুব একটা কিছু করতে পারল না কেন তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আর প্রশ্ন উঠবেই।

পেট্রোল রাজনীতি ও ভারতের সমস্যা

ভারতে গত বাজেটে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি একটাকা কমানো হয়েছিল।.এখন শোনা যাচ্ছে পেট্রোলের দাম কমানোটা নেহাতই ক্ষণস্থায়ী—দুই-একমাসের মধ্যে তেলের দাম লিটার প্রতি তিন টাকা থেকে চার টাকা বেড়ে যেতে পারে। পেট্রোল এমন একটি বস্তু যে তার দাম বেড়ে গেলে চতুর্দিকে সব জিনিসেরই দাম বেড়ে যাবে। বস্তুত ১৯৭২-৭৪ সালে পেট্রোলের দাম এক লাফে পাঁচগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আর জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল অন্তত দশগুণ। অর্থাৎ পেট্রোল এমনই পণ্য যার দাম বাড়া মানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। সামান্য দাম বাড়লেই চতুর্দিকে তার ফল দেখা যায়। তার কারণ আধুনিক জগতে পেট্রোলই একমাত্র শিল্প, যানবাহন, কৃষির জ্বালানি। পেট্রোল ছাড়া বর্তমান সভ্যতা অচল, অন্তত আপাতত।

গত বাজেটে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি এক টাকা কমানো হলেও আরও একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সাধারণ লোকেরা এর অর্থ তখন বোঝেনি। পদক্ষেপটা হচ্ছে পেট্রোলের দাম সরকার আর ঠিক করবে না, বাজার ঠিক করবে। মানেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের দাম বেড়ে গেলে ভারতেও তার দাম বেড়ে যাবে—আর কমে গেলে ভারতে তার দাম কমে যাবে। অর্থাৎ পেট্রোলের দাম নাগরদোলার মতো ওঠানামা করবে।

সমস্যাটা হচ্ছে ভারতের। যা ইতিহাস তাতে দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের দাম বেড়ে গেলে দেশে আমাদের দাম বেড়ে যায়। অথচ উল্টোটা সত্যি নয়। বাজারে তেলের দাম কমে গেলে আমাদের তেলের দাম তেমন কমে না। ট্যাক্স বেড়ে যায়। অর্থাৎ বাড়ার সময় বাড়ে কিন্তু কমার সময় কমে না। অর্থাৎ আমাদের ট্যাক্স ব্যবস্থা এমনই যে সহজে তেলের দাম কমানো যায় না। অথচ পাশ্চাত্য বহু দেশে বাজারই তেলের দাম নির্ধারণ করে। কিন্তু যখন তেলের দাম বাড়ে তখন ট্যাক্স কমে যায়। আর যখন তেলের দাম কমে ট্যাক্স বেড়ে যায়। অর্থাৎ পেট্রোলের দাম স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়। আমাদের অর্থমন্ত্রী আগেভাগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন বাজারে তেলের দাম

বাড়লে তিনি ট্যাক্স কিছুতেই কমাবেন না। অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যে বাজারে যদি তেলের দাম বাড়ে আর ট্যাক্সও যদি বাড়ে তবে পেট্রোলের দাম এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবে আর অর্থনীতিতে যে সঙ্কট আসবে তাতে আরও লোক বেকার হবে আর শিল্প এবং যানবাহন হবে পর্যুদস্ত। স্ট্রাইক, মিছিল, অবস্থান, ধর্মঘটে সাধারণ জীবনযাত্রা অচল হবার উপক্রম হবে।

বাজারই তেলের দাম নির্ধারণ করবে এই তত্ত্বটা অবশ্য বিদেশীদের কাছ থেকে ধার করা। আমরা পুরো আইডিয়া কিন্তু ধার করিনি। আমেরিকাতে বাজারে তেলের দাম বেড়ে গেলে ট্যাক্স প্রায় নিজের থেকেই কমে যায়। আর বাজারে তেলের দাম কমে গেলে ট্যাক্সও বেড়ে যায়। অর্থাৎ আমরা যে তত্ত্বটা আমেরিকার কাছ থেকে ধার করেছি তা শোধন ও বর্জন করে এমন একটা অবস্থায় এনেছি তাতে দেখা যাবে তেলের দাম সব সময় বাড়বে, কখনোই কমবে না।

আসল কথায় আসা যাক। হঠাৎ কি হল যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। আপাতদৃষ্টিতে যেটা বলা হচ্ছে আরব দেশেই বর্তমানে সবচেয়ে বেশি রপ্তানিযোগ্য তেল পাওয়া যায় আর সামরিক প্রয়োজনে তারা তেলকে 'অস্ত্র' হিসেবে ৭০ দশকে ব্যবহার করে লাভবান হয়েছিল আবার তারা একই 'অস্ত্র' এখন পাশ্চাত্য দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।

সবারই জানা যে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। ইজরায়েল প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে। প্যালেস্তিনীয়রাও যুদ্ধ করছে তবে সেটা ট্যাঙ্ক দিয়ে নয় মানববোমা, জঙ্গিহানা ইত্যাদি। ইজরায়েল বলছে যতদিন প্যালেস্তিনীয়রা ইহুদিদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ করবে তাদের ততদিন আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আর প্যালেস্তিনীয়রা মনে করে ইজরায়েল রাষ্ট্র আরব ভূখণ্ডে থাকাই উচিত নয়। আর সহস্র সহস্র প্যালেস্তিনীয় নিজদেশে পরবাসী।

অতএব, তারাও সহজে ছাড়বে না। যুদ্ধ চলছে—তবে আগেকার যুদ্ধে যা ঘটেছিল এবারও তাই হচ্ছে। আরব ভূখণ্ড ইজরায়েল ক্রমশ দখল করে নিচ্ছে। আর ইজরায়েল একাই অন্তত ৪২টি আরব দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস পাচ্ছে তার কারণ ইজরায়েলের পেছনে পাশ্চাত্য দেশ এবং আমেরিকা আছে। আমেরিকা কেন ইজরায়েলকে সমর্থন করে তা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, তবে সাধারণ একটি সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া যায়। নিউ ইয়র্ক শহরে এবং তার আশেপাশে যত ইহুদি ধর্মাবলম্বী আছে তার সংখ্যা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে একক বৃহত্তম সেই শহরে এবং হয়তো বা ইজরায়েলের যা লোকসংখ্যা তার কাছাকাছি। আমেরিকার অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে ইহুদিদের বিশেষ এক ধরনের লবি সব সময় কাজ করে। ব্যাঙ্কিং মোটামুটি ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে, অন্তত আমেরিকায়।

পেট্রোল মুখ্যত পাওয়া যায় আরব দেশে। ১৯৭০ সালে পাঁচটি দেশ অর্থাৎ ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত এবং ভেনেজুয়েলা পৃথিবীর পেট্রোলের ৮৫ শতাংশ রপ্তানি করত। তারা মিলে OPEC বলে একটি জোট সৃষ্টি করে। ওপেক-এর সদস্য অবশ্য শুধু পাঁচটি দেশ নয় আরও ১২টি দেশ আছে— যদিও সদস্য সংখ্যা কখনও বাড়ে কখনও বা কমে। আরব দেশে তেল পাওয়া যায় কিন্তু সত্তর দশকের আগে পর্যন্ত আমেরিকার-ইউরোপের 'সাতবোন' তেলের দাম ঠিক করত আর কত উৎপাদন হবে তাও ঠিক করত। এই বিখ্যাত 'সাতবোন' হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল (Standard Oil) Exxon, Mobil, Gulf, Texaco, British Petroleum এবং Royal Dutch। কার্টেল সমতা মানে ৭০ দশকে যখন ইজরায়েলের কাছে আরবরা পরাজিত হচ্ছে তখন (ওপেক) দেশগুলি আমেরিকাকে 'শিক্ষা' দেবার জন্য তেলের দাম প্রথমে তিনগুণ, পরে পাঁচগুণ, পরে দশগুণ বাড়িয়ে দিল। আরও ঠিক হল কত উৎপাদন হবে তা বিদেশী 'সাতবোন' ঠিক করবে না, করবে ওপেক দেশগুলি যৌথভাবে। হঠাৎ তেলের দাম বাড়াতে আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি এবং ফলস্বরূপ ইজরায়েল-আরব যুদ্ধের সমাপ্তি। অবশ্য তখনকার মতো।

২০০২ সালেও যুদ্ধ একটা হচ্ছে তবে আপাতত বিস্তার লাভ করেনি। এই অবস্থায় সৌদি আরব এবং আরও কয়েকটি দেশ তেলের দাম বাড়িয়ে আমেরিকা এবং আমেরিকার বন্ধুদের একটা 'শিক্ষা' দিতে চায়। আমেরিকার মোটরগাড়ি সংস্কৃতি হঠাৎই শেষ হবে যদি ওপেক দেশগুলি তেলের দাম বাড়িয়ে দেয়। বলা হচ্ছে সৌদি আরব নাছোড়বান্দা তারা তেলের দাম ব্যারেলে অন্তত পাঁচ ডলার বাড়াতে চায়। আর বর্তমানে সৌদি আরবই হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। তারপরে রাশিয়া, যে ওপেকের সদস্য নয়।

আরব-ইজরায়েলের বর্তমান যুদ্ধই একমাত্র তেলের দাম বাড়াবার কারণ তা আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করছে না। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ না হলেও আরব দেশগুলি বিশেষত সৌদি আরব তেলের দাম বাড়াবার হুমকি প্রায়ই দিচ্ছে। বলা হচ্ছে সৌদি আরবের এবং অন্যান্য আরব দেশের অর্থনীতি এমন এক পর্যায়ে গিয়েছে যে 'বাঁচবার জন্য' আরব দেশগুলি ক্রমাগত তেলের দাম বাড়িয়ে যাবে। আরব দেশে তেল ছাড়া আর কিছুই নেই।

তেলের যখন রমরাম ব্যবসা তখন আরব দেশগুলি এক ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে প'ড়ল। তেল ছাড়া আর কোনো রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য এই মরুভূমি দেশে পাওয়া যায় না। ওপেকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী যে আরব দেশগুলি তাদের বলা হয় GCC দেশ বা গাল্‌ফ কোয়াপরেশন কাউন্সিল। এর মধ্যে আছে বাহারিন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী।

তেলের কল্যাণে এইসব আরব দেশগুলিতে 'আরাম ও সুখ' এমন এমন

পর্যায়ে চলে গেছে যে কায়িক শ্রম করবার জন্য শ্রমিক সব বহিরাগত। মুখ্যত তারা ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগত। যারা আরব তারা 'নাগরিক' মানে রাজনৈতিক অধিকার সামান্য হলেও আছে আর বাকি 'অনাগরিক' যাদের মাইনা অপেক্ষাকৃত কম, সরকারি চাকরি পায় না, কিন্তু সেই দেশে তারাই কায়িক শ্রম করে। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে 'সিটিজেন' এবং 'নন-সিটিজেন'। বাহারিনে সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ননসিটিজেন, কুয়েতে ৬৪ শতাংশ, ওমানে ২৬ শতাংশ, কাতারে ৮০ শতাংশ, সৌদি আরবিয়ায় ৫৫ শতাংশ আর আমিরশাহীতে প্রায় ৯০ শতাংশ। অর্থাৎ তেলের কল্যাণে কায়িক শ্রম যারা করে তারা বহিরাগত। সৌদি আরবে ৪০,০০০ ট্যাক্সি ড্রাইভার সবই বহিরাগত।

১৯৭০ সালে তেলের দাম বাড়ায় চতুর্দিকে যা 'উন্নতি' হয়েছিল এখন সেটা অনেকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। বাহারিনে তেল প্রায় শেষ। অথচ জনসংখ্যা বাড়ছে। সৌদি আরবে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে সুযোগ বাড়ছে না। সৌদি আরব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ আর ১৯৯৯ সালে ১২০,০০০ গ্র্যাজুয়েট বেরিয়েছে অথচ টেকনিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র মাত্র ২ শতাংশ। প্রতি বছর বেকারি আরব দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ তেলের দাম চট করে বাড়ানো যাচ্ছে না। তেলের স্টকও ফুরিয়ে যাচ্ছে। অথচ সৌদি আরবে 'রাজপুত্রের' সংখ্যা ৫০০০ ছাড়িয়ে গেছে। আর আল সৌদের বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এখন (সওনের ইকোনমিস্টের মতে) ২৫০০০। আর আয়ের বৈষম্য যত বাড়ছে তত সমস্যা বাড়ছে।

তাই আরব দেশগুলি তেলের দাম বাড়াবার একটা 'সুযোগ' খুঁজছে। বর্তমানে ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। অতএব, তারা তেলের দাম বাড়াবে তাদের 'জীবনধারণের মান' বজায় রাখবার জন্য।

তাদের পক্ষে সমস্যা রাশিয়া। রাশিয়া তেলের দাম বাড়াতে চায় না আর তারা ওপেকের সদস্যও না। বস্তুত রাশিয়া কম দরে তেল বিক্রি করতে চায়। সুতরাং আরব দেশগুলি রাশিয়াকে নিজের 'দলে' টানবার চেষ্টা করছে। রাশিয়া ঠিক আরব দেশের কথা শুনবে কিনা বোঝা মুশকিল। তবে আমেরিকাকে শাস্তি দিতে তারাও চায়। যদি তাই হয় তবে তেলের দাম বাড়বে। বাজারে দাম যদি বাড়ে তবে ভারতেও বাড়বে। যদি ট্যাক্স না কমে।

ভারতের যে তেল অসমে ও মুম্বাইতে পাওয়া যায় তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। বড়জোর দুইমাস চলতে পারে। আমরা এতদিন আরব তেলের দিকে তাকিয়েছিলাম। তা আর বেশিদিন সম্ভব নয়। যদি বাঁচতে হয় তবে এখন থেকে রাশিয়ার তেল কিনতে হবে। কিন্তু রাশিয়াও যদি ঝোপ বুঝে কোপ মারে, তবে তেলের দাম আমাদের দেশে ক্রমশ বাড়বে—অর্থাৎ তার সঙ্গে বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতি।

কালো টাকা সাদা হবার পরিণতি

গত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কালো টাকা সাদা করার চেষ্টায় যে স্কিম নেওয়া হয়েছিল তাতে ১০,০৫০ কোটি টাকা সরকার পেয়েছে। এই স্কিমে সরকারের কিছু টাকা আয় হল আর ৩৩,০০০ কোটি কালো টাকা সাদা হল। অর্থাৎ ৩৩,০০০ কোটি টাকা এখন ব্যয় করার জন্য আইনত অর্থনীতিতে এল। এটা এক ধরনের সাফল্য—তার কারণ আগেকার স্কিমে এত টাকা কখনোই সরকারের দপ্তরে পড়েনি।

অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের চেষ্টাটা সরকারের ষষ্ঠ প্রচেষ্টা। আগেও নানা ধরনের চেষ্টা হয়েছিল—তবে টাকার অঙ্ক হিসেবে এবারই সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার এখন ১০,০৫০ কোটি টাকা বেশি পেল। যেহেতু এটি ইনকাম ট্যাক্স তাই রাজ্যগুলি এর থেকে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ পাবে অর্থাৎ রাজ্যগুলি এই স্কিমে অনেকটাই লাভবান হল। চিদাম্বরম বলছেন তিনি রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করবেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে টাকাটা খরচের জন্য। রাজ্যগুলি এটা অবশ্য মানবে, না অন্যখাতে খরচ করবে তা রাজ্যের ব্যাপার। যা বোঝা যাচ্ছে রাজ্যগুলি শিক্ষা বা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই অর্থ খরচ করবে না। তারা 'অন্য খাতেই' খরচ করতে চায়।

ব্ল্যাক মানি আগে কতটা সাদা হয়েছিল

বছর	স্কিমের নাম	ট্যাক্স কালেকশান
১৯৫১	ভলান্টিয়ারি ডিসক্লোসার স্কিম	১০.৮৯ কোটি
১৯৬৫	ভলান্টিয়ারি ডিসক্লোসার স্কিম (১)	৩০.৮০ কোটি
১৯৬৫	ভলান্টিয়ারি ডিসক্লোসার স্কিম (২)	১৯.৪৫ কোটি
১৯৭৬	ভি ডি আই ওয়েলথ স্কিম	২৫৬.৭০ কোটি
১৯৮৫	ডিসক্লোসার স্কিম থ্রু সারকুলার	৪৫৮.৭৯ কোটি
১৯৯৭	ভি ডি আই এস	১০,০৫০ কোটি

১০,০৫০ কোটি টাকা ট্যাক্স দেওয়ার ফলে প্রায় ৩৩,০০০ কোটি কালো টাকা সাদা হল। প্রশ্ন উঠেছে ভারতীয় অর্থনীতিতে কত 'কালো' টাকা আছে?

কালো টাকা কাকে বলে তাই নিয়ে মতান্তর আছে। এক দলের মতে কালো টাকার 'সঙ্কীর্ণ' ব্যাখ্যা হচ্ছে কৃত ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে বছরে যারা ট্যাক্স দিতে পারে কিন্তু দেয়নি তা হচ্ছে ১ লক্ষ কোটি টাকা। আবার অন্য আরেক দল মনে করে কালো টাকার 'বিস্তৃত' ব্যাখ্যা দরকার। কালো টাকা বিনিয়োগ করে তার থেকে আয় যেটা ট্যাক্স নোটের মধ্যে আসে না তার নাম দেওয়া হচ্ছে 'কমপাউন্ড ব্ল্যাক মানি'। বলা হচ্ছে 'কমপাউন্ড ব্ল্যাক মানি' সরল কালো টাকা' থেকে অনেকাংশে বেশি। আর তৃতীয় ব্ল্যাক মানির নাম দেওয়া হচ্ছে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্ল্যাক মানি'। অর্থাৎ ব্যুরোক্র্যাটরা তাঁদের 'কাজের জন্য' উৎকোচ গ্রহণ করেন সেটা ব্ল্যাক মানি তবে সেটা কত জানা যায় না। এছাড়া আছে 'সিস্টেম ব্ল্যাক মানি'। এই কালো টাকা হয় ইমপোর্ট বা এক্সপোর্টের আন্ডার ইনভয়েজিং থেকে। ড্রাগ মানি, স্মাগলার মানি ইত্যাদি মানিও ব্ল্যাক মানি যা 'সিস্টেম' থেকে আসে। অর্থাৎ কালে টাকার এত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে যে সেটা মাপা প্রায় অসম্ভব।

তবুও তার মাপার জন্য চেষ্টা হয়েছে। পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গত জানুয়ারি মাসে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলে জানিয়েছেন যে তখন কালো টাকা ভারতে ৭ লাখ কোটি টাকা। অন্য একজন অর্থনীতিবিদ কমলনয়ন কাব্‌রা অনেক খেটেখুটে বের করেছেন যে কালো টাকা আরও অনেক বেশি প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি থেকে ৩০ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর হিসাব যদি ন্যূনতম হয় তবে সেটা ৭ লক্ষ কোটি টাকা। আর কাবরার কথা যদি ধরি তবে সেটা অন্তত ২৫ লক্ষ কোটি টাকা। যদি মাঝামাঝি আমরা ধরি তা অন্তত ১৬ লক্ষ কোটি টাকা। তবে এক বিষয়ে সবাই একমত—প্রতি বছর ১ লক্ষ কোটি থেকে ৩ লক্ষ কোটি কালো টাকা তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে এ বছর ৩০ হাজার কোটি কালো টাকা সাদা হয়েছে। অর্থাৎ বহুগুণ কালো টাকা অর্থনীতিতে আছে তা আমাদের সমস্ত সরকারি ব্যবস্থাকে বানচাল করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ অর্থনীতির সমান্তরাল এক বিরাট বিশাল 'আন্ডারগ্রাউন্ড' বা 'পাতাল' অর্থনীতি আছে, যাকে কোনো সরকারই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অর্থাৎ 'অনিয়ন্ত্রিত' অর্থনীতি এতই প্রবল ও পরাক্রমশালী যে সেখানে সরকারি ব্যবস্থা অব্যবস্থা হতে বাধ্য।

কালো টাকা সৃষ্টি হবার অনেক কারণই আছে তবে মূল কারণ দুটো। আমাদের দেশে ট্যাক্সের হার এতই বেশি যে লোকেরা ট্যাক্স দিতে চায় না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর বা ইনকাম ট্যাক্স অতি অল্প সংখ্যক লোকই দেয়। ফলে হারও বেশি। আমাদের কৃষিতে কোনো প্রত্যক্ষ ট্যাক্স নেই। পঞ্জাবের অবস্থাপন্ন চাষীরা ট্যাক্স দেয় না। ট্যাক্স দেয় যারা মুখ্যত চাকুরিজীবী। যেহেতু ট্যাক্স দেয়

অল্প সংখ্যক লোক তাই ট্যাক্সের হার বেশি ও কালেকশনও কম।

উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রত্যেক উন্নত দেশে জাতীয় আয়ের প্রায় ১৮ শতাংশ ট্যাক্স তোলা হয়। অর্থাৎ ট্যাক্স আর জাতীয় আয়ের রেসিও উন্নত দেশে ১৮ শতাংশ। অনুন্নত দেশে যেমন নিকারাগুয়ায় ২৪ শতাংশ, মঙ্গোলিয়ায় ২১ শতাংশ, কেনিয়াতে ২০ শতাংশ, ইথিওপিয়াতে ১২ শতাংশ। সেখানে ভারতে কোনো বছরই ১১ শতাংশের বেশি হয়নি। কারণ কৃষি থেকে আয়, আয়কর বহির্ভূত। আর ভারতবর্ষে ৭০ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

যেহেতু আমাদের ট্যাক্স বেসটা খুবই সঙ্কীর্ণ আমরা হারটা বড্ড বেশি করে রেখেছি। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৮ সালে এমন ট্যাক্সের হার করেছিলেন যে যদি সৎ নাগরিক হতে হয় আর আয় যদি বেশি হয় তবে ১০০ টাকা রোজগার করলে মাত্র ২.৩০ টাকা হাতে থাকে বা সরকারকে ৯৭.৭ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হবে। হারটা এতই বেশি যে 'সৎ' নাগরিক না হবার প্রবৃত্তিই বেশি। আবার সিস্টেমটা এমনই যে 'সৎ' হতে গেলে ঠকতে হয়, তাই লোকে ট্যাক্স দিতে চায় না। তাছাড়া আমেরিকাতে ট্যাক্স ফর্ম একপাতা-দুইপাতা। আর আমাদের ট্যাক্স ফর্ম এতই গোলমেলে যে প্রায় ২০ থেকে ২৪ পাতা পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ ট্যাক্স লোকেরা দিয়ে দিতে চায় যদি আইন সহজ হয় ও মানবিক হয়। আমাদের ট্যাক্স আইন বজ্র আঁটুনি কিন্তু ফস্কা গেরো। ফলে ব্ল্যাকমানি। আইন আছে, তার ব্যতিক্রম, আবার তার ব্যতিক্রম, আবার তার ব্যতিক্রম। ফলে লোকেরা বোঝে না যে তারা ফাঁকি দিচ্ছে বা ফাঁকি দেওয়াই সহজ।

এবার অবশ্য কিছু ব্ল্যাক মানি সাদা হল। সরকারি হিসাবে প্রায় ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩১ জন তাদের ব্ল্যাক মানি সাদা করল এবং প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা এখন সাদা টাকা। অর্থনীতিতে এখন আইনসিদ্ধ।

এই যে ৩৩ হাজার কোটি টাকা এখন আইনসিদ্ধ হয়ে সাদা টাকা হয়ে গেল তার ফলে অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলবে? নানান লোক নানান কথা বলছে। কোন্‌টা সত্য তা বলা মুশকিল।

১) বলা হচ্ছে অর্থনীতিতে হঠাৎ মোটর গাড়ির চাহিদা বিশেষত দামী মোটরগাড়ির চাহিদা ভয়ানকভাবে বেড়ে যাবে। ভারতে এখন ২১ থেকে ২২ ধরনের নামী-দামী মোটরকার আছে। আগে কালো টাকাওয়ালা কিনতে ইতস্তত করত। যদি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ধরে। এখন কিছু টাকা সাদা হবার ফলে নামী-দামী স্ট্যাটাস সিম্বল যুক্ত গাড়ি এবং অন্যান্য বিদেশী গেজেটের চাহিদা বাড়বে। অর্থাৎ পেট্রোলের চাহিদা বাড়বে। তার মানে আবার অয়েলপুল ডেফিসিট বাড়বে। আবার পেট্রোলের দাম বাড়বে।

২) জমির ফাট্‌কাবাজারি আরও বাড়বে। জমির দাম ক্রমশ বাড়বে। জমি কেনাই হবে ভবিষ্যতের ইনস্যুরেন্স। শহরাঞ্চলে কৃষি জমি প্রমোটারদের হাতে যাবে। পঃ বঙ্গে চায়ের জমি তো সরকারই দালালদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

সমগ্র ভারতবর্ষে 'চাঁদমণি' হবে কালো টাকা সাদা হবার সিম্বল। এখন 'চাঁদমণি' অর্থনীতিই চালু ও আইনসিদ্ধ হল। সরকারও 'কুইক মানি' পাবার আশায় সরকারি জমি সবই দালালদের কাছে বিক্রি করবে।

৩) সোনা এবং অন্যান্য জুয়েলারির চাহিদা ক্রমশ বাড়বে। সোনার দাম এখন কমের দিকে। কিন্তু আশা হচ্ছে এই 'কম দাম' সাময়িক মাত্র। সোনার দাম বাড়বেই—অন্তত এই আশাই করা হচ্ছে। অর্থাৎ সোনা এবং অন্যান্য জুয়েলারি রত্ন ইত্যাদির চাহিদা বাড়বে।

৪) শেয়ার বাজারে লোকেরা বিশেষ বিনিয়োগ করবে না। কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। একবার পার্লামেন্টে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ পায় কি। পরের বারও হবে না। অতএব শেয়ার বাজারে বেশি বিনিয়োগ না করে জমি ও সোনাতেই করবে।

অর্থাৎ এই ৩৩ হাজার কোটি কালো টাকা যে সাদা হল তাতে দেশে শিল্পায়ন বা বিনিয়োগ কি হবে? উত্তর হচ্ছে তা হবে না। টাকাটা খরচ হবে 'স্ট্যাটাস সিম্বলের' দিকে। অর্থাৎ গাড়ি, বাড়ি, জমি ও অলঙ্কার কেনার দিকে।

চাকরি বিশেষ তৈরি হবে না। এটা অবশ্য সরকারও বোঝে ও জানে।

বাজেট ঘাটতি কমাতে ক্রমাগত ঋণজালে আবদ্ধ হচ্ছে ভারত

এবারকার বাজেটে নতুন কোনো প্রস্তাব নেই। কর কোথাও বিশেষ বাড়েনি, ব্যয় কিছু কিছু জায়গায় প্রান্তিকভাবে বেড়েছে। মোটের উপর নির্বাচনের আগে বাজেটে নতুন কিছু আশা করা অন্যায়। এই বাজেট মধ্যবর্তীকালীন— অতএব পরিবর্তনের আশা অর্থহীন।

যদিও মনমোহন সিং-এর বাজেটে নতুন কিছু প্রস্তাব নেই তবুও এবারকার 'অর্থনীতির সমীক্ষা' কিছু আলোড়ন তুলেছে। বলা দরকার প্রত্যেক বাজেটের আগে একটা অর্থনীতির সমীক্ষা থাকে। মনমোহন সিং যেভাবে 'সমীক্ষা'টি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করেছেন তাতে অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলেছেন এই সমীক্ষা কি ভারতের আসল অবস্থার প্রতিফলন না মনগড়া কথা? নির্বাচনের আগে বড় বড় কথা বলতেই হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রে 'প্রপাগান্ডার' স্থান একটা আছে—এই সমীক্ষা কি সেই প্রপাগান্ডার ঢাক এবং ঢোল?

১) শ্রীমনমোহন সিং আমাদের জানাচ্ছেন যে, দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ক্রমাগত কমছে—বর্তমান তা ৫ শতাংশের কাছাকাছি। কিছু অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তুলেছেন যে তথ্যটা কি সঠিক? না এটা মুদ্রাস্ফীতির 'সংজ্ঞার' একটা খেলা মাত্র? কারণ আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে।

সরকারি মতে ভারতবর্ষে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলতে বুঝি পাইকারি দরের ওঠানামা। অথচ সাধারণ লোকেরা খুচরো বাজার থেকে জিনিসপত্র কেনে। পাইকারি দর সামান্য ওঠানামা করলেও দিল্লি থেকে পাইকারি দরে মুদ্রাস্ফীতির গতি প্রকৃতি ঠিক করা হয়। কিন্তু সিমলা থেকে তৈরি করা হয় কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স। সাধারণ লোকদের পক্ষে এই কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স, প্রকৃতপক্ষে প্রযোজ্য।

অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির দুইরকম 'সংজ্ঞা' হতে পারে—একটা সরকারি হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স (WPI) আর অন্যটা কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স

(CLI)। দেখা যাচ্ছে দিল্লি থেকে প্রকাশিত WPI-এর সঙ্গে সিমলা থেকে প্রকাশিত বা CLI বা কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্সের কোনো সামঞ্জস্য নেই। কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে—অনেক বেশি হারে বাড়ছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ কথাটা আপেক্ষিকভাবে নিতে হবে। ইলেকট্রনিক দ্রব্য বা কম্পিউটার ইত্যাদির দাম কমেছে। ফলে পাইকারি দাম কমছে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা কম্পিউটার খায় না বা ব্যবহার করে না এবং তার দামের কমার সঙ্গে জীবনযাত্রার খরচের দামের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। অতএব মনমোহন সিং যখন বলছেন যে মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে, তিনি যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তার সঙ্গে সাধারণ লোকদের অভিজ্ঞতা বা ভুয়োদর্শন আলাদা। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা নিয়ে এক বিরাট প্রশ্ন, সাধারণ লোকদেব 'দর্শন'টা ভুয়ো না সরকারি।

অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে দুটো ভাগ করা হয়—অন্যটাকে বলা হয় 'বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি' আর একটাকে বলা হয় 'প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি'। সরকার নিজেই মনে করে যে কিছুদিনের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার বহুল পরিমাণে বাড়বে। অর্থের অবমূল্যায়নে পেট্রোলজাত দ্রব্যের দাম আরও বাড়বে আর সরকারি শিল্পজাত দ্রব্যের দামও বাড়বে। আর তার জন্য চতুর্দিকে নানান বিধিনিষেধ—যার অপর নাম লিক্যুডিটি ক্রানচ সুদের হার ক্রমশ বাড়ছে। কখনও কখনও তা ২০ শতাংশের কাছাকাছি। সুদের হার ইন্টারকরপোরেট বাজারে কিছুদিন আগে ৩০ শতাংশে পৌঁছেছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক চড়া হারে সুদ চাচ্ছে এবং নিচ্ছে। অর্থাৎ বাজার ক্রমশ সংকুচিত।

কিছু অর্থনীতিবিদ বলছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা যদি প্রবল না হয় তবে আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার এই অবমূল্যায়ন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সুদের হার এত বেশি তাতে এটাও মনে করা দরকার যে বাজারে মুদ্রাস্ফীতির হার অনেক বেশি। সরকার সংখ্যাতত্ত্বে তা স্বীকার না করলেও 'সরকারি নীতিতে' তা স্বীকার করা হচ্ছে। শেয়ার বাজার নিম্নমুখী। সবাই শেয়ার বিক্রি করে দিতে চায়। ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে অস্বীকার করছে বলে চতুর্দিকে বিনিয়োগের অভাব। সবার মুখ্য কারণ একটাই—প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি। শ্রীমনমোহন সিং স্বীকার করুক বা না করুক।

২) প্রথম বাজেটে শ্রীমনমোহন সিং একটা পার্থক্য করেছিলেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন বাজেট ঘাটতি আর ফিসকল ঘাটতি। বাজেট ঘাটতি মানে আমরা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর তুলি তার থেকে যদি বেশি ব্যয় করি একটা বছরে, তার নাম 'বাজেট ঘাটতি'। কর ছাড়াও সরকার নানান স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার থেকে তোলে। এই ঋণের অধিকাংশই আমাদের ব্যয় মেটাতে চলে যায়। আমাদের বাজেট ঘাটতি কম হলেও ফিসকল ঘাটতি বেশি হতে পারে। অর্থাৎ সরকার বাজার থেকে ঋণ তুলে সেই ঋণ মেটাবার উপায় বের করতে পারে। হয় আমরা আবার ঋণ তুলে ঋণ

মেটাবার চেষ্টা করতে পারি অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে এই দায়িত্ব তুলে দিয়ে পাঁচ বছর বাদে চলে যেতে পারি। অর্থাৎ ঋণ তোলার একটা ভয় আছে—সেটা হচ্ছে ঋণজালে আবদ্ধ হবার সম্ভাবনা। ইংরেজিতে একে বলে ডেট ট্র্যাপ।

ভারতবর্ষে এবারকার সমীক্ষায় মনমোহন সিং নিজেই স্বীকার করেছেন যে বাজেট ঘাটতি জাতীয় আয়ের ছ'শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে—যদিও টার্গেট ছিল পাঁচ শতাংশ। এটা অবশ্য এক ধরনের সাফল্য—কারণ ১৯৯১-৯২ সালে বাজেট ঘাটতি ছিল জাতীয় আয়ের ১১ থেকে ১২ শতাংশ।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে আমাদের ফিসকল ঘাটতি কি কমেছে? উত্তর হচ্ছে আমরা ফিসকল ঘাটতি কমাতে পারিনি। ১৯৯৬-৯৭ সালে আমাদের ফিসকল ঘাটতি প্রায় ৬৩ হাজার কোটি টাকা—এবং তা জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ। আর পরের বছরে আমাদের আগে যে ঋণপত্র ছেড়েছিলাম তার জন্য এই বছরে সুদ দিতে হবে প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকা। আগের বছরে এই সুদের জন্য ধরা ছিল দু'হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ঋণপত্রের ম্যাচুরিটি বাবদ খরচ লাগবে ৬৩ হাজার কোটি টাকা আর সুদ বাবদ খরচ লাগবে প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকা। এই পূর্ণ অঙ্কটা জাতীয় আয়ের এক বিশাল অনুপাত। ফলে প্রশ্ন উঠছে আমরা কি বাজেট ঘাটতি কমাতে গিয়ে ঋণজালে ক্রমাগত আবদ্ধ হতে চলেছি?

প্রশ্নটার সহজ উত্তর নেই। তবে সরকারি ঋণপত্রের উপর যে সাধারণ লোকের আস্থা কমছে তা একটা ঘটনা থেকে পরিষ্কার। গত বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দু'হাজার কোটি টাকার বন্ড বাজারে ছেড়েছিল। সমীক্ষায় স্বীকার করা হচ্ছে মাত্র ১৭০ কোটি টাকা লোকেরা কিনেছে। অর্থাৎ সরকারি ঋণপত্রের উপর ক্রমাগত লোকের আস্থা কমে যাচ্ছে। সুতরাং বাজেট ঘাটতি কমাতে গিয়ে আমরা ফিসকল ঘাটতি বাড়িয়েছি—আবার উল্টোটাও সত্যি হতে পারে, ফিসকল ঘাটতি কমাতে গিয়ে বাজেট ঘাটতি বাড়াতে হতে পারে।

৩) সরকারি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে জাতীয় আয়ের সঞ্চয় ক্রমাগত বেড়েছে। অনুমান করা হচ্ছে জাতীয় সঞ্চয় জাতীয় আয়ের ২৪.৪ শতাংশ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি সঞ্চয়ের হার। ১৯৯০-৯১ সালে জাতীয় আয়ের ২৩.৬ শতাংশ, ১৯৯২-৯৩ সালে তা ছিল ২১.২ শতাংশ—এবার তা বেড়েছে।

কিছু অর্থনীতিবিদ 'সঞ্চয়ের সংজ্ঞা'টা কি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সঞ্চয়ের মধ্যে কালো টাকা ধরা হয়েছে কি? কালো টাকার সঙ্গে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কি? যদিও ধরে নেওয়া যাক সঞ্চয়ের হার বেড়েছে, তবে কি তা সবটাই বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে বা ক্যাপিটাল তৈরি করছে? না বিরাট এক অংশ বিনিয়োগে আদৌ আসছে না? সঞ্চয় বাড়ছে অথচ আমরা বিনিয়োগের জন্য বহুজাতিক সংস্থাকে আমন্ত্রণ করছি। যখন আমরা বহুজাতিক সংস্থাকে নিমন্ত্রণ

করছি তখন তর্কের বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের সঞ্চয় এতই কম যে বহুজাতিক সংস্থা ছাড়া গতি নেই। কোন্‌টা সত্য?

আবার সঞ্চয়ের রেকর্ড বলে যাকে ভাবছি তা কি সত্যি? কারণ আমাদের প্রতিবেশী দেশে সঞ্চয়ের হার আমাদের থেকে বেশি। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তা প্রায় ৩৫ শতাংশ---কেনিযাতে প্রায় ৩৭ শতাংশ, চীনে ৩০ শতাংশ।

অবশ্য প্রত্যেক দেশই তাদের পছন্দমতো সংজ্ঞা তৈরি করে। সঞ্চয়ের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির একটা সম্পর্ক আছে। সঞ্চয় বাড়ছে, বিনিয়োগ বাড়ছে কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের উৎপাদিকা শক্তি তত বাড়ছে না। পূর্ব এশিয়ায় এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে সঞ্চয় বাড়ার সঙ্গে বহুগুণ উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তা হয়েছে।

আমাদের সমীক্ষায় আশ্চর্যের বিষয়, এই উৎপাদিকা শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি কথা বলা হয়নি। যদি সঞ্চয় বাড়ে অথচ উৎপাদিকা শক্তি না বাড়ে তবে বুঝতে হবে কোথাও একটা গলদ আছে। দেশের উন্নতি নির্ভর করে এই উৎপাদিকা শক্তির উপর---অথচ সমীক্ষায় এর সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয়নি।

৪) শ্রীমনমোহন সিং-এর দাবি যে দারিদ্র্যসীমার নিচে ক্রমাগত লোকসংখ্যা কমেছে। ১৯৮৭-৮৮ সালে সরকারি তথ্য অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকসংখ্যা ছিল ২৫ শতাংশ ১৯৯৩-৯৪ সালে তা নাকি ১৯ শতাংশ। এটা সরকারি তথ্য ও দাবি।

মনমোহন সিং দারিদ্র্যসীমার কোনো সংজ্ঞা দেননি। আরও আশ্চর্যের বিষয় গত মাসে যোজনা কমিশনের একটি রিপোর্ট বেরিয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল খরচ বাড়ার সঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকের সংখ্যা বাড়ছে---এবং তা গ্রামের লোকসংখ্যার প্রায় ৪৯ শতাংশ।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দারিদ্র্যসীমার নিচে কত লোক আছে তা নিয়ে নানান তর্ক। ডাণ্ডেকার এবং রথ, প্রণব বর্ধন প্রমুখ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা কোনো সময়েই সরকারি তথ্য মানেন না। তাঁদের ধারণায় এই সংখ্যা কম করে ৪০ শতাংশ আর বেশি হলে ৬০ শতাংশ। কারণ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যসীমার নিচে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকের সংখ্যা কমছে এটা বলা মানে বিরাট এক তর্কের সূচনা। এই তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দারিদ্র্যর সংজ্ঞা থাকা উচিত ছিল। এই সমীক্ষায় দারিদ্র্যের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

মোট কথা এইবার বাজেট নিয়ে তর্ক বিশেষ হচ্ছে না—তর্কটা হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনীতি কোন্ দিকে চলছে? সরকারি অর্থনীতিবিদরা যেহেতু সরকারি তাই যে ধরনের ছবি তুলেছেন তা সাধারণ লোকের কাছে পূর্ণগ্রাহ্য না হতেই পারে। বস্তুত ভারতের অর্থনীতি নিয়েই প্রশ্ন তোলা

হচ্ছে—বাজেট বা ভোট অন অ্যাকাউন্ট নিয়ে নয়।

নির্বাচনের আগে ভোটের প্রয়োজনে সব সময় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সব পার্টিই নানান কৃতিত্বের দাবি করে। বাম, দক্ষিণ, মধ্য ইত্যাদি পার্টিই জোর করে সবাইকে বোঝাতে চায় তারা দেশে দুধ ও মধুর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। বাম পার্টিও একই কাজ করেছে। আর তাছাড়া 'বড় শিল্প' ভারতে বর্তমানে যা চলছে তার নাম দেওয়া হচ্ছে 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন'। পঃ বঙ্গে গত নির্বাচনের আগে নাকি ৭০টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল, কাজ শেষ হয়েছে পাঁচ বছরে দশটিতে। অর্থাৎ 'প্রতিশ্রুতি' নির্বাচনের আগে দিতেই হয়। দেশ তাদের নেতৃত্বে খু-ব ভালো চলছে তাও বলতে হয়। বর্তমান অর্থনৈতিক সমীক্ষায় মনমোহন সিং ঠিক এই কাজটিই করেছেন।

কর্মসংস্থান না বাড়লে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভয়াবহ রূপ নেবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে রাজ্যের বেকারির ভয়াবহতায় চিন্তান্বিত। কিছুদিন আগে গ্রামীণ উন্নতির যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে আমরা রাজ্যে চাকরির সৃষ্টির জন্য যে টার্গেট ধরেছিলাম তা তো পূর্ণ হয়নি বরং অবস্থা আশঙ্কাজনক। যেমন ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনায় আমাদের রাজ্যের টার্গেট ছিল ২২,৯০০ কে চাকরি দেবার কথা কিন্তু আমরা মাত্র ১৩০০ জনের চাকরির সংস্থান করতে সক্ষম হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় যে সামান্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি তাতে প্রশ্ন উঠেছে আগামী পাঁচ বছরে আমরা যে পাঁচ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টি করার টার্গেট করেছি তা আদৌ সম্ভব হবে কিনা। বামফ্রন্ট আগামী পাঁচ বছরে এই নতুন পাঁচ লাখ চাকরি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বেকারি যে ভয়াবহ তা সবার জানা কথা। যে পরিসংখ্যান আমাদের বেরিয়েছে তাতে বলা হচ্ছে যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের বেকারি বা রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। পরিসংখ্যান কেউ মানবে কেউ মানবে না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা, তার একটা অর্থ পঃ বঙ্গে চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন। রেজিস্টার্ড বেকার ছাড়া রেজিস্টার্ড বহির্ভূত বেকারের সংখ্যা যে কত তার হিসাব পাওয়া মুশকিল। মোট কথা বেকারির চিত্র ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ।

প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় যে আমরা চাকরি বেশি সৃষ্টি করতে সক্ষম হইনি, তার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে ব্যাঙ্কের যে অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল তা পাওয়া যায় না। আমাদের রাজ্যের ব্যুরোক্রেসি ব্যাঙ্কগুলিকে দোষ দিচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলি অর্থ সাহায্য দিচ্ছে না বলেই স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলি ঠিক মতো চলছে না। যেমন ১৯৯৫-৯৬ সালে জেলা শিল্প দপ্তর প্রায় ৫০০০ মতো

প্রকল্পকে সরকারি তরফ থেকে 'রেকোমেন্ড' করা হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র ব্যাঙ্কের সাহায্য পেয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় আমরা বেশি কিছু করতে সক্ষম হইনি।

ব্যাঙ্কগুলি তাদের রিপোর্টে অবশ্য অন্য কথা বলে। তাদের বক্তব্য যে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প তৈরি করা আর জেলা শিল্প দপ্তর থেকে রেকোমেন্ড পাওয়ার মধ্যে সময়ের বিস্তর ব্যবধান। লাল ফিতার বাঁধনে প্রকল্পগুলি আটকিয়ে থাকে। যখন ব্যাঙ্কের কাছে আসে তখন দেখা যায় প্রকল্পগুলি হয় ঠিকমতো তৈরি হয়নি, কিংবা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ব্যাঙ্কগুলি আরও বলতে চায় এবং পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চায়, বহু প্রকল্পের মালিক ঋণ যখন কোনোদিনই শোধ করেনি—অনাদায়ী অর্থ বহুদিন ধরে পড়ে আছে। তারা আরও বলছে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ধার শোধ দিচ্ছে না প্রায় ৬৯ শতাংশ লোক। অতএব নতুন করে ঋণ দেবার আগে 'চিন্তা ভাবনা' করা দরকার। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অনাদায়ী ঋণ নিয়ে যে সমীক্ষা বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে একটা প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে যে ঋণ নিয়ে শোধ না করা। পঞ্জাবে বা পশ্চিম ভারতে এই সমস্যা আছে তবে পশ্চিমবঙ্গের মতো এত ব্যাপক নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন যোজনায় পঃ বঙ্গে কেন চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে না তাই নিয়ে সরকার ও ব্যাঙ্কের মধ্যে নিয়তই ঠাণ্ডা যুদ্ধ।

একটা প্রশ্ন উঠেছে। তা হচ্ছে আমরা বলছি যে পঃ বঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৮০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করব। অর্থাৎ শিল্পে এক জোয়ার আসবে। অথচ চাকরির টার্গেট যখন আমরা করেছি তখন দেখছি যে 'শিল্পে' আগামী পাঁচ বছরে বেশি লোকের চাকরি হবে না এটা আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছি। যদি চাকরি শিল্পে বাড়ে বা যা ভাবা হচ্ছে তা অত্যন্ত প্রান্তিক। সমগ্র চাকরির সংস্থান বা পাঁচ লাখ নতুন চাকরি আমরা রাজ্যে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সৃষ্টি করার জন্য চিন্তা করছি। এর মানে দুটো হতে পারে। (এক) আমরা নিজেরাই বিশ্বাস করি না যে এই বিপুল বিনিয়োগ শিল্পে হবে, তাই চাকরির সৃষ্টি যে এখানে হবে না তাই ধরে নিচ্ছি। অর্থাৎ ৮০,০০০ কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ হবে আমরা নিজেরাই খুব একটা ভরসা করছি না। (দুই) যদিও ৮০,০০০ কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ করি এবং নতুন নতুন শিল্পে তা প্রয়োগ করি তবে তা হবে এতই আধুনিক, এতই টেকনোলজি নির্ভর, এতই পরদেশ নির্ভর যে দেশে চাকরির সৃষ্টি অন্তত শিল্পে বিশেষ হবে না। যেহেতু আমাদের চিন্তা হচ্ছে 'স্বনিযুক্ত প্রকল্প' তাই শিল্প যে বেশি চাকরি সৃষ্টি করবে না তাই আমরা ধরে নিচ্ছি। অন্তত আগামী পাঁচ বছরে।

'স্ব-নিযুক্ত' প্রকল্পর ঠিক মানে কি? এর মানে কি নতুন নতুন দোকান? এর মানে কি নতুন নতুন ছোট শিল্প? অধিকাংশ সময়ে দেখা যাচ্ছে 'স্ব-নিযুক্ত' প্রকল্প মানে আরও কয়েকটা নতুন নতুন দোকান। তার মানে আগে যেখানে

পঞ্চাশটা কাপড়ের দোকান ছিল, সেখানে নতুন কাপড়ের দোকান হবে আরও পাঁচশ'। যেখানে পাঁচটা জেরক্সের দোকান ছিল সেখানে হবে আরও পঞ্চাশটা। আর অলিতে গলিতে হবে কম্পিউটার শেখানোর জন্য নতুন নতুন 'স্কুল'। স্বনিযুক্ত প্রকল্প মানে যদি কয়েকটা 'দোকান' করা হয় তবে কি সমস্যা মিটবে? যেমন শিলিগুড়ি শহরে অসংখ্য 'দোকান' সৃষ্টি হবার মানে এমন তীব্র প্রতিযোগিতা যে তাতে একদল যেভাবে বেঁচে থাকবে তার নাম মিরডাল সাহেব বলেছেন 'প্রচ্ছন্ন' বেকারি। আপাতদৃষ্টিতে কিছু লোক একটা দোকান খুলে বসে আছে কিন্তু তার বিক্রি এতই কম যে তাতে ন্যূনতম জীবনযাপন করার স্ট্যান্ডার্ড থাকে না। অসংখ্য শহরে 'স্ব-নিযুক্ত' প্রকল্পের এই চেহারা।

স্ব-নিযুক্ত প্রকল্প মানে নতুন 'শিল্প' সৃষ্টি? সমস্যা হচ্ছে আমাদের পঃ বঙ্গে যে ক্ষুদ্র শিল্প আছে তার ভৌগোলিক বিভাজন আর যাই হোক সুন্দর নয়। যেমন উত্তরবঙ্গে কোনো বৃহৎ শিল্প নেই, যা আছে তাই ক্ষুদ্র শিল্প। সমগ্র পঃ বঙ্গে ১৯৮৭-৮৮ সালে পঃ বঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের প্রায় ৫৪ শতাংশ কলকাতা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কলকাতা ছাড়া অন্যান্য দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৩১ শতাংশ, আর উত্তরবঙ্গে মাত্র ১৫ শতাংশ। যদিও ক্ষুদ্র শিল্প উত্তরবঙ্গে মাত্র ছয়টি জেলায় ১৫ শতাংশ কিন্তু সামগ্রিক ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত লোকের মাত্র ১২ শতাংশ শ্রমিক এখানে নিযুক্ত। অর্থাৎ সংখ্যা হিসেবে সমগ্র পঃ বঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পের মাত্র ১৫ শতাংশ উত্তরবঙ্গে, আর শ্রমিক নিয়োগ হিসেবে মাত্র ১২ শতাংশ। অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এখানে শুধু ক্ষুদ্র নয় হয়তো ক্ষুদ্রতর। আর যা ছোট শিল্প আছে তাও মুখ্যত শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অঞ্চলে অন্যত্র কিছুই প্রায় নেই। কেন নেই?

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্র শিল্পের যে পরিকাঠামো থাকা দরকার ছিল তা এখনও নেই। এখানে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যায়, বাজার তৈরি হয়নি, আর সরকারও খুব একটা নজর দেয়নি। ক্ষুদ্র শিল্পের বেলায় মনে রাখা দরকার 'ভূমিপুত্র' থিওরি বাজারের চাহিদার ক্ষেত্রে এখানে চলে না—যদিও চাকরি দেওয়ার বেলায় 'ভূমিপুত্র' কথাটা প্রায় জোরের পর্যায়ে চলে গেছে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের অন্তত 'স্ব-নিযুক্ত প্রকল্প' মানে আরও দোকান সৃষ্টি।

পঃ বঙ্গে অবশ্য 'স্ব-নিযুক্ত' প্রকল্প ছাড়া আরও একটা স্ট্র্যাটেজির কথা বলা হয়। বলা হয় যে বর্গা আইনে এখানে এক কৃষি বিপ্লব এসেছে। কৃষি বিপ্লব হলে লোকের কেনার ক্ষমতা বাড়বে। কেনার ক্ষমতা যেই বাড়বে কৃষির প্রয়োজনে শিল্প তৈরি হবে। আর একটা শিল্প তৈরি হলে আরও শিল্প তৈরি হবে।

পঃ বঙ্গে সত্যি সত্যি কৃষির উন্নতি হয়েছে। আমাদের কৃষির উন্নতির হার ৬ শতাংশের বেশি—যা ভারতে অন্যান্য অঞ্চলে নেই। কিন্তু আরও একটা সত্যি কথা এই, কৃষি উন্নতি 'অসমান' দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ জেলায়

সীমাবদ্ধ। গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে আসেনি। যদিও সামগ্রিকভাবে গত পাঁচ বছরে আমাদের পঃ বঙ্গে কৃষির উন্নতির হার ৬ শতাংশ বা তার বেশি, উত্তরবঙ্গে তার মাত্র ২ শতাংশ বা তার নিচে।

এই 'অসমান' উন্নতির ফলে যে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ার কথা ছিল তা হয়নি। 'অসমান' উন্নতির এটা একটা সম্ভাব্য পরিণাম। আর কৃষি উন্নতি হলেই যে শিল্পে উন্নতি হবে এবং এখনই হবে এমন সহজ-সরল তত্ত্ব এখানে পঃ বঙ্গে বিশ্বাস করা কঠিন।

বস্তুত কৃষিতে উন্নতি হয়েছে, অথচ শিল্প যা আছে তা নিম্নাভিমুখী। সামগ্রিকভাবে ১৯৮০ সালকে যদি আমরা ১০০ ধরি তবে ১৯৮২ সালে শিল্পে গতির হার ১০২.৩ আর ১৯৮৭ সালে ১০২.০৪ অর্থাৎ ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত শিল্পের উন্নতির হার বিশেষ ছিল না। পাট ও বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যাক। পাট শিল্পের শ্রমিকের চাকরি সামগ্রিকভাবে ১৯৭৬ সালে ছিল ২৯ শতাংশ তা ১৯৮০ সালে কমে দাঁড়ায় ২২ শতাংশ। বস্ত্র শিল্পে ১৯৮৫-৮৬ সালে উন্নয়নের হার ছিল ৬.২৩ শতাংশ, ১৯৮৮-৮৯ সালে তা হয় (মাইনাস) -৪.০৪ শতাংশ। লৌহ শিল্পে ১৯৮৫-৮৬ সালে গতির হার ছিল ২২.২১ শতাংশ তা কমে দাঁড়ায় ১৯৮৮-৮৯ সালে (মাইনাস) -১৬.৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ সর্বত্রই বড় শিল্পগুলি ধুঁকছে আর নতুন চাকরিও বিশেষ সৃষ্টি হয়নি। আরও অজস্র উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে বড় শিল্পে উন্নতির হার শুধু যে কম তাও সবটাই সত্যি নয়, অনেক সময়ে তা মাইনাস।

এই অবস্থায় পঃ বঙ্গে চাকরির সুযোগ কি করে বৃদ্ধি পেতে পারে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে শিল্পে আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানে তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। যে ধারণা ছিল তা অমূলক বলে মনে হচ্ছে। ভাবা হয়েছিল কৃষি উন্নতি হলেই শিল্পের উন্নতি আপসে হবে। তা যে সত্যি নয় তা বর্তমান শিল্প ব্যবস্থা থেকে পরিষ্কার। শিল্পে উন্নতির জন্য যে পরিকাঠামো, রাস্তা সংস্কার, বিদ্যুৎ, জল ও জমি দরকার, তার জন্য পৃথক নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক বড্ড জটিল। এই জটিল সম্পর্ক বোধহয় অর্থনীতিবিদরা ইউরোপের প্রথম শিল্প বিপ্লব থেকেই আলোচনা করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এই আলোচনা প্রায় দু'শ বছর ধরে চলছে। আমাদের শিল্পমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী তা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন।

বর্তমানে শিল্পের অবস্থা করুণ। পুরনো শিল্প দিয়ে বঙ্গদেশ উদ্ধার করার কল্পনা কেউই করে না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেমিকেল শিল্প বা অন্যান্য শিল্প যে হারে পশ্চিম ভারতে বাড়ছে, পশ্চিমবঙ্গে তার কোনো প্রভাব নেই। নতুন শিল্প চাই। কিন্তু তাতে চাকরি যে বিশেষ বাড়বে না তা সরকারি তথ্যই স্বীকার করছে।

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার সম্ভব কিন্তু বর্তমান নীতিতে ৮০০-র বেশি ক্ষুদ্র শিল্প

De-Reservation হয়েছে। অর্থাৎ যে প্রতিযোগিতা আসছে তাতে আমাদের রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পে কি অবস্থা হবে বোঝা মুশকিল। আমাদের ধারণা বিশেষত ব্যাঙ্ক যে রিপোর্ট দিচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে প্রায় ৫০ থেকে ৩০ শতাংশ ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্ন। রুগ্নতার অসংখ্য কারণ। তবে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প পঃ বঙ্গে পাঁচ বছরের বেশি টিকছে না।

এই অবস্থায় চাকরি বাড়াবার মুখ্য স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে 'স্বনির্ভর প্রকল্প'। তার মানে রাস্তাঘাটে অসংখ্য দোকান। আর পূর্ববর্তী কিছু প্রকল্পকারী ঋণ শোধ দেয়নি বলে বর্তমান প্রজন্ম আবার ব্যাঙ্ক ঋণ পাচ্ছে না। তার ফলে আমরা যা আশা করেছিলাম আর সত্যি যা হয়েছে তার মধ্যে বিস্তর ফারাক।

তার মানে আগামী পাঁচ বছরে নতুন পাঁচ লক্ষ লোকের চাকরি হবে এমন আশা করা একটু বেশি করে স্বপ্ন দেখা। অথচ চাকরি না বাড়লে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় যে ভাঙন ধরবে তাও হবে ভয়াবহ।

একটি তত্ত্ব মানা হয় যে অর্থনীতিই আসল ভিত্তি আর বাকি সব সুপার স্ট্রাকচার। তাই কালচার, শিক্ষার গুণগত মান ইত্যাদি সবার ভিত্তিই হচ্ছে অর্থনীতি তবে ভিত্তিটা এখন নড়বড়ে। তার মানে আমাদের সংস্কৃতির ধারা ঠিক কোন্‌দিকে বইবে? আমরা রাজ্যবাসী হিসেবে অন্যান্য উন্নতশীল রাজ্য থেকে হয়তো পিছিয়ে পড়ব। বেকারি যত বৃদ্ধি পাবে সেই আশঙ্কাই প্রবল হবে: অর্থনীতিই উন্নতির ভিত্তি। দেশের শিল্পে, সংস্কৃতিতে, গানে, বাজনায়, খেলায়, সিনেমায়, সাহিত্যের ভিত্তি যদি অর্থনীতি হয় তবে বেকারি যত বাড়বে তাও সুপার স্ট্রাকচার হবে অল্প। বস্তুত এখনই সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

আমদানি কোটা উঠে যাওয়া মানে শিল্প ও কৃষিতে অনিশ্চয়তা

এপ্রিল মাসের প্রথম দিনটা বলা হয় ফুলস্ ডে, আর এদিনই আমাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের আমূল পরিবর্তন করা হল। 'কোটা' বা পরিমাণ বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা উঠে গেল। এই কোটা উঠে যাবার পেছনে আমাদের শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কেউ বা আতঙ্কিত আর কেউ বা আমাদের 'জাতীয় বোকামি' দেখে শঙ্কিত। আমাদের শিল্প যার কোনোদিনই বৃদ্ধিলাভ করবে কিনা তাই নিয়ে সবাই চিন্তিত।

১লা এপ্রিল কেন তুলে দেওয়া হল তার কারণটাও বলা যাক। এদিনটা ছিল পৃথিবীব্যাপী সব কোটা তুলে ফেলার শেষ দিন। পৃথিবীর সব দেশই W.T.O-র অনুযায়ী কোটা তুলতে বাধ্য। ভারতবর্ষ সহজে কোটা তুলবার পক্ষপাতী ছিল না। বহুদিন ধরে ভারতবর্ষ কোটা সম্পূর্ণ তুলে দেবার বিরুদ্ধে W.T.O-র কাছে আপত্তি জানিয়ে আসছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু 'ভারতবন্ধু উন্নত দেশ' ভারতের বিরুদ্ধে কোর্ট কেস্ করে। শুনানি অবশ্য হয় W.T.O-তে। এই কেসে আমরা হেরে যাই। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো সুযোগই ছিল না—কারণ শেষ দিন ১লা এপ্রিল চলে এসেছিল। অতএব তড়িঘড়ি করে ১লা এপ্রিল সব কোটা তুলে দেওয়া হল। প্রশ্ন উঠেছে আমরা কি কখনও এই বিষয়ে প্রস্তুত ছিলাম? দেশকে সবিস্তারে এই বিষয়ে কি অবহিত করা হয়েছিল? আর এখানে বলা দরকার যদিও W.T.O-র নির্দেশ অনুযায়ী ১লা এপ্রিল কোটা তুলে দেবার শেষ দিন ছিল, অনেক W.T.O-র সদস্য নির্দেশ অমান্য করেছে। অর্থাৎ তারা কোটা তোলেনি। অনেক দেশের মধ্যে একটি দেশের উল্লেখ করা যাক। তার নাম পাকিস্তান। অনেকে বলবে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আইন-কানুন মানে না অতএব তারা 'রোগ' রাজ্য। আর ভারতবর্ষ দায়িত্বশীল দেশ। অতএব সব কোটা তুলতে বাধ্য হল। অর্থাৎ

বেশিরভাগ হবার বিপদও আছে।

কোটা কাকে বলে এবং আমাদের আমদানি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হত তা সংক্ষেপে বলা যাক। যদি বিদেশ থেকে আমদানি অল্প পয়সায় আসে তাহলে আমাদের দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতায় কোনোদিনই পেরে উঠবে না। নতুন শিল্প প্রতিযোগিতামূলক হতে গেলে দরকার জাতীয় রক্ষাকবচ বা ইংরেজিতে বলে প্রটেকশন। আমাদের দেশে শিল্প কলোনিয়াল সময়ে গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশরা আমাদের বাজার দখল করেছিল। অতএব দেশীয় শিল্প বাড়াতে গেলে দিতে হবে প্রটেকশন। এখানে বলা দরকার, প্রটেকশনের উল্টোটা হচ্ছে ফ্রি ট্রেড বা মুক্ত বাণিজ্য। W.T.O বর্তমানে সব ধরনের প্রটেকশন তুলে দেবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ আমাদের শিল্পকে বর্তমান বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকতে গেলে খরচ কমাতে হবে আর গুণগত মান বাড়াতে হবে।

ভারতবর্ষে শিশু শিল্পকে প্রটেকশন অন্তত তিনটি পদ্ধতিতে দেওয়া হত। (১) সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয়েছিল কোটা। তার মানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি সেই দ্রব্য আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হত না। ধরা যাক, আমরা মোটরগাড়ি শিল্পকে প্রটেকশন দিতে চাই। আমরা বলে দিলাম দেশে বিদেশী মোটরগাড়ি (ধরা যাক) ১০০টার বেশি আমদানি করা যাবে না। যদি ধরা যায়, দেশে মোটর গাড়ির চাহিদা ১০০০ তবে অন্তত ৯০০টি দেশে প্রস্তুত করা যাবে। আর দেশীয় শিল্পকে আপাতত বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি দেওয়া হল। কোটা হচ্ছে প্রটেকশন। এর অপর নাম লাইসেন্স। আমাদের দেশে শিল্প ও কৃষিকে প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কোটা পদ্ধতি মুখ্য ছিল। (২) যেভাবে আমরা প্রটেকশন দিতাম তার নাম শুল্ক বা ইমপোর্ট ডিউটি বা ট্যাক্স। উদাহরণ দেওয়া যাক—আমরা মোটর শিল্পকে প্রটেকশন দিতে চাই। তবে নতুন উৎপাদিত মোটর কারের দাম ধরা যাক ২ লক্ষ টাকা। আর বিদেশে গাড়ির দাম ১ লক্ষ টাকা। আমরা শুল্ক বসিয়ে বিদেশী গাড়ির দাম করে দিলাম ৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ ২০০ শতাংশ শুল্ক অথবা ট্যাক্স বসালাম। বিদেশী গাড়ির দাম যেহেতু খুব বেশি তাই আমরা দেশী মোটর গাড়ি কিনতে আরম্ভ করলাম। এটাও প্রটেকশন। তবে কেউ যদি বেশি দামে বিদেশী গাড়ি কিনতে চায়, তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই কোটাই সবচেয়ে বেশি ভারতে প্রচলিত ছিল। (৩) তৃতীয় পদ্ধতিতে আমরা প্রটেকশন দিতাম, তার নাম এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল। ধরা যাক, আমরা বিদেশী মোটর গাড়ি বেশি দাম হলেও কিনতে চাই। কিনতে গেলে আমাদের দেশের রুপি ডলারে পরিবর্তিত করতে হবে। পরিবর্তন করতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি দরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই অনুমতি দিল না। অর্থাৎ বিদেশী গাড়ি কেনা আর হল না। এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল মুখ্যত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক্তিয়ারভুক্ত।

পরিবর্তিত অবস্থায় অর্থাৎ W.T.O থাকার ফলে এখন এইভাবে আর

প্রটেকশন দেওয়া হবে না বা সম্ভব নয়। প্রথমত, আমাদের বিদেশী দ্রব্যের ওপর শুল্ক আমরা ক্রমশ কমাতে আরম্ভ করেছি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সব শুল্ক ১০ শতাংশ করতেই হবে। এটা W.T.O-র নুলিয়া। বলা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক গড় শুল্ক ১০ শতাংশ। অতএব আমাদেরও আমদানি শুল্ক এর বেশি বাড়ানো চলবে না। এবারকার বাজেটে (২০০১ সালে) স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ক্রমশ আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রটেকশন থেকে মুক্ত বাণিজ্যের পথে আমাদের এগোতে হবে। এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল আর বিশেষ থাকবে না। এটাও W.T.O-র নির্দেশ।

বাকি ছিল কোটা। আর আমরা ভেবেছিলাম দেশের শিল্পকে রক্ষা করতে গেলে কোটা চালু থাকবে। তা অবশ্য হল না। W.T.O-র কেসে আমরা হেরে গিয়েছি। অতএব কোটাও তুলে দিতে হল। তার অর্থ প্রটেকশনের বদলে মুক্ত প্রতিযোগিতায় আমাদের বিশ্ববাজারে নামতে হবে।

আমরা অবশ্য কিছু 'অ-দরকারি কোটা' আগেই তুলে দিয়েছিলাম। ১৯৯৭-৯৮ সালে ৪০৬টি দ্রব্যের ওপর তা তুলে দেওয়া হয়েছিল। গতবছর ২০০০ সালে ১৪২৯টি দ্রব্যে আমরা কোটা তুলে দিয়েছিলাম। বাকি ছিল ৭১৪টি দ্রব্য। যার ওপর কোটা আমরা রেখেছিলাম। ৭১৪টির কোটা ছিল কারণ আমরা আমাদের কৃষিকে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। সবারই জানা ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ আর অন্তত ৭০ শতাংশ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

২০০১ সালের ১ এপ্রিল সব কোটা অর্থাৎ ৭১৪টির ওপর নিষেধাজ্ঞা যা ছিল তা উঠে গেল। ৭১৪টির মধ্যে ১৪৭টি কৃষি দ্রব্য, ২২৬টি শিল্প দ্রব্য বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য আর ৩৪৩টি বস্ত্র শিল্প। অর্থাৎ কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও বস্ত্র শিল্পকে আর প্রটেকশন দেওয়া চলবে না।

এর মানে যদি থাইল্যান্ড থেকে সস্তা দরে চাল আসে তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদি কিউবা থেকে সস্তা দরে চিনি আসে তা আমাদের আমদানি করতে হবে। চীন থেকে সস্তা দরে বস্ত্র শিল্প আসে তা কিনতে হবে। অর্থাৎ সোজা কথায় কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প এখন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। তাদের প্রটেকশন দেওয়া আর চলবে না।

বলা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী যদি কোটা সত্যি উঠে যায় তবে ভারতের কিছু ক্ষেত্রে লাভ হবে। যেমন ওষুধ শিল্প, ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং বস্ত্র শিল্প। যদিও এই সমস্ত শিল্পে আমাদের প্রভূত পরিমাণে আধুনিকীকরণ করা দরকার। আমরা যদি আধুনিকীকরণ না করি তবে আমাদের এই শিল্পগুলির নাভিশ্বাস কিছুদিন বাদে আরম্ভ হবে।

আবার ক্ষুদ্র শিল্প কি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে? একটা ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর অন্তত ৪৬টি আইন আছে। এই আইন থাকার ফলে মালিকদের থেকে

লাভবান হচ্ছে ব্যুরোনেস্টরা বা ইন্সপেক্টররা। যদি বিদ্যুৎ সস্তা দামে না দিতে পারি, যদি ট্যাক্স বোঝা না কমাতে পারি তবে একটার পর একটা ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। যে নতুন চিন্তা-ভাবনা দরকার, তা এখনও আরম্ভই হয়নি।

সবচেয়ে অসুবিধা হবার কথা কৃষিতে। কারণ কৃষিতে যা ভর্তুকি আমরা দিচ্ছিলাম তা সবই তুলে নিতে হবে। আমাদের দেশে সেচ পদ্ধতি এবং বাজার পদ্ধতি যা তাতে কৃষকরা উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। উপরন্তু কৃষি আর শিল্পের মধ্যে যে যোগাযোগ থাকার কথা ছিল তা ভারতবর্ষে অন্তত নেই। বরং দেখা গেছে, কৃষিতে বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণ ঠিকমতো হচ্ছে না। সবচেয়ে দুঃখের কথা, বাজার ব্যবস্থা ও মিডিলম্যানদের উপদ্রব কৃষিতে কমাতে পারছি না।

আমরা কোটা তুলে দিলাম। প্রথমে যে আঘাত আসবে তা হবে কৃষিতে আর ক্ষুদ্র শিল্পে। সেচ পদ্ধতি যদি আমরা যুগপৎ বাড়াতে না পারি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমাদের কৃষকরা সুবিধা করতে পারবে না। হয়তো সব ব্যাপারটা ঠিকঠাক হতে সময় নেবে। সময় কতদিন লাগবে তা কেউ জানে না।

তবে অল্প সময়ের মধ্যে যেটা হবে সেটা কৃষকদের দুর্দশা আর ছোট শিল্পের নাভিশ্বাস। কোটা তুলে দিলে এটাই হবে প্রথম ধাক্কা। এই ধাক্কা সামলাতে গেলে যে সমাধান থাকার কথা তা বর্তমানে নেই। সুতরাং কিছুদিনের জন্য কৃষকদের হাহাকার শুনতে হবে। এটাই কোটা উঠে যাবার প্রথম ফল।

দেশে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব বেকারি যুগ পরিবর্তনের সন্ধিকালের সমস্যা

এই শতাব্দীতে আমাদের চোখের সামনে যেটা ঘটে যাচ্ছে তার নাম 'দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব'। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে তা বলা মুশকিল তবে সাধারণভাবে ধরা হয় এর আরম্ভ ১৯৮০-র কিছু আগে ও পরে। এই নতুন শিল্প বিপ্লব প্রধানত খবরাখবরের আদান-প্রদানের বিপ্লব বা যাকে বলা হচ্ছে ইনফরমেশন রিভ্যুলেশন আর এর প্রধান অংশই হচ্ছে কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, ই-কমার্স, ই-মেল রোবট ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলা যায় এই বিপ্লব এক ধরনের 'জ্ঞানের বিপ্লব' আর ক্ষণিকের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো জায়গার সঙ্গে আমরা বার্তা আদান-প্রদান করতে পারি, উইম্বলডনের টেনিস খেলা বা ইউরো ফুটবল ঘরে বসে দেখতে পারি। আর কম্পিউটার থাকার ফলে সমগ্র শিল্প ব্যবস্থা, হিসেব রক্ষণ ব্যবস্থা, রেল-প্লেন চলাচল ব্যবস্থা এমন কি যুদ্ধের রণনীতি সবই পরিবর্তন হতে যাচ্ছে—আরো হবে। এই যুগে দূর নিকট হয়ে যাচ্ছে, আর পর ভাই হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্রই এই বিপ্লবের প্রভাব পড়ছে—স্বাস্থ্য পরিবেশ, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রভৃতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাব রাজনীতিতে পড়বে তা বলাই বাহুল্য এবং কিছু দার্শনিক মনে করছেন সক্রেটিসের আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাজনীতিবিদদের প্রধান 'প্রয়োজন' ছিল অবস্থা বিচার করে কোনো মীমাংসার নীতিতে আসা। 'অবস্থা'টা কি তার 'বিচার' কি আর 'নিষ্পত্তি' কি তার দায়িত্ব রাজনীতিবিদরা করে এসেছেন। রাজনীতিবিদরা এই 'মীমাংসা' প্রয়াসে মুখ্য ভূমিকা নেওয়ায় প্রচুর ক্ষমতার অধীশ্বর। পুরনো রাজা আর নেই এখন দেশে 'নতুন ধরনের রাজা।'। এই 'নতুন রাজারা' সব সময় যে 'ন্যায় ও সত্য' পালন করে এমন ইঙ্গিত কোনো দেশের ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীতে,

অনেক দেশেই রাজনীতিবিদরা ঠিক সততার প্রতিমূর্তি তা কখনোই বলা যায় না। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ঘুষ খেয়ে 'নীতি' নির্ধারণ করেছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা একেকজন 'চরিত্রে'র কলঙ্কময় অধ্যায়। আর আমাদের দেশে এমন অনেক প্রধানমন্ত্রী আছেন যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অসংখ্য। এমন সব মুখ্যমন্ত্রী আছেন যাঁরা দ্রুত সম্পত্তি করা যায় তার চেষ্টায় দেশের ও দশের নীতি নির্ধারণ করে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে 'রোগা-পাতলা' মন্ত্রী আছেন কিনা সমীক্ষার বিষয়। অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থায় 'নীতি' কি ঠিকভাবে নেওয়া হচ্ছে? পালন করা বিষয়ে কি আরেক ধরনের দুর্নীতি আমরা দেখছি।

ক্রানজেনবার্গ এই নতুন বিপ্লব সম্বন্ধে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। প্রথম : নীতি নেওয়াই যদি রাজনীতিবিদদের প্রয়োজন হয় তবে কম্পিউটার অনেক বেশি আদর্শ নীতি তৈরি করতে পারবে এবং তা হবে নিরপেক্ষ। যত 'জ্ঞানের বিপ্লব' বাড়বে তত রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা ও দৌরাত্ম্য কমবে। অর্থাৎ কম্পিউটার বিপ্লব যত ছড়াবে তত বেশি সাধারণ লোকেরা 'আসল উচিত নীতি' সম্বন্ধে সচেতন হবে। অর্থাৎ নতুন শিল্প বিপ্লবে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা ক্রমশ কমবে। প্রথম শিল্প বিপ্লবে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা ও অহংকার আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি আশা করছেন সর্বত্রই তা কমবে। অর্থাৎ এই নতুন টেকনোলজিক্যাল বিপ্লবে রাজনীতিবিদরা কিছুটা পিছু হটবে। যেমন প্রথম শিল্প বিপ্লবে (১৭৭০-১৯৮০)-তে জমিদার, রাজা, ভূস্বামী, ফিউডাল লর্ডসদের ক্ষমতা চূর্ণ হয়েছিল—এই নতুন বিপ্লবে অনেক মূর্খ, অত্যাচারী রাজনীতিবিদদের পতন হবে। মনে রাখতে হবে এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতবর্ষে আদৌ তা ঘটবে কিনা বলা শক্ত।

ক্রানজেনবার্গের দ্বিতীয় তত্ত্ব হচ্ছে যে টেকনোলজি আর কোনো দেশের মনোপলি থাকবে না। অর্থাৎ প্রথম শিল্প বিপ্লব শুধু প্রথমে ঘটেছিল ইউরোপের কয়েকটি দেশে। এবং তার কল্যাণে (বা Advantage of Early Coming-এর জন্য) প্রথম শিল্প বিপ্লব কিছু কিছু বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ। আর টেকনোলজিক্যাল গ্যাপ থাকার ফলে কলোনিয়াল প্রথা চালু করা সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের বিরাট টেকনোলজিক্যাল ব্যবধান তৈরি হওয়ার ফলে মুষ্টিমেয় ইংরেজরা ভারত দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ টেকনোলজিক্যাল ব্যবধান থাকলেই স্বাধীনতা বিপন্ন। এটা সম্ভব ছিল প্রথম শিল্প বিপ্লবে অর্থাৎ সেটা ঘটেছিল ১৭৭০ সাল থেকে বা তার কিছু আগে কিন্তু এই দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব খুব তাড়াতাড়ি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে যাবে। এক দেশের আবিষ্কার অন্য দেশে চলে যাবে। কেউ কোনো আবিষ্কার 'গোপন' রাখতে পারবে না। ব্রিটিশদের কলোনি থাকা সত্ত্বেও ১৮০ বছর লেগেছিল মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হতে। আর বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে ২০ বছর বা তার নিচে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে।

টেকনোলজিক্যাল ব্যবধান কমে আসছে আর এটাই 'জ্ঞান বিপ্লবের' ধারা।

ক্রানজেনবার্গের তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে এই নতুন শিল্প বিপ্লবে আমাদের আর্থ-সামাজিক-শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। খুব দ্রুতলয়ে পৃথিবী চলবে। সরকারি ব্যুরোক্রেসি অথবা সরকারি মালিকানায় শিল্পগুলি যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত না নিতে পারে তবে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় তারা পরাজিত হবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে। যদি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী না হয় বেসরকারি ব্যবস্থা চালু হতে বাধ্য। ই-মেল এবং ই-কমার্স মানে নিত্য নতুন প্রতিযোগিতা। আর যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ঢিমেতালে চলে তাদের বিরুদ্ধে জনরোষ ক্রমশ প্রবল হবে। ফলে শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই বা না চাই নতুন ব্যবস্থা চালু হবে। এর প্রতিফলন সর্বক্ষেত্রে পড়বে—বিশেষত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর। নতুন শিল্প বিপ্লবে প্রচুর মহিলারা শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হবে। ফলে সামাজিক বিপ্লব যে ধরনের আসবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এছাড়া ইনফরমেশন রিভ্যুলেশন পৃথিবীর সমগ্র ও বিভিন্ন কালচারের মধ্যে অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটাবে। আমাদের সিনেমার গানে যে ইউরোপীয় পপ সঙ্গীতের প্রতিবিম্ব পড়বে তা যেমন সত্য, তেমন ইউরোপীয় দেশেও আমাদের ক্লাসিকাল সঙ্গীত ইত্যাদি তাদের 'নতুন নতুন' পথ দেখাবে। জামা কাপড়, খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণের এতটা মিশ্রণ ঘটবে যে হয়তো আমরা আমাদের 'স্বাতন্ত্র্য' বজায় রাখতে পারব না। যারা মিশ্র কালচারকে গ্রহণ করবে তারা তা নিতে বাধ্য হবে—কারণ অন্য সবাই তা নিয়েছে। কিন্তু কিছু লোক এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে পারবে না। তারা মনে করবে যে তাদের 'আইডেনটিটি' এই নতুন সভ্যতার ও বিপ্লবে বিপন্ন। এবং এই দলের একাংশ যাকে বলা হচ্ছে 'ফানডামেন্টালিস্ট' তাই হবে। সর্বত্রই এই ধরনের সংঘাত উপস্থিত হবে। চিরকালই বিজ্ঞান ও ধর্মের সঙ্গে এক ধরনের বিসংবাদ ছিল— এই শতাব্দীতে তারই পুনরাবৃত্তি হবে আরও হিংস্রভাবে। বিশ্বায়নের যুগে মানুষ যদি ভাবে তাদের মূল হারিয়ে যাচ্ছে তখন তারা আশ্রয় পাবার আশায় পেছনের দিকে তাকাবে। আর নতুন ও পুরাতনের সংঘাত সর্বত্রই দেখা যাবে। অর্থাৎ নতুন শিল্প-বিপ্লবে একদিকে যেমন আধুনিকীকরণ হবে অন্যদিকে বাড়বে প্রাচীনের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। এই সংঘাত যেমন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দেখা যাবে তেমন দেখা যাবে পরিবারের মধ্যে ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে। আপাতত ফল অজানা।

প্রথম শিল্প বিপ্লব যেটা ১৭৭০ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ব্যাঙ্কের আরম্ভ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সূচনা, নতুন ধরনের চাকরি, অসংখ্য নতুন বই প্রিন্টিং প্রেসের কল্যাণে, দৈনিক-মাসিক পত্রিকা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সব কিছুই নতুন যুগের সূচনা। এই শিল্প

বিপ্লবে ফিউডাল প্রথার শেষ। কিন্তু এই শিল্প বিপ্লবে প্রথম ধাক্কায় প্রভূত বেকারি সৃষ্টি হয়েছিল। আসল কারণ ছিল ফ্যাক্টরির সঙ্গে গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রশিল্পগুলি ধ্বংস হবার ফলে চতুর্দিকে বেকারি। স্বয়ং কার্লমার্ক্স তাঁর লেখায় একটি আন্দোলনকে খুব প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের নাম লুড্ডিট আন্দোলন, যা ১৮১১ সাল থেকে ১৮১৬ পর্যন্ত চলেছিল। এই আন্দোলনে মেশিন ভাঙাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। মেশিন লোকের চাকরি নিয়ে নিচ্ছে। অসংখ্য লোক বেকার। তারা বা লুড্ডিটরা মেশিন সভ্যতার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে কি প্রথম ধাক্কায় চতুর্দিকে বেকারি সৃষ্টি হচ্ছে? পুরনো ধরনের মেশিনের বদলে নতুন মেশিন আসার ফলে লোকেরা কি তাদের চাকরি হারাচ্ছে? পুরনো শিল্পগুলি উঠে যাচ্ছে? পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা কি আজকের নতুন সভ্যতায় অচল?

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I. L. O.) তাদের নতুন রিপোর্ট World Employment Report-এ জানাচ্ছে যে কয়েকটি দেশ বাদ দিলে পরে সর্বত্রই বেকারি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা হচ্ছে পৃথিবীতে এমন শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩ বিলিয়ন আর তার মধ্যে ১৪০ মিলিয়ন পূর্ণ বেকার আরও ১০০ মিলিয়ন পার্ট টাইম কাজ করে অথবা প্রচ্ছন্ন বেকার। এখন যুবক শ্রমিক সংখ্যা যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৪-এর মধ্যে তারা কাজ যোগাড় করতে পারছে না। নতুন শিল্প বিপ্লব মানে এক ধরনের পরিবর্তন যা লোকের চাকরি নিয়ে নিচ্ছে। এটা যেমন জার্মানিতে সত্য, জাপানে সত্য, চীন দেশে সত্য আবার ভারতেও সত্য। চীনকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। চীন দেশে বেকারি ১৯৮৭ র তুলনায় ১৯৯৭ সালে কয়েকগুণ বেড়েছে। চীনের অফিসিয়াল বেকার এখন কয়েক মিলিয়ন—অথচ চীন দেশে বিনিয়োগ বাড়ছে। ভারতবর্ষেও তাই একদিকে বিনিয়োগ বাড়ছে আর অন্যদিকে বেকারি বাড়ছে।

(I. L. O.) বলতে চাইছে যে এই বেকারি হয়তো সাময়িক বা Transitional বা যুগ পরিবর্তনের সন্ধিকালের সমস্যা। এই বেকারি চিরস্থায়ী হতে পারে না—কারণ শিল্প বিপ্লব সব সময় নতুন নতুন চাকরি ও সুযোগ সৃষ্টি করেছে—আগে যা ছিল না। তবে এর জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকার। ট্রেনিং ব্যবস্থা হওয়া দরকার উন্নত। যদিও ধরে নিই বর্তমান বেকার সমস্যা সাময়িক তবুও ভয় হয় কোনো সরকারই তাদের স্বার্থের জন্য তাড়াতাড়ি কিছু করবে না। স্বার্থটা হচ্ছে নতুন শিল্প বিপ্লবে সবাই ভাবছে সরকারি মন্ত্রী ও আমলারা ডানা কাটা হয়ে যেতে পারে।

ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষতির পরিমাণ—অতঃকিম?

গুরুদাস দাশগুপ্ত মহাশয় যিনি 'স্ক্যাম' সম্বন্ধে একটি বই লিখেছেন, তাতে দেশের ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে চলছে তার একটা হিসেব পাওয়া যায়। গুরুদাস দাশগুপ্ত মহাশয় পার্লামেন্টের সদস্য আর তাছাড়া জে পি সি সদস্য ছিলেন। তাঁর কাছে যা খবরাখবর আছে সাধারণ লোকের কাছে তা নেই। তাঁর বইয়ে "The Security Scandal" ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন তা সাধারণ লোকের কাছে জানা ছিল না।

এটা মোটামুটি সবাই জানে যে, জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কের প্রসার অতি দ্রুত বেড়ে গেছে। এখন জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির প্রায় ৭০,০০০ শাখা আর জমার (Deposit) পরিমাণ প্রায় ২,৮০,০০০ কোটি টাকা। এই টাকায় দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের যে অতি দ্রুত প্রসার ঘটবে তা বলাই বাহুল্য। ক্রেডিট বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের পরিমাণ গত বিশ বছরে বেড়েছে প্রায় ৩০ গুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ২.৩ গুণ। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগের মুনাফার পরিমাণ মাত্র ০.৬ শতাংশ। ব্যাঙ্ক যা ঋণ দিয়েছে তার অন্তত ২৫ শতাংশ সম্পূর্ণ 'বাজে'—জীবনে আর তা ফেরত পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ ২০,০০০ কোটি টাকার ঋণ আর ফেরত পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এছাড়া দেশী ব্যাঙ্কগুলো বিদেশে বিনিয়োগ করতে গিয়ে প্রায় ৬,৫০০ কোটি টাকা ক্ষতি দিতে হয়েছে। যে শিল্পে বিনিয়োগ করেছে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে তার পরিমাণ প্রায় ৩,৬০০ কোটি টাকা। সব যোগ করলে যে চিত্র পাওয়া যাবে তা এক ভয়াবহ। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের ঋণের এবং বিনিয়োগের মোটা এক অংশ আর কোনোদিনই ফেরত পাওয়া যাবে না।

আবার ব্যাঙ্ক চালাবার ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম, বেহিসেবি, খামখেয়ালিপনা লক্ষ্য করা যায়। অনেক ব্যাঙ্ক বাজার থেকে ঋণ তুলছে ৫০-৬০ শতাংশ সুদ দিয়ে। আবার এটাই ঋণ দেওয়া হচ্ছে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১৪-১৬ শতাংশ সুদে। ১৯৮৯ সালে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাজার থেকে ঋণ তুলেছিল ৩০০ কোটি

টাকা—আর এই বাবদ ক্ষতি হয়েছিল ৩০ কোটি টাকা। এই ধরনের অসংখ্য 'মাথামুণ্ডুহীন' ঋণ তোলা আর ঋণ দেওয়ার মধ্যে যে ফারাক তাতে অনেক ব্যাঙ্কের প্রায় নাভিশ্বাস।

নানান ধরনের দুর্নীতি ব্যাঙ্কগুলিকে প্রায় গ্রাস করে বসে আছে। স্ক্যাম-এর পরে ২০টি জাতীয় ব্যাঙ্কের অন্তত ১০ জন মুখ্য সঞ্চালনকে দুর্নীতির দায়ে পদত্যাগ বা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু ব্যাঙ্ককে (১২টি) এখন 'লক্ষ্য' করা হচ্ছে, তাদের কাজকর্ম বিচার হচ্ছে।

ব্যাঙ্কগুলো যে খুব ভালো চলছে না তা তাদের ক্ষতির বহর দেখলে বোঝা যায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ইন্ডিয়ান ওভারসিস ব্যাঙ্কের। ১৯৯৩ সালের মার্চ পর্যন্ত যা লোকসান তা হল ৭৫৩ কোটি টাকা। কোন্ ব্যাঙ্ক কত ক্ষতিতে চলছে তার একটা সারণী দেওয়া হল :

ক্ষতির পরিমাণ ৩১ মার্চ ১৯৯৩		
ব্যাঙ্কের নাম	ক্ষতি	কোটি টাকায়
১। ইন্ডিয়ান ওভারসিস্ ব্যাঙ্ক	৭৫৩	কোটি টাকা
২। সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক	৬৭১	কোটি টাকা
৩। ইউকো ব্যাঙ্ক	৪৪৪	কোটি টাকা
৪। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩৮৩	কোটি টাকা
৫। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	৩৬১	কোটি টাকা
৬। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক	২৭৯	কোটি টাকা
৭। ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র	১৯৬	কোটি টাকা
৮। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	১০৬	কোটি টাকা
৯। অন্ধ্র ব্যাঙ্ক	১৪১	কোটি টাকা
১০। বিজয়া ব্যাঙ্ক	৯৮	কোটি টাকা

কিছু ব্যাঙ্ক অবশ্য লাভে চলছে যেমন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লাভের পরিমাণ ২১২ কোটি টাকা। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক অব বরোদা ৮ কোটি টাকা লাভ, কানাড়া ব্যাঙ্ক ২৬ কোটি টাকা। আর বাকি ব্যাঙ্কগুলোর মুনাফা ৫-১০ কোটি টাকার মধ্যে। অর্থাৎ No Profit No Loss নীতিতে আপাতত চলছে।

কিছু ব্যাঙ্ক বাদ দিলে পরে অধিকাংশ ব্যাঙ্কই ক্ষতিতে চলছে। কেন ক্ষতি হচ্ছে তার নানান ব্যাখ্যা আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি--১) ব্যাঙ্কে সর্বক্ষেত্রেই পলিটিক্স-এর দৌরাত্ম্য। রাজনীতি অনুযায়ী ব্যাঙ্ক চলছে, অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী চলছে না।

২) ব্যাঙ্কের অনেক নীতিই ঠিক অর্থনীতির মূলসূত্র অনুযায়ী হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এমন সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যার সঙ্গে ব্যাঙ্কের সামগ্রিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই।

৩) ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরীক্ষা করার পদ্ধতি অনেক ঢিলেঢালা। পরিদর্শন ভালোভাবে হয় না।

৪) ঋণ মেলা, ঋণ মকুব ইত্যাদি করে ব্যাঙ্কগুলো অনেকটাই ঘাটতিতে চলছে। ঋণ নিয়ে এই মেলা ভারতের ইতিহাসে আর কোনোদিনই হয়নি।

৫) যার দরকার অনেক সময় সে ব্যাঙ্ক ঋণ পায় না। ব্যাঙ্ক জানে যে অনেকেই ঋণ ফেরত দেবে না। তথাপি তাদেরই ঋণ দেওয়া হয়।

৬) ব্যাঙ্ক যে ভাবে টাকা বিনিয়োগ করেছে তা অনেক সময়েই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যেখানে দরকার সেখানে বিনিয়োগ হয় না, যেখানে দরকার নেই সেখানে বিনিয়োগ হচ্ছে। আর বিনিয়োগ হচ্ছে Non-Productive সেক্টরে।

৭) ব্যাঙ্কের উপরতলায়—বিশেষত খুব উপরতলায় যাদের প্রমোশন দিয়ে ওঠানো হয়েছে—তাদের 'সাধুতা' সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ।

গুরুদাস দাশগুপ্ত মনে করেন শেষ কারণেই সবচেয়ে আলোচনা করা দরকার। যাদের উপরতলায় নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্তত ১৫ জন 'Top People' বর্তমানের স্ক্যামের সঙ্গে জড়িত।

গুরুদাস দাশগুপ্ত মহাশয় এমন সব লোকের ইতিহাস তাঁর বইয়ে দিয়েছেন তাতে সন্দেহ হয় যে আমরা কি সভ্য সমাজে বাস করি?

তিনি যেসব উদাহরণ দিয়েছেন তাতে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের তদানীন্তন চেয়ারম্যান, নিউ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং কমিটির ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কিছু বড় অফিসারের নানান কাজকর্ম তুলে ধরেছেন। বোঝা যায় এইসব বড় বড় অফিসারদের খুঁটির জোর অসাধারণ। এঁরা দেশের অর্থকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

জে পি সি'র রিপোর্টে বলা আছে যে, এইসব বড় বড় অফিসার শেয়ার মার্কেটের বড় বড় রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে 'Collusion' করে ব্যাঙ্ক থেকে ৪০০০ কোটি বা তার বেশি টাকা তছনছ করেছে। এই অফিসারেরা অবশ্যই নানান সাহায্য তার বা তাদের নিচতলার লোক থেকেও পেয়েছিল—তা না হলে এই এত বড় লুট আর হত না।

এই তথ্য থেকে দু'রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। (এক) উপরতলার অফিসার নির্বাচন বেঠিক হওয়ার ফলে আজকে ব্যাঙ্কের এই লোকসান। যারা যোগ্য ছিল না, অথচ রাজনীতিতে খুঁটির জোর আছে তারাই আজ ব্যাঙ্ককে রসাতলে ডুবিয়েছে। (দুই) ব্যাঙ্কের সমস্যা শুধু উপরতলার লোকদের সমস্যা নয়—নিচতলা, মধ্যমতলা, উঁচুতলার যে আমূল পরিবর্তন করা দরকার তা না করলে স্ক্যাম কখনও বড় আকার নেবে কখনও বা নেবে ছোট আকার। স্ক্যাম থাকবেই। সরকারি ব্যাঙ্কের দেখাশোনা পদ্ধতি এতই গোলমেলে যে স্ক্যাম না হয়ে উপায় ছিল না।

এই দ্বিতীয় গ্রুপের প্রবক্তারা চান যে ব্যাঙ্ককে ক্রমশ 'বেসরকারি' করে দেওয়া উচিত। আই এম এফ-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে 'ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সবচেয়ে বেশি বড় অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা'। এত বড় 'ভুল' ভারতীয়রা আর কোনোদিনই করেনি। ব্যাঙ্কিং-এর নামে যা চলেছে তার অপর নাম 'জাতির উপর বজ্জাতি'। ইত্যাদি।

বেসরকারি ব্যবস্থায় যে ব্যাঙ্ককে আনা উচিত তা সরকারি 'ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান' কমিটিও বলেছে। তারা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিশেষত ম্যানেজমেন্ট-এর উন্নতির জন্যই বেসরকারিকরণ চায়। বস্তুত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ আজ আর আলোচনার বস্তু নয় তা খুবই বাস্তব—যতই অপছন্দ করি না কেন। বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে আজ বেসরকারি করার চেষ্টায় চলেছে আইনের নানান পরিবর্তন।

তবে সম্পূর্ণ বেসরকারি হলে যে দুঃখেরও কারণ হবে তাও বোঝা দরকার। পৃথিবীর ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে ভারতের জাতীয় ব্যাঙ্কের অন্তত দু'টি দান—(এক) যাকে বলা হয় Priority Sector-কে ঋণ দেওয়া। আর (দুই) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। শোনা যায় অনেক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মুনাফায় চলে না। শোনা যায় Priority Sector-এ ঋণ প্রায়শ শোধ হয় না।

তবু গরিব চাষী, সাধারণ বেকার ছেলের সমস্যার দিকে কোথাও একটা নজর দেওয়া যেত। ব্যাঙ্ককে বেসরকারি করা হলে সবারই ধারণা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আর Priority Sector এই দুটো নতুন অবদানই উঠে যাবে। গরিব চাষীদের বোধহয় আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকল না। আবার তাদের মহাজনদের খপ্পরেই পড়তে হবে।

এর জন্য দায়ী কে হবে? বেসরকারি করার নীতি? না ব্যাঙ্ক যে ভাবে চলছিল তাকে বেসরকারি নীতি চাপাবার লবিটা বড্ড ক্ষমতা পেয়ে গেল। ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবারই কোথাও যেন আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে।

ফেরা লঙঘন করে অর্থ যাচ্ছে বিদেশে অথচ ভারত ঋণজালে আবদ্ধ হচ্ছে

কিছুদিন আগে কিছু ভারত বিখ্যাত কোম্পানির বিরুদ্ধে ফেরা আইনে ক'জন ডিরেক্টর প্রমুখের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এরা ভারতের বিদেশী মুদ্রা আইন লঙঘন করেছে। যেভাবে আইন লঙঘন করা হয় তার পোশাকী অর্থনীতির নাম আন্ডার ইন ভয়েসিং। এর মানে যে দ্রব্য আমরা রপ্তানি করি তার আসল দাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ঠিকমতো দেখানো হয় না। অর্থাৎ দেশে আমরা কম দাম দেখিয়ে বিদেশী মুদ্রা বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা করি। বড় বড় দেশী ও বিদেশী কোম্পানিগুলি প্রায় সবাই অল্পবিস্তর এই দোষে দোষী। এর ফলে ভারতে 'আসল রপ্তানি' কত তার পুরো হিসেব আমরা কোনোদিনই পাই না। আর রপ্তানির দাম কম দেখিয়ে বহু বিদেশী মুদ্রা ভারতের বাইরে গচ্ছিত রাখা হচ্ছে। দেরিতে হলেও সরকার এই বিষয়ে তৎপর হয়েছে।

তৎপরতার কারণ নানাবিধ। তবে অন্যতম বিশ্বব্যাঙ্কের বা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট। এই রিপোর্ট সত্যি আশ্চর্য। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯৯১ সালের আর্থিক বিপর্যয় কখনোই ঘটত না—যদি আমরা আমাদের রপ্তানিকারকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম। ১৯৯১ সালে আমাদের বিদেশী মুদ্রা এতই কম হয়েছিল যার ফলে আমাদের দেশে সমস্ত নীতি পরিবর্তন করতে হয়েছিল। বস্তুত রপ্তানি এতটাই কমে গিয়েছিল যে যার ফলে ভারতে 'উদার নীতির' সূচনা হয়। এর কারণ হিসেবে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে যে, কিছু অসাধু দেশী রপ্তানিকারকদের কার্যকলাপ। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে প্রায় একশ' বিলিয়ন ডলার আমরা আন্ডার ইন ভয়েসিং করে বিদেশে গচ্ছিত রেখেছি। আর এই একশো বিলিয়ন ডলার আমরা বর্তমানে বিদেশ থেকে যে ঋণ নিচ্ছি তার থেকে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার বেশি। অর্থাৎ আমাদের বিদেশী ঋণের

কোনো প্রয়োজনই নেই।

এর আসল মানে আমাদের রপ্তানিকারকরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকারকে ঠকিয়ে একশো বিলিয়ন ডলার বিদেশে নিয়ে গিয়েছে। আর এর ফলে আমরা ক্রমশ ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের অর্থনীতির উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। সামাজিক বিনিয়োগ বন্ধ। দেশে এখন বিদেশীদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। আমরা বিদেশীদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছি।

একটা কথা বলা হচ্ছে যে হঠাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এই রিপোর্ট তৈরি করল কেন? এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে ভারত যে ঋণ নিচ্ছে তা আদৌ কোনোদিনই শোধ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। যদি বিপুল পরিমাণ ঋণ ভারতবর্ষ শোধ না করে তবে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক অরাজকতা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যাবে। অথচ ভারতের ঋণ নেবার দরকার নেই, যদি ভারতবর্ষ রপ্তানিকারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। রপ্তানিকারকদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ ব্যবস্থা আগেও নেয়নি এখনও নিচ্ছিল না কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের চাপে পড়ে এই বড় বড় কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতে চায় আমাদের দেশে মন্ত্রী ও সরকারি উঁচু পর্যায়ে যে ধরনের ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে তার ফলে ফেরা লঙঘনকারীদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে চাইছিলাম না। এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের চাপে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বলতে চায় আমাদের দেশে দুর্নীতির সূত্রপাত এই রপ্তানিকারকদের ঘিরে। বিদেশে যে ঘন ঘন মন্ত্রীরা যান তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের অনেকটা দায়িত্ব এইসব ফেরা লঙঘনকারীদের। অতএব মন্ত্রীরা এদের বিষয়ে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী ছিলেন না। এটা সবাই জানত। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

অর্থাৎ ভারতের আর্জি একশো বিলিয়ন ডলার কোনোদিনই ভারতে আসেনি। বিদেশে আছে। আর এর ফলে আমরা নানান ঋণে আবদ্ধ। আরও একটা হিসেব করা হয়েছে। ভারতবর্ষ-আমেরিকার বাণিজ্যে প্রতি বছরে ২.৫ বিলিয়ন থেকে ৪ বিলিয়ন ডলার আমরা বিদেশে সরিয়ে ফেলি। আর বড় বড় এইসব কোম্পানি শুধু যে ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বিদেশী মুদ্রা দেশের বাইরে চালান করছে তাও সবটা নয়, তারা শেয়ার হোল্ডারদের ফাঁকি দিচ্ছে আর করও ফাঁকি দিচ্ছে। দেশের নানান গোলমালের কারণ এইসব বড় বড় রপ্তানিকারকদের দেশ থেকে বিদেশে অর্থ চালান করার প্রবৃত্তি।

দেশ থেকে আসলে কি পরিমাণে রপ্তানি করি তার হিসেব কোনোদিনই ঠিক মতো পাওয়া যাবে না। ফলে বিদেশে রপ্তানি বাজারে আমাদের স্থান এতই নিচের দিকে সেটা সত্যিই লজ্জার। সিঙ্গাপুর একটি সিটি স্টেট। সবশুদ্ধ ২২৪ স্কোয়ার মাইল বা ৫৮১ স্কোয়ার কিলোমিটার। আমাদের ভারতবর্ষের যে কোনো জেলা থেকে আয়তনে কম। সিঙ্গাপুরের লোকসংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ।

অথচ সিঙ্গাপুর ভারত থেকে তিন গুণের বেশি রপ্তানি করে। হংকং সিঙ্গাপুর থেকে অবশ্য বড়। হংকং আয়তনে প্রায় ৪০৩ স্কোয়ার মাইল! হংকং-এর রপ্তানি ভারতের 'অফিসিয়াল' রপ্তানি থেকে আবার তিনগুণ বেশি। সিঙ্গাপুর ও হংকং ভারত থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি রপ্তানি করে আর সেইসঙ্গে আইনকানুন এতই কঠোর যে সহজে রপ্তানি আইন ভাঙা যায় না।

পৃথিবীতে যে ১৫টি দেশ রপ্তানি বাজারে শীর্ষে আছে তার মধ্যে ভারতের কোনো স্থানই নেই। সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক আমেরিকা। (১) তারপরে ক্রমান্বয়ে (২) জার্মানি (৩) জাপান (৪) ফ্রান্স (৫) ব্রিটেন (৬) ইতালি (৭) নেদারল্যান্ড (৮) কানাডা (৯) হংকং (১০) বেলজিয়াম (১১) চীন (১২) দক্ষিণ কোরিয়া (১৩) সিঙ্গাপুর (১৪) তাইওয়ান (১৫) স্পেন। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু দেশই বাণিজ্যে ও রপ্তানিতে প্রবল বেগে এগিয়ে যাচ্ছে—'ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।' বাণিজ্যে ভারতবর্ষ এখনও অনেকটাই পিছিয়ে। আর যেটুকু আয় হয় তাও আবার দেশে আসে না। বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে।

রপ্তানি সম্বন্ধে আমরা বড় বড় কথা বলি তবে দেখা যাচ্ছে যুক্তফ্রন্টের আমলে রপ্তানি ক্রমশ কমছে। অর্থাৎ যে সব আইন ও কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার তা করা হয়নি। করা হয়নি তার কারণ এই রপ্তানি ব্যবস্থায় বহু ছিদ্র। আর এইসব ছিদ্রের কৃপায় রপ্তানিকারকরা দেশের অর্থ বিদেশে গচ্ছিত রাখে। আর নেতাদের নির্বাচনে ও বিদেশ ভ্রমণে এদের সাহায্য অপরিহার্য।

রপ্তানি ব্যাপারে আমরা যে কতটা বিবেকহীন তা ডব্লু টি ও বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ব্যাপারেই বোঝা যায়। এই বিশ্ব সংস্থাটি নতুন। এরা বিচার করবে ডাঙ্কেল ড্রাফ্‌ট ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা। অর্থাৎ পেটেন্ট আইন অনুযায়ী চলছি কিনা। রপ্তানি ও আমদানি বিষয়ে বিশ্ব আইন মেনে চলছি কিনা। এই নতুন বিশ্ব সংস্থাটি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। উদারনীতির যুগে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়বে। অথচ এই কোর্টে আমাদের প্রতিনিধি আমরা পাঠাতে পারিনি।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে দুটো বিচারের স্তর আছে। একটা নিচু কোর্ট আরেকটি আপিল কোর্ট। আমাদের ভারতবর্ষ কোনো স্তরেই নেই। যেসব দেশের নাম আমরা জানি না অর্থাৎ বেলিজ সেও আছে। মরিসাস, শ্রীলঙ্কা, কলম্বিয়া নিয়ে তেত্রিশটি দেশের প্রতিনিধি আছে। ভারতের প্রতিনিধি নেই কেন? এটা কি আমেরিকার চক্রান্ত? এবার সেটা হয়নি। ভারত কোনো প্রতিনিধিই পাঠায়নি। অথচ এই কোর্টে সবাই ভারতের শ্রী বি কে জুৎসীকে চেয়েছিল—উন্নত ও অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে। কারণ উরুগুয়ে রাউন্ডে ডাঙ্কেল ড্রাফটের সময় ভারতের প্রতিনিধি হয়ে তিনি যেভাবে অনুন্নত দেশের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে সবাই খুব প্রশংসা করেছিল।

কিন্তু জুৎসীকে পাঠানো হয়নি। তাঁকে ছাড়া অন্য প্রতিনিধিও ভারত

সরকার খুঁজে পায়নি। ঘরোয়া রাজনৈতিক কারণেই যুক্তফ্রন্ট সরকার কোনো ভারতের প্রতিনিধিই পাঠায়নি। যেখানে দরকার সেইখানে অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের কোনো প্রতিনিধি নেই। অথচ ক্ষুদ্র বেলিজের আছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাপে আজকে ভারতের ফেরা আইনের কিছু কোম্পানির ডিরেক্টরের বিচার হচ্ছে। কাকে ধরা হবে তা নিয়েও নাকি বাছাবাছি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের কোনো প্রতিনিধিই নেই। এদিকে ভারতের রপ্তানি কমছে। আমেরিকা ও উন্নত দেশগুলি সমস্ত ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার লাগামহীন অধিকারের কথা বলছে। ডিসেম্বরে এই নিয়ে মিটিং হবার কথা। ভারত এখন নিরুপায়। হয়তো নতুন আরও একটি চুক্তিতে দস্তখত করে আসবে। কে ভাবে দেশের কথা।

ভারত-পাক যুদ্ধের খরচ অপরিসীম

কিছুদিন আগে ভারতবর্ষ রুশ থেকে একটি সেকেন্ডহ্যান্ড যুদ্ধ জাহাজ কিনেছে। তার মূল্য আমাদের রাজ্য ও দেশের উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দের থেকে অনেকটাই বেশি। আমরা ব্রিটেনের থেকে কিছু পাইলটদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কিছু প্লেন কিনব তার খরচ আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য যা খরচ তার দ্বিগুণ। অর্থাৎ যুদ্ধ করলে আমাদের শিক্ষার খরচ ও স্বাস্থ্যের উপর খরচ যে কমবে তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও হচ্ছে না। বর্তমানে আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ লাগাবার সম্ভাবনা চতুর্দিকে বলা হচ্ছে তবে যুদ্ধ চালাতে কত খরচ হবে তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও নেই।

যুদ্ধের জন্য আমরাই দায়ী এমন কথা বলা হচ্ছে না। যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে যুদ্ধ আমরা করব না তাও বলা হচ্ছে না। মুশারফ নামক রাজনৈতিক শাসককে টিকে থাকতে গেলে জিহাদিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য না করে উপায় নেই তা সবারই জানা। আর পাশ্চাত্য দেশও চায় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' ভাব থাকুক যাতে তারা তাদের সেকেন্ডহ্যান্ড মাল, যার গালভরা নাম 'সামরিক সরঞ্জাম' আমাদের দুই দেশকে বিক্রি করতে পারে। ব্রিটেন ও আমেরিকায় এখন মন্দা চলছে। 'বুশ ডকট্রিন' বলে একটি থিওরি আমেরিকায় খুব চালু এবং প্রতিনিয়তই ওদের দেশের টিভি ও সংবাদপত্রে আলোচনা হয়। তার মূল কথা মন্দা দূর করতে গেলে একমাত্র পথ সরকারি আনুকূল্যে সামরিক খরচ বাড়াও। এর জন্য আমেরিকা অ্যান্টি ব্যালেস্টিক মিসাইল ট্রিটি বাতিল করেছে বা করতে যাচ্ছে। স্টার ওয়ারের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সরকারি খরচে নিত্যনতুন সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুত করছে। সামরিক খাতে খরচ বাড়ালে মন্দা দূর হবে এটাই 'বুশ ডকট্রিন'। এর অন্য মানে হচ্ছে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' ভাব রেখে পাকিস্তান ও ভারতকে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করে যেতে হবে। এই ইঁদুর দৌড়ে চীনও যোগ দিয়েছে। চীন নাকি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সামরিক দ্রব্য রপ্তানিকারক। সবারই লক্ষ্য রপ্তানি।

আর যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব থাকলে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করা সোজা। ইরান আর ইরাকের যুদ্ধে লাভবান একমাত্র হয়েছিল অস্ত্র প্রস্তুতকারক দেশগুলি। দুই দেশকে তারা সমানে পেট্রো-ডলারের বিনিময়ে অস্ত্র সরবরাহ করে গেছিল। ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে যাতে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' ভাব থাকে তাই হচ্ছে পাশ্চাত্য তথাকথিত বন্ধু দেশগুলির দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নীতি। পৃথিবীর সব চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চীন ও উত্তর কোরিয়া পাকিস্তানে মিসাইল সরবরাহ করেছে তাতে চীনের লক্ষ্য পূর্ণ হচ্ছে—'যুদ্ধ যুদ্ধ' ভাব থাকলে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামরিক উন্নতি খর্ব করা হবে। ফলস্বরূপ চীনই হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপার পাওয়ার।

সত্যিই আণবিক যুদ্ধ হলে নাকি সি আই এ-র তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১২ কোটি থেকে ২৪ কোটি লোক মারা যাবে। আর ভারতবর্ষে সব শিল্পই ধ্বংস হবে। আর যদি 'সীমিত যুদ্ধ' হয় তবে তার খরচও বিপুল। আমেরিকা নিজের স্বার্থে একদিন ওসামা বিন লাদেনকে সৃষ্টি করেছিল। আবার আমেরিকা নিজের স্বার্থেই মুশারফ নামক সামরিক শাসককে সৃষ্টি করছে। মুশারফ প্রতিনিয়তই সামরিক যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। আর আমেরিকার ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এখনও আমেরিকার বন্ধু। মুশারফ ছাড়া আমেরিকা এখন অচল। অতএব মুশারফকে বাঁচিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে তাতিয়ে আমেরিকা তার স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। সুতরাং আমরা না চাইলেও হয়তো যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চাপবে।

আণবিক যুদ্ধ হলে কি হবে তা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু সাধারণ যুদ্ধ বা কনভেনশনাল যুদ্ধ হলে কি হবে তাও বোঝা দরকার। কাশ্মীর সীমান্তে এখন ভারতের ১০ লক্ষ সৈন্য। বেশিও হতে পারে। তার মাসিক খরচ নাকি এক হাজার কোটি থেকে তিন হাজার কোটি টাকা। কিছু কমবেশি হলেও খরচ যে বিপুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর হিসেবটা করেছে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য হিন্দু'।

একটা সাধারণ যুদ্ধের উদাহরণ দেওয়া যাক। কার্গিল যুদ্ধ। এখানে একটা সীমিত জায়গায় যুদ্ধ হয়েছিল। ১২ দিন বা দুই সপ্তাহের যুদ্ধে ভারতের খরচ হয়েছিল ৫০০০ কোটি টাকা। বফর্স কামান থেকে একবার গোলা ছুঁড়লে খরচ ২৫ হাজার টাকা। বলা হচ্ছে ভারতের খরচ ৫০০০ কোটি টাকা মাত্র। আর পাকিস্তানের কার্গিল যুদ্ধের খরচ নাকি প্রায় দ্বিগুণ। এই হিসাবও করেছে 'দ্য হিন্দু'।

পত্রিকাটি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একটি গোপনীয় তথ্য বের করে দিয়েছে। পাকিস্তানের খরচ দৈনিক ৫০ কোটি ডলার হবে যদি বর্তমানে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। অর্থাৎ ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকার মতো। যদি অবশ্য যুদ্ধটা তিন সপ্তাহ চলে। আরও বেশিদিন চললে আরও বেশি খরচ। আর ভারতের খরচ কত হবে? বলছে ৪০ হাজার থেকে ৫০

হাজার কোটি টাকার মতো যদি তিন সপ্তাহ যুদ্ধ চলে। এর সঙ্গে অবশ্য আরও খরচ যোগ দেওয়া উচিত। রাস্তা নষ্ট হয়েছে, গ্রাম ধ্বংস হয়েছে, সেতু নতুন করে তৈরি করতে হবে, বাড়িঘর ভেঙেছে, ইলেকট্রিসিটি লাইন শেষ। অর্থাৎ সব পরিষেবা যদি ধ্বংস হয় তবে তার আর্থিক দিকটা বিচার করলে বলা যায় দু'টি দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষ আর পাকিস্তান প্রায় দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। যুদ্ধের যা খরচ তা ভারত ও পাকিস্তানের দরিদ্র মানুষকেই বহন করতে হবে। অর্থাৎ ট্যাক্সের বোঝা আরও বাড়বে।

১৯৭১ সালেও ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ একবার হয়েছিল। তখন ভারতের আর্থিক অবস্থা ছিল কিঞ্চিৎ ভালো। অর্থাৎ আমাদের বাজেট ঘাটতি তখন জাতীয় আয়ের ৩.৩ শতাংশ ছিল। ২০০২ সালে বাজেট ঘাটতি জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশর বেশি। যদি রাজ্যগুলির ঘাটতি যোগ করা হয় তবে বাজেট ঘাটতি প্রায় ১২ থেকে ২৫ শতাংশ।

যুদ্ধের দুই বছর বাদে অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে আমাদের দেশীয় ঋণ ছিল জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ। আজকে দেশীয় ঋণ জাতীয় আয়ের ৮৫ শতাংশ। জাতীয় ঋণের সঙ্গে যদি বিদেশী ঋণ যোগ দিই তবে ঋণ ভার যে বিপুল হবে তা বলাই বাহুল্য। তবুও এখনও আমরা 'ঋণ জালে' আবদ্ধ হইনি। যাকে বলা হয় 'Debt Trap'.

পাকিস্তান কিন্তু ঋণ জালের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে উন্নতির হার ছিল ৬ শতাংশ। আজকে অথবা ২০০২ সালে পাকিস্তানের উন্নতির হার এক শতাংশের নিচে। কেউ বলে নেগেটিভ। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ঋণ ছিল তাদের জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশ। আজকে পাকিস্তানের জাতীয় ঋণ তার জাতীয় আয়ের প্রায় ১০৬ শতাংশ। পাকিস্তান কর বাবদ যা তোলে তার ৭৬ শতাংশ শুধু সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতেই চলে যায়। সুতরাং পাকিস্তান সামরিক খাতে যা ব্যয় করছে তা পুরোটাই আসছে 'ঋণ' থেকে। আমাদের মতো পাকিস্তানের দুই রকম ঋণ। একটা জাতীয় ঋণ যেটা জানা যায় আর অন্যটা বিদেশী ঋণ যেটার পূর্ণ বিবরণ জানা যায় না। কারণ 'আরব পেট্রোডলার' এবং সৌদি পেট্রোডলার ড্রাগ বিক্রির ইত্যাদির হিসাব পাওয়া যায় না। এখানে লক্ষণীয় পাকিস্তানের সামরিক শাসক ঘন ঘন সৌদি দেশে যায়। বলা হয় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সৌদি রাজা ও রাজপুত্রদের রক্ষা করছে, অতএব তার খরচ বাবদ সৌদি থেকে পেট্রোডলার আসে। সৌদি রাজাদের রক্ষীরা কেন সৌদি আরবি নয় তা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। সৌদি রাজাদের নিরাপত্তারক্ষী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী।

তবুও পাকিস্তানের ঋণ শুধু আই এম এফ-এর কাছেই প্রচুর। বছরে ১০০ কোটি ডলার শুধু আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারকে সুদ দিতেই হবে। যখন

আমেরিকাকে আফগানিস্তানের আল-কায়দা বা ওসামা বিন লাদেনকে ধরাতে সাহায্য করবে বলেছিল তখন আই এম এফ তথা আমেরিকা কিছুদিনের জন্য এই বাৎসরিক ১০০ কোটি ডলার সুদ মকুব করে দিয়েছিল। শুধু সুদ মকুব করা ছাড়াও আমেরিকা ২০০১-২০০২ সালে পাকিস্তানকে ডলার দিয়ে সাহায্য করেছিল। কেউ বলে আমেরিকার সাহায্যর পরিমাণ পাকিস্তানে প্রতি বছর ৩ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার। হয়তো আরও বেশি। সবই লুক্কায়িত। অর্থাৎ পাকিস্তান ঋণ শোধ করতে পারছে না আর আমেরিকার সৈন্য পাকিস্তানে বসে আছে। তার বদলে আমেরিকা পাকিস্তানকে বর্তমানে 'ঢালাও' সাহায্য করছে। মোট কথা পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে আমেরিকা এবং চীনের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া পাকিস্তানের অর্থনীতি অচল হয়ে যেতে পারে। তার মানে এই যে পাকিস্তান যদি যুদ্ধ ভারতের সঙ্গে করে তার পুরো বা বেশ কিছু অর্থ আসছে বিদেশীদের কাছ থেকে। আমেরিকা ইচ্ছা করলে পাকিস্তানকে 'ভদ্রস্থ' করতে পারে আর ছেড়ে দিলে 'জিহাদি' করতে পারে। আমেরিকা ইচ্ছা করলে যুদ্ধ বাধাতে পারে ইচ্ছা করলে থামাতে পারে। আমেরিকা কি কাশ্মীরে তার নিজস্ব ঘাঁটি তৈরি করতে চায়? তার স্বরূপ কি হবে? আমেরিকার কাগজের খবর যে তারা কাশ্মীরে এমন একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে চায় যাকে পূর্ণ রক্ষা করবে তিন থেকে চারটি দেশ। অর্থাৎ 'নতুন কাশ্মীরে'র রক্ষাকর্তা হবে আমেরিকা, চীন, পাকিস্তান ও ভারত। অর্থাৎ এক ধরনের আমেরিকার কলোনি। এটা অবশ্য ভারতের কাশ্মীর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—পাকিস্তানের কাশ্মীর সম্বন্ধে নয় বা চীনের কাশ্মীর সম্বন্ধেও নয়। অর্থাৎ যুদ্ধ হবে আমেরিকা কি চিন্তা করছে তার উপর। অন্তত 'যুদ্ধ যুদ্ধ' আতঙ্কের মধ্যে আমাদের কিছুদিন এখনও থাকতে হবে।

আইন প্রণয়নকারী সাংসদরাই যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তবে দেশে দুর্নীতি দমন কি সম্ভব?

ভারতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। জাতি সঙঘ পৃথিবীর দেশগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছে। কিছু রাষ্ট্র যেখানে দুর্নীতি প্রায় নেই—যেমন সিঙ্গাপুর ও নিউজিল্যান্ড। আর কিছু রাষ্ট্রে দুর্নীতি আছে তবে মধ্যস্তরের যেমন জাপান, আমেবিকা, ব্রিটেন, জার্মানি। আর তৃতীয় শ্রেণীর অন্য একদল রাষ্ট্র আছে সেখানে দুর্নীতি সর্বত্র—যেমন ভারত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল, চিলি, পেরু ইত্যাদি। ইউনাইটেড নেশনস দুর্নীতির যে লিগ টেবিল তৈরি করেছে তাতে তিনটি দেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলা হয়েছে—আর তিনটি দেশ হল নাইজেরিয়া, পাকিস্তান আর ব্রাজিল। এটা যে কোনো ভারতবাসীর পক্ষে আনন্দ সংবাদ—কারণ দেখা যাচ্ছে ভারতের থেকেও দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র তাহলে আছে।

দুর্নীতি থাকলে উন্নতি ব্যাহত হয় এটা আজকাল সবাই বলছে। অর্থাৎ টাকা 'খরচ' করলেই উন্নতি হচ্ছে না—ভারতে তার অসংখ্য প্রমাণ।

যেমন ধরা যাক, গ্রামীণ উন্নতি প্রকল্পগুলির জন্য শুধু কেন্দ্রীয় বাজেটে বছরে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এখন নানাবিধ গ্রামীণ প্রকল্প। আবাসন প্রকল্প শিশুদের জন্য, বালিকাদের জন্য, মায়েদের জন্য, কৃষি উন্নতির জন্য স্ব-নিযুক্ত প্রকল্প ইত্যাদি গালভরা প্রচুর প্রকল্প। বছরে যদি ৩২ হাজার কোটি ভালোভাবে খরচ হত তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। সরকারি এবং বেসরকারি নানান সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে যে গ্রামীণ উন্নতিকল্পে লাভ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের। যারা গ্রামীণ জনসংখ্যার ১১ থেকে ১৮ শতাংশের মধ্যে। অর্থাৎ ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ লোক এইসব প্রকল্পগুলি থেকে সুবিধা পাচ্ছে না। তার কারণ অবশ্যই দুর্নীতি।

এই দুর্নীতির নানান স্তর আছে—রাজনীতিবিদরা সরকারি অফিসারদের সহযোগিতায় এই দুর্নীতিতে লিপ্ত তা পার্লামেন্টেই স্বীকার করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি করতে গেলে রাজনীতিবিদদের সাহায্য প্রয়োজন আবার রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি করতে গেলে সরকারি কর্মচারীদের সহায়তা দরকার। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে ভারতে এখন সরকারি কর্মচারী আর রাজনীতিবিদদের মধ্যে Nexus অর্থাৎ এক ধরনের আঁতাত। পরস্পরকে সাহায্য করে দেশের সম্পদ লুট করা এখন একদল রাজনীতিবিদের একমাত্র ইচ্ছা। তাই রাজনীতিতে এখন ক্রিমিনালদের আত্মপ্রকাশ।

আশ্চর্যের কথা, ৩০ আগস্ট ১৯৯৭ সালে পার্লামেন্টের তৎকালীন স্পিকার একটি প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মত। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল কোনো রাজনৈতিক দল এবার থেকে কোনো দুর্বৃত্তকে নির্বাচনের টিকিট দেবে না। দুর্বৃত্ত মানে গত দশ বছরে পুলিশের হেফাজতে ছিল, পুলিশ কর্তৃক শাস্তি পেয়েছিল এবং পুলিশের খাতায় নাম আছে—অথবা স্থানীয়ভাবে অসামাজিক কার্যে লিপ্ত।

ঠিক পরের দিনই সমাজবাদী পার্টির তৎকালীন সেক্রেটারি বলেছিল যে ৩০ আগস্টের প্রস্তাব তাদের দল মানে না। তারা 'দুর্বৃত্ত'কে টিকিট দিয়ে যাবে। সমাজবাদী পার্টি যখন প্রস্তাব নাকচ করে দিল তখন অন্যান্য পার্টিগুলি ৩০ আগস্টের প্রস্তাব নাকচ করে দিল। অর্থাৎ ক্রিমিনালদের টিকিট দেওয়ার উপর কোনো বিধিনিষেধ আর থাকল না। মোটামুটিভাবে বলা যায় সব পার্টিই ক্রিমিনালদের টিকিট দিতে আরম্ভ করে দিল। নির্বাচন কমিশনের মতে, অন্তত পার্লামেন্টে এক-তৃতীয়াংশ মেম্বারের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে, অথবা জেল খেটেছে অথবা স্থানীয় মাফিয়া বলে খ্যাত। যাঁরা আইন প্রণয়ন করেন তাঁরাই যদি বিরাট অংশ ক্রিমিনাল হন তবে দুর্নীতি দমন কিছুতেই সম্ভব নয়।

তবে পার্লামেন্টে দুর্নীতি-বন্ধ করার জন্য বারবার বিল আসছে। এবারকার পার্লামেন্টে দু'টি বিল এসেছে। একটি লোকপাল বিল আর অন্যটি সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন (Central Vigilance Commission)-এর উপর বিল।

লোকপাল বিল আমাদের পার্লামেন্টে ৩০ বছর আগে এসেছিল। ৩০ বছর ধরে এই লোকপাল বিল আসে আর যায়। বিল আর পাস হয় না। প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু কারণে বিল ফেরত পাঠানো হয়। এবারকার পার্লামেন্টের বিল এসেছিল। যথা নিয়মে ফেরত গেছে। সমস্যাটা কৃত্রিম। সমস্যাটা প্রধানমন্ত্রী যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হবে কিনা। একদল বলে হওয়া উচিত আর অন্যদল বলে হবে না। বিতর্কের ফলস্বরূপ বিলটি আবার ফেরত গেল। ৩০ বছর ধরে পার্লামেন্টে এই রসিকতাই চলছে। লোকপাল বিল যদি আইন হত তবে মন্ত্রীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করা

সহজ হত। লোকপাল বিল এবারও পার্লামেন্টে পাস হয়নি। ৩০ বছরের খেলা সহজে শেষ হবার নয়।

লোকপাল বিল যেমন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রস্তাব, ভিজিলেন্স কমিশনের বিল আমাদের দেশের আমলাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য তৈরি হয়েছিল। বস্তুত ভিজিলেন্স কমিশন আমাদের কনস্টিট্যুশন-এ স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি থাকার ফলে কিছু আমলা, সেক্রেটারি, কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখের বিপদের সম্ভাবনা। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এতদিন পর্যন্ত ভিজিলেন্স কমিশন ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারই ছিল। ভিজিলেন্স কমিশন সরকারের কাছে যা সুপারিশ করত, সরকার এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিত।

কোনো আমলারই শাস্তি বিশেষ হয়নি। কিন্তু সমস্যা হল ভিজিলেন্স কমিশনার হলেন ভিওল বলে একজন সৎ ব্যুরোক্রাট। তিনি পুরনো ফাইল দেখে বুঝলেন কোনো অসৎ অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়াই হয়নি। ভিওল এসে ঠিক করলেন যাদের বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি চার্জ আছে অর্থাৎ অসৎ অফিসার তাদের নাম লিস্ট করে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে চতুর্দিকে জানিয়ে দিলেন। এই কম্পিউটারে লিস্ট দেখে জানা যাবে কোন্ কোন্ অফিসার দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযুক্ত অথচ শাস্তি পায়নি!

ভিওল ভিজিলেন্স কমিশনার হওয়ার ফলে অফিসারদের ভয়ানক আপত্তি। তারা ভিজিলেন্স কমিশনে পরিবর্তন চায়। অফিসারদের রক্ষাকর্তা রাজনীতিবিদরা। রাজনীতিবিদরা অফিসারদের শোকে আকুল। সব পার্টির মেম্বাররা (ডান ও বাম) তারা একসঙ্গে একটি বিল পাশ করতে চাইলে যাতে ভিওল বা বর্তমান ভিজিলেন্স কমিশনের ডানা কাটা যায়।

ভিওলের ডানা-কাটা বিল শেষ পর্যন্ত এল। এই বিলে বলা আছে (এক) ভিওল একা অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাই ভিজিলেন্স কমিশনে সরকার কর্তৃক মনোনীত আরও দু'জন সমক্ষমতার অধিকারী কমিশনার থাকবেন। অর্থাৎ ভিজিলেন্স কমিশন এখন তিনজন। তিনজন থাকার ফলে ভিওলের বাড়াবাড়ি বন্ধ হবে। (দুই) সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে সরকারি কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গেলে সরকারি অনুমোদন লাগবে না। কারণ সরকারের মধ্যেই ভূত। এই নতুন বিলে বলা হয়েছে জয়েন্ট সেক্রেটারি আর তার উপরে আমলাদের বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত করতে গেলে সরকারি অনুমোদন অবশ্যই দরকার। আর সবাই জানে সরকারি অনুমোদন কোনোদিনই আসে না তাই তদন্ত করা যাবে না। যারা এই বিল ড্রাফ্‌ট করেছে (পার্লামেন্টের জয়েন্ট কমিটি) তাদের মধ্যে সব পার্টিরই বাঘাবাঘা পার্লামেন্টের মেম্বারই আছেন। সোজা বাংলায় দুর্নীতির তদন্ত তারা চায় না।

কারণ রাজনীতিবিদরা পেছনে মদত না যোগালে অফিসাররা দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারেন না। সবই বখরার ব্যাপার। (তিন) সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ্ ইনভেসটিগেশন বা সি বি আই এখন কোনো মন্ত্রীর অধীনে। সি বি আই তাই নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারে না। বহুবার দেখা গেছে, সি বি আইয়ের তদন্ত মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মাঝপথেই থেমে গিয়েছে। যেমন বিখ্যাত বোফর্স মামলা, চিনি কেলেঙ্কারি, রেল-ইঞ্জিন ফ্রান্স থেকে কেনা কেলেঙ্কারি, ভূষি কেলেঙ্কারি ইত্যাদি। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল সি বি আই যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারে তার জন্য ভিজিলেন্স কমিশনার এবং সি বি আইয়ের শীর্ষে থাকবে এবং ভিজিলেন্স কমিশনার এবং সি বি আইয়ের উপর কোনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ যাতে পাল্টানো যায় তাই এই নতুন বিলে বলা হয়েছে ভিজিলেন্স আর সি বি আই দু'টি পৃথক সংস্থা আর পৃথক রায়ের জন্য সি বি আইকে মন্ত্রীর অধীনে থাকতেই হবে। মোটামুটিভাবে বলা যায় পার্লামেন্টে অনেক মেম্বার দুর্নীতি দমন চায় না। কারণ তারা সুবিধাভোগী এক শ্রেণী। আমলা বা সরকারি কর্মচারীদের চটালে নির্বাচনে জেতা দুরূহ। তাই রাজনীতিবিদ-অফিসার নেক্সাস আছে, ছিল এবং থাকবে।

পার্লামেন্টের মেম্বাররা কি কি সুযোগ পান? বলা হয়েছে যখন Power is Money–আর কথাটি আমার নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর। পার্লামেন্টের মেম্বাররা (১) মাইনা পান (২) দৈনিক ভাতা পান মাইনা ছাড়া (৩) অফিস অ্যালাওয়েন্স পান (৪) অফিস ও বাড়ি সাজাবার ভাতা পান (৫) ভ্রমণ ভাতা পান (৬) বছরে ৩২ বার বিনি পয়সার প্লেনে যাতায়াত করতে পারেন (৭) বাড়ি পান (৮) সম্পূর্ণ চিকিৎসা খরচ পান—চিকিৎসা বিদেশে গেলেও পান। (যেমন প্রাক্তন মন্ত্রী মান্ডির রাজা বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং চিকিৎসার জন্য বছরে কয়েক কোটি ডলার নিয়েছেন (৯) ইন্‌কাম ট্যাক্স রিলিফ পান (১০) ফরেন এক্সচেঞ্জ কোটা পান (১১) এক বছর মেম্বার থাকলেই সারাজীবন ধরে পেনশন (১২) A.C. Class-এ রেলে ভ্রমণ করতে পারেন বিনি পয়সায় সারা জীবন ধরে (১৩) ৫০,০০০ ফ্রি টেলিফোন পান অর্থাৎ দিনে ১০০-র অনেক বেশি ফ্রি কল পান (১৪) ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বাবদ নগদ হাতে এক কোটি টাকা পান—আর তিনি কি খরচ করলেন তার অডিট নেই। অর্থাৎ এক কোটি টাকা পুরোটা বা কিছু অংশ তিনি আত্মসাৎ করতে পারেন। এখন তাঁরা চাইছেন চার কোটি টাকা এবং তা পার্লামেন্টে পাস হয়ে যাবে।

উপরোক্ত অনেক সুবিধাই শুধু দিল্লির পার্লামেন্টের মেম্বাররা পান তা সত্যি নয়। রাজ্যে রাজ্যে যে M.L.A-রা আছেন তাঁরাও পান। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের জন্য 'আইন' তৈরি করে টাকার 'অপব্যয়' করছেন। তাঁরাই দেশের নেতা। যত রকমের সুবিধা আছে তাঁরা ভোগ করবেন।

এইসব সুবিধাগুলি অবশ্যই 'আইনসিদ্ধ'। আইনের বাইরে একেক জন প্রতিনিধি বা কিছু প্রতিনিধি (M.L.A-MP, বড় মিনিস্টার, ছোট মিনিস্টার প্রমুখ) ঠিক কত টাকা গরিব দেশ থেকে 'নেন' ক্ষমতার অপব্যবহার করে তার হিসেব নেই। আর 'আইনের বাইরে' অর্থ তুলতে গেলে আমলাদের-অফিসারদের প্রয়োজন। সুতরাং অফিসারদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এঁরা কোনো পদক্ষেপ নেন না বা ইচ্ছা করেই নেন না।

তাই দেশে দুর্নীতি দমন করা সম্ভব নয়। যে দেশে যারা রক্ষক, যারা মুখ্য আইনভঙ্গকারী, তারা দুর্নীতিই চায়। আর চায় বলে দুর্নীতি জিন্দাবাদ হয়েই থাকবে। বিপদে পড়বে শুধু আম-জনসাধারণ। অবশ্য তাদের কথা কে-ই বা ভাবে।

নির্বাচন প্রথার আমূল সংস্কার প্রয়োজন তবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাঁধবে?

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে না হলে গণতন্ত্র ঠিকমতো চলতে পারে না এটা প্রায় সবাই মানে। গণতন্ত্রের বুনিয়াদই নির্বাচন। ভারতবর্ষে বহুবার বহুস্তরে নির্বাচন হচ্ছে—তবে সেই সমস্ত নির্বাচনগুলি কতটা 'মুক্ত ও সুস্থ' তা নিয়ে রাজনীতিবিদরাও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। যারা জনপ্রতিনিধি তারাও জানে যেভাবে আমাদের দেশে নির্বাচন হচ্ছে তাতে কিছুদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের সঙ্গে Banana রিপাবলিকের প্রভেদ সামান্যই থাকবে। অনুন্নত দেশগুলিতে অধিকাংশ জায়গায় গণতন্ত্র নেই—আর সেখানে যেটা আছে তা হচ্ছে 'সাজানো নির্বাচন'। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে এবং এশিয়ার বহু দেশে নির্বাচন মানে প্রহসন। ভারতবর্ষে এখনো সেই অবস্থা যদিও আসেনি তবে অবস্থা যে খুব ভালো তা মনে করার কোনো কারণ নেই।

নির্বাচন সংস্কার নিয়ে আগেও অনেক কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে। যেমন দীনেশ গোস্বামী কমিটির রিপোর্ট। আশ্চর্যের কথা এই রিপোর্টটি পার্লামেন্টে 'পাস' হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর করা হয়নি। ক্রিমিনালদের কিভাবে নির্বাচনে বাদ দেওয়া যায় তার জন্য হয়েছিল ভোরা কমিটি। বিশেষ কিছুই হয়নি। M.L.A. এবং MP-দের বৃহৎ অংশ এখন ক্রিমিনাল। শেষান, আমাদের প্রাক্তন চিফ ইলেকশন কমিশনার হিসেব করে বলেছিলেন যে, পার্লামেন্টে যারা সদস্য তার মধ্যে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ পুলিশের ভাষায় 'দাগী আসামী'। পুলিশ অবশ্য শাস্তি দেয়নি অথচ তারা ক্রিমিনাল এমন সংখ্যাও বিশাল ও বিরাট। আসলে যারা জনপ্রতিনিধি তাদের বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রিমিনালদের সঙ্গে যুক্ত। একজন নির্বাচনী অফিসার তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, জনপ্রতিনিধিদের বিরাট এক সময় ব্যয় হয় পুলিশ-থানায় ফোন করতে। এই সব জনপ্রতিনিধিরা পুলিশের কাজে 'হস্তক্ষেপ'

করাটা প্রায় কর্তব্যের মধ্যেই ধরে। তাদের 'আদেশ' অনুসারে পুলিশ অপরাধীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অথবা নিরপরাধীকে জেলে নিয়ে থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করে। এই নির্বাচন পদ্ধতি এতই ত্রুটিপূর্ণ যে আজকে দুর্নীতি ভারতবর্ষে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পৃথিবীতে দুর্নীতিগ্রস্ত যদি সবচেয়ে দশটি দেশ বাছা হয় ভারতবর্ষ হবে তার অন্যতম। ভারতবর্ষ থেকেও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ আছে কথাটা সাধারণ মানুষের কাছে কোনো আশ্বাসের বাণী নয়।

নির্বাচন সংস্কার নিয়ে আজকাল চতুর্দিকে সেমিনার হচ্ছে। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সালে শিলিগুড়িতে এমন একটি সেমিনার হয়ে গেল। উদ্যোক্তা ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার। সেমিনারে ২২টির বেশি পেপার পড়া হয় ও বহু লোক প্রশ্ন ও উত্তরে অংশগ্রহণ করে। মতান্তর ছিল তবে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছে নির্বাচন পদ্ধতির বহু সংস্কার দরকার।

১) টাকার খেলা ও রাজনীতিতে দূর্বৃত্তায়ন : নির্বাচনে দাঁড়াতে গেলে বহু টাকা লাগে। সাতটা বা পাঁচের অধিক কনস্টিট্যুয়েন্সি নিয়ে একটি পার্লামেন্টের সিট। জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এত লোকের কাছে নির্বাচনী প্রচারে টাকা লাগে। নির্বাচন কমিশন আপাতত প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট প্রতি সীমারেখা করেছে ১৫ লাখ টাকা খরচের। এই টাকা প্রায়শ আসে যারা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছে। এদের মধ্যে বা যারা ডোনেশন দেয় তারা ধনী এবং অনেকেই স্মাগলার, ব্ল্যাকমানি হোল্ডার, প্রমোটার বা স্রেফ দূর্বৃত্ত। এরা টাকা দেওয়াটাকে ভাবে ইনভেস্টমেন্ট। মনের মতো ক্যান্ডিডেট যদি জিতে যায় তবে আপাতত কয়েক লাখ দেওয়া হয়েছে, কয়েক কোটি টাকা তুলে নেওয়া হবে। কেউ বিনা শর্তে টাকা দান করে না। ক্যান্ডিডেট অধিকাংশ সময়েই ১৫ লাখের বেশি খরচ করে অতএব নির্বাচন কমিশনে ভুল তথ্য দেয়। অর্থাৎ প্রথম থেকেই আমাদের নির্বাচনে দুর্নীতি।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দীনেশ গোস্বামী রিপোর্ট স্টেট ফান্ডিং (State Funding)-এর সুপারিশ করেছিল। নির্বাচনে দাঁড়াতে যা খরচ তার সবটাই রাষ্ট্র বাজেট থেকে দিলে পরে রাজনীতিতে দূর্বৃত্তায়ন বহুলাংশে কম হবে। সমস্যা প্রচুর। এত টাকা রাষ্ট্রের আছে কিনা তাও জানা নেই। তাই সেমিনারের একাংশ মনে করে যে ভারতে ফরাসি সিস্টেম চালু করা দরকার। ফ্রেঞ্চ নির্বাচনে অর্থ দেয় রাষ্ট্র। যদি ক্যান্ডিডেট ৮ শতাংশের কম ভোট পায় তবে সম্পূর্ণ অর্থ রাষ্ট্রকে ফেরত দিতে হবে। এতে লাভ হবে অন্তত দুটো। দূর্বৃত্তরা অর্থ সাহায্য করে রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করতে অতটা সফল হবে না। আর প্রচুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট দাঁড়াতে ইতস্তত করবে। কারণ অনেক ভুয়া ক্যান্ডিডেট কোনো দলের হয়ে ডামি (Dummy) হয়ে দাঁড়ায়। বলাবাহুল্য রাষ্ট্র এখনও চিন্তা করছে। ফরাসি সিস্টেমের নানান সংশোধন করে আমাদের

নির্বাচনী অফিসার গিল ভারতে চালু করতে চান। কিন্তু বাধা আসছে নানান রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে। তারা স্টেট ফান্ডিং চায় না। গিল সাহেবের এটাই দুঃখ।

(২) **নির্বাচনে নানান কারচুপি** : ভোটার লিস্ট তৈরি করা, বুথে রিগিং করা, জ্যাম করা, গণনায় 'ভুল' করা ইত্যাদি সমস্যা সবারই জানা। আজকাল একটা কথা চালু হয়েছে Scientific Rigging এই পদ্ধতিটিতে যারা ভোটার লিস্ট তৈরি করে তারা কিছু নাম বাদ দেয় আর ভুয়া কিছু নাম ঢোকায়। যে বহুদিন আগে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে অথবা মৃত তাদের নামও ইচ্ছাকৃতভাবে ঢোকানো হয়। নির্বাচন কমিশন যদিও অগাধ ক্ষমতার অধিকারী তবুও রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা ভোটার লিস্ট তৈরি করে, নির্বাচন চালায় এবং গণনায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন অসহায়।

এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়ে একটি অর্ডার চায়। অর্ডারে এটা যেন থাকে, যে সব রাজ্য কর্মচারী তাদের কর্তব্যে অবহেলা করেছে তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হোক। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দিয়েছে কিছুটা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে লেখা আছে তা হচ্ছে 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই অর্ডার পালন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছে।' অনেক সময়ে 'উপদেশ' মানে 'আদেশ'। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অতটা ক্ষমতা দিতে রাজি নয়। কারণ নির্বাচনে জিততে গেলে রাজ্য সরকারের বশংবদ কর্মচারী ও পুলিশ অপরিহার্য। ফলে পাঁচটি রাজ্য ছাড়া বাকি সব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের শাস্তি দিতে নারাজ। পঃ বঙ্গ এই অর্ডার মানেনি। পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে যারা মেনেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্নাটক আর দক্ষিণী রাজ্যগুলি। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি রাজি নয়।

সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের শাসনতন্ত্রে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও লোকজন দেওয়া হয়নি। লোকের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্ভর করতে হয় রাজ্য সরকারের উপর। রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসীন নেতার নির্বাচন বিষয়ে প্রায়শ নিরপেক্ষ হয় না। ফলে প্রথম যুগে পেরী শাস্ত্রী, পরে শেষান এবং এখন গিল নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজাতে চান। তাঁরা রাজ্যনির্ভর হতে চান না। দরকার হলে নিরপেক্ষ সরকার বা প্রেসিডেন্ট রুল অথবা অল পার্টি কমিটি করে করতে চান। গিল চান প্রেসিডেন্ট রুল। রাজ্য সরকারগুলি এই বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছে। ফলে রাজ্য সরকারের অধীনে আপাতত নির্বাচন হচ্ছে তবে সেটা কতটা মুক্ত ও স্বচ্ছ তা নিয়ে সন্দেহ। অনেক রাজ্যেই এখনও আইডেনটিটি কার্ড চালুই হয়নি। অনেক রাজ্যে বিদেশীরা ভোট দিচ্ছে। অনেক রাজ্যে বিদেশীরা সহজে রেশন কার্ড পাচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন যে-কোনো ব্যবস্থাই নিতে যাক না কেন রাজনীতিবিদদের প্রবল আপত্তি।

(৩) **সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাকে বলে?** অনেক সময়ে দেখা যায় নানান ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়ে ধরা যাক ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েও নির্বাচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে জিততে হলে অন্তত ৫১ শতাংশ ভোট পাওয়া দরকার।

বহু রাজ্যে বহু সরকার বহুদিন ধরে ক্ষমতায় আছে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভোটে। গিল সাহেব এই অবস্থার পরিবর্তন চান। সেমিনারে এই নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনাও হয়। বলা হচ্ছে প্রথম রাউন্ডে ভোটে যদি ৫১ শতাংশ ভোট না পায় তবে প্রথম ও দ্বিতীয়র মধ্যে আবার নির্বাচন হওয়া উচিত। ইউরোপে বহু দেশে এই প্রথা চালু। যে ৫১ শতাংশ ভোট পাবে তাকেই নির্বাচিত ঘোষণা করতে হবে। গিল সাহেব নানান তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে আমাদের দেশে ভোটে জেতা যায় Block Vote-এ অর্থাৎ জাতপাত, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি খুবই জরুরি। এর কারণ ৫১ শতাংশ ভোট না পেয়েও জাত-পাত ইত্যাদি দিয়ে কোনো রকমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আনা যায় ও বহাল থাকে। যদি ৫১ শতাংশ ভোট বা দরকার হলে দু'বার ভোট করা হয়, তবে জাত-পাত-ধর্ম-ভাষা-উপভাষা ইত্যাদির সমস্যা অনেক কমবে। যে জিতবে বা ৫১ শতাংশ ভোট পাবে তাকে সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও বহুজনগ্রাহ্য হতেই হবে। আর কম্পিউটার যুগে দু'বার ভোটগ্রহণ করা এমন একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

নির্বাচন থেকে অবশ্যই ক্রিমিনালদের বার করে দেওয়া উচিত। কিন্তু ক্রিমিনালদের ব্যাখ্যা কি? এটাও হতে পারে পুলিশের সহায়তায় মিথ্যা ফৌজদারি মামলা করে বা সাজিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের জব্দ করা যায়। তাই গিল সাহেব সর্বজনগ্রাহ্য একটি ব্যাখ্যা চান—কে ক্রিমিনাল?

নির্বাচন সংস্কার একদিনে হবে না তবে এই নিয়ে আলোচনা জরুরি।